স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইঅউ ৪৩০১

ফল চাষ

FRUIT CULTURE

কোর্স ডিভেলপমেন্ট টিম

লেখক

ড. মোঃ ফেরদৌস মন্ডল
অধ্যাপক, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ গোলাম রাব্বানী
সহযোগী অধ্যাপক, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এ কে এম আমজাদ হোসেন
প্রাক্তন পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

সম্পাদক

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
ড. মোঃ শাহ আলম সরকার
স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রচনাশৈলী সম্পাদক

ড. মোঃ শাহ আলম সরকার
স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমন্বয়কারী

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

এ কোর্সবইটি রেফারি কর্তৃক নিরীক্ষণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর ছাত্রদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে।

MAHBUBUL ALAM
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

ফল চাষ

FRUIT CULTURE

BAE 4301

স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ফল চাষ

(FAL CHASH)
FRUIT CULTURE

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি ঃ
ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য ঃ
ড. মোঃ আব্দুস সিদ্দিক
ড. মোঃ আবু তালেব
ড. আ ন ম আমিনুর রহমান
ড. মোঃ শাহ আলম সরকার
ড. মোঃ মোর্শেদুর রহমান
মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী
ড. মোঃ বিলাল হোসেন
ড. মোঃ নূরুল ইসলাম
ড. আবু সাদেক মোহাম্মদ সেলিম
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক
ডীন, স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

FAL CHASH (Fruit Culture), a 3 Credit Coursebook for the Bachelor of Agricultural Education Programme, **Written by** Dr. Md. Ferdous Mondal, Dr. Md. Golam Rabbani and Dr. A. K. M. Amzad Hossain, **Edited by** Dr. Abu Hena Md. Fareque Md. Shah Alam Sarker. **Style Edited by** Md. Shah Alam Sarker. **Published by** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1705. © School of Agriculture and Rural Development, Bangladesh Open University. **First Edition:** January 1998. **Computer Compose & D.T.P:** Nikhil Chandra Halder. **Cover Design:** Md. Monirul Islam. **Cover Photography:** Provided by: Dr. Abu Hena Md. Faruque. **Printed by:** Ananda Printers, 166, Arambag, Dhaka-1000.

ISBN 984-34-5030-2

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any means without prior permission of the copyright owner.

সূচিপত্র

ইউনিট ১ ফলের পরিচিতি ও গুরুত্ব ---------- **১-২৯**

পাঠ ১.১ ফলের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগের রূপরেখা ---------- ১
পাঠ ১.২ ফলের বাংলা, ইংরেজী ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ---------- ৫
পাঠ ১.৩ মানব পুষ্টিতে ফলের অবদান ---------- ১০
পাঠ ১.৪ ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ---------- ১৪
পাঠ ১.৫ ফল উৎপাদন পরিস্থিতি ও ফল ব্যবহার সমীক্ষা ---------- ১৮

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ ফলের জমি ও উৎপাদন সমীক্ষার ওপর চার্ট তৈরিকরণ ---------- ২৩
পাঠ ১.৭ ফলের ভিটামিন ও খনিজ মানের ওপর চার্ট তৈরিকরণ ---------- ২৬

ইউনিট ২ ফলগাছের বংশবিস্তার ---------- **৩১-৬৮**

পাঠ ২.১ বংশ বিস্তারের ধারণা ও প্রকারভেদের রূপরেখা, বীজ ও অঙ্গজ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধা ---------- ৩১
পাঠ ২.২ শাখা কলম ---------- ৩৫
পাঠ ২.৩ দাব কলম ---------- ৩৮

পাঠ ২.৪	জোড় কলম	৪১
পাঠ ২.৫	চোখ কলম	৪৫
পাঠ ২.৬	টিস্যু কলচারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার	৪৯
ব্যবহারিক		
পাঠ ২.৭	শাখা ও গুটি কলম পদ্ধতি অনুশীলন	৫২
পাঠ ২.৮	ভিনিয়ার জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন	৫৬
পাঠ ২.৯	সংস্পর্শ জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন	৫৯
পাঠ ২.১০	তালি, চক্র ও টি কলম অনুশীলন	৬২
ইউনিট ৩ ফলগাছের কাঠামো তৈরি ও ছাটাইকরণ		**৬৯-৮২**
পাঠ ৩.১	ট্রেনিং ও প্রুনিং এর সংজ্ঞা, পার্থক্য ও উদ্দেশ্য	৬৯
পাঠ ৩.২	ট্রেনিং পদ্ধতি ও অনুশীলন সময়	৭২
পাঠ ৩.৩	ষ্ট্রুনিং পদ্ধতি ও অনুশীলন সময়	৭৬
ব্যবহারিক		
পাঠ ৩.৪	ফল গাছে বিভিন্ন ট্রেনিং ও প্রুনিং পদ্ধতি অনুশীলন	৭৯
ইউনিট ৪ ফল গাছ চাষের মৌল বিষয়াবলী		**৮৩-১১০**
পাঠ ৪.১	ফল চাষের সাথে জলবায়ুর সম্পর্ক	৮৩
পাঠ ৪.২	ফল চাষের সাথে মাটির সম্পর্ক	৮৬
পাঠ ৪.৩	বাগানের পরিকল্পনা ও নকশা	৮৯
পাঠ ৪.৪	জমি নির্বাচন ও তৈরি, গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ	৯৩
পাঠ ৪.৫	চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা	৯৬
ব্যবহারিক		
পাঠ ৪.৬	বর্গাকার প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি, নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়	৯৯
পাঠ ৪.৭	ত্রিভ জী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়	১০২
পাঠ ৪.৮	ষড়ভ জী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়	১০৫
পাঠ ৪.৯	গর্তকরণ, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন	১০৮
ইউনিট ৫ ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ		**১১১-১৩২**
পাঠ ৫.১	আন্তপরিচর্যা ও অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ	১১১
পাঠ ৫.২	ফসল পর্যায় ও সাথ ফসলের চাষ	১১৬
পাঠ ৫.৩	ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ	১২০
পাঠ ৫.৪	সংগ্রহোত্তর ফলের শারীরবৃত্তীয় ও সংরক্ষণের নীতিমালা	১২৩
পাঠ ৫.৫	তাজা ফল সংরক্ষণ পরিবেশ ও পদ্ধতি	১২৭

ইউনিট ৬ স্বল্পমেয়াদী ফলগাছের চাষ ---------- **১৩৩-১৬৯**

পাঠ ৬.১ আনারস ---------- ১৩৩

পাঠ ৬.২ কলা ---------- ১৪১

পাঠ ৬.৩ পেঁপে ---------- ১৪৮

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৪ আনারসের বিভিন্ন ধরণের চারার শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন ---------- ১৮৬

পাঠ ৬.৫ কলার বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন---- ১৫৭

পাঠ ৬.৬ স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন ধরণের ফলের জাত শনাক্তকরণ ---------- ১৬০

পাঠ ৬.৭ স্বল্পমেয়াদী ফলের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন ---------- ১৬৩

ইউনিট ৭ দীর্ঘমেয়াদী ফল গাছের চাষ ---------- **১৭১-২২১**

পাঠ ৭.১ আম ---------- ১৭১

পাঠ ৭.২ লিচু ---------- ১৮৩

পাঠ ৭.৩ কাঁঠাল ---------- ১৯০

পাঠ ৭.৪ পেয়ারা ---------- ১৯৭

পাঠ ৭.৫ লেবুজাতীয় ফল ---------- ২০৩

পাঠ ৭.৬ নারিকেল ---------- ২১২

তথ্যসূত্র ---------- **২২২-২২৩**

ইউনিট ১
ফলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

ইউনিট ১ ফলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

মানুষের খাদ্যতালিকায় ফল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কোন দেশের জীবন-যাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু ফল ভক্ষণের পরিমাণের ওপর। ফল ভিটামিন ও খনিজ পদার্থে ভরপুর। তাছাড়া রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় বলে এদের খাদ্য ও পুষ্টিমান নষ্ট হয় না অর্থাৎ ফলে বিদ্যমান খণিজ ও ভিটামিনের পুরাটাই আমাদের শরীর গ্রহণ করতে পারে। তাই মানব পুষ্টিতে ফলের অবদান অনেক বেশি। খাদ্য ঘাটতি পূরণেও ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা শাস্ত্রে , নতুন শিল্প স্থাপনে, খাদ্য উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে, সামাজিক কর্মকান্ডে বা অনুষ্ঠানাদিতে ও পরিবেশ সংরক্ষণে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। আমাদের প্রতিদিন কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। কিন্তু আমরা পাচ্ছি মাত্র ৩৮ গ্রাম। বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ এবং ফলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে খুবই ধীর গতিতে। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনিক মাথাপিছু ফল ভক্ষণের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে যাচ্ছে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ফলের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস, ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম, মানব পুষ্টিতে ফলের অবদান, ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, ফল উৎপাদন পরিস্থিতি ও ফল ব্যবহার সমীক্ষা এবং ফলের ভিটামিন ও খণিজ মানের ওপর সারণি তৈরিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ ফলের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগের রূপরেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফলের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ফলের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফলের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি উল্লেখ করতে পারবেন।
- ফলের শ্রেণী অনুযায়ী নাম ও উদাহরণ বলতে পারবেন।

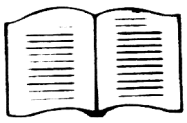

ফলের সংজ্ঞা (Definition of fruit)

নিষিক্ত হওয়ার পর গর্ভাশয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিপক্কতা লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ফলে পরিণত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এটিকে প্রকৃত ফল (true fruit) বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক ফল বলা হয়। উদ্যানতত্ত্বের ভাষায় সব প্রকৃত ফলকে ফল বলা যাবে না। অর্থাৎ সব উদ্ভিদতাত্ত্বিক ফল উদ্যানতাত্ত্বিক ফল নয়। আবার সব উদ্যানতাত্ত্বিক ফল কিন্তু উদ্ভিদতাত্ত্বিক বা প্রকৃত ফল নয়। যেমন- আপেল। এটি thallamus থেকে উৎপন্ন হয়। এটি একটি অপ্রকৃত (Pseudo fruit) ফল। ধান একটি প্রকৃত ফল কিন্তু তাই বলে ধানকে ফল বলা যাবে না। এক কথায় ফলের সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। নিষেক

পুষ্প মঞ্জুরী কিংবা গর্ভাশয়ের অংশ বিশেষ রূপান্তরিত হয়ে যে ফল হয় তাকে অপ্রকৃত ফল বলে।

ছাড়াও গর্ভাশয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় (Parthenocarpically) ফলে রূপান্তরিত হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু গর্ভাশয় নয় সম্পর্ণ পুস্পমঞ্জুরী অথবা গর্ভাশয়ের অংশবিশেষ পরিপুষ্ট, পরিবর্ধিত ও বিকশিত হয়ে ফলে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের ফলকে অপকৃত ফল বলা হয়। যেসব প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলা হয়। উদ্যানতত্ত্বের যে শাখা ফল নিয়ে আলোচনা করে তাকে ফল বিজ্ঞান বা পোমোলজি (Pomology) বলে।

ফলের শ্রেণিবিন্যাস

ফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য ফলের শ্রেণিবিন্যাস জানা আবশ্যক।

ফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য ফলের শ্রেণিবিন্যাস জানা আবশ্যক। ফলকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন–

১। ফলের বীজপত্রের (cotyledon) সংখ্যার ভিত্তিতে –
   ক) এক বীজপত্রী ফল ঃ তাল, নারিকেল, সুপারী, খেজুর ইত্যাদি।
   খ) বহু বীজপত্রী ফল ঃ পেঁপে, কাঁঠাল, পেয়ারা, তরমুজ ইত্যাদি।

২। পরাগায়নের (pollination) ভিত্তিতে –
   ক) স্ব-পরাগী ফল ঃ আমলকী, পেয়ারা, আংগুর, সফেদা, ডুমুর ইত্যাদি।
   খ) পর-পরাগী ফল ঃ আম, জাম, লিচু, পেঁপে, তাল, সুপারী, খেজুর, আনারস, কুল, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি।
   গ) স্ব ও পর পরাগী ফল ঃ কাঁঠাল, নারিকেল, লেবু জাতীয় ফল কাজুবাদাম, ডালিম ইত্যাদি।

৩। জীবনকালের (life cycle) ভিত্তিতে –
   ক) স্বল্প মেয়াদী ফল ঃ কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি
   খ) দীর্ঘ মেয়াদী ফল ঃ আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি।

৪। গাছের ফল প্রদানের প্রকৃতি অনুসারে –
   ক) মনোকারপিক (monocarpic) ফল ঃ কলা, শসা, তরমুজ, বাঙ্গী ইত্যাদি।
   খ) পলিকারপিক (polycarpic) ফল ঃ আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

৫। উৎপত্তি বা উৎস অনুসারে –
   ক) প্রকৃত ফল ঃ আম, জাম, কালোজাম, লিচু, লেবু, পেঁপে ইত্যাদি।
   খ) অপ্রকৃত ফল ঃ আপেল, নাশপাতি, কাজুবাদাম ইত্যাদি।

৬। পুষ্পমঞ্জুরীর ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে –

ক) সরল ফল ঃ আম, জাম, নারিকেল, কলা ইত্যাদি।
খ) যৌগিক ফল ঃ যৌগিক ফল আবার দুই প্রকার
i) এগ্রিগেট বা গুচ্ছ ফল ঃ আতা, শরীফা, রাস্পবেরী, কাঁঠালীচাঁপা ইত্যাদি।
ii) মাল্টিপুল ফল ঃ কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

৭। পেরিকার্পের বুনটের (texture of the pericarp) ওপর ভিত্তি করে –
ক) নীরস বা শুষ্ক ফল ঃ কাঠবাদাম, সুপারী, এপ্রিকট ইত্যাদি।
খ) সরস ফল ঃ সরস ফল আবার পাঁচ প্রকার
i) ড্রুপ ঃ আম, কুল, নারিকেল ইত্যাদি।
ii) বেরী ঃ কলা, পেয়ারা, কালোজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি।
iii) পোম ঃ আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি।
iv) পেপো ঃ শসা, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি।
v) হেসপেরিডিয়াম ঃ কমলালেবু, কাগজীলেবু, বাতাবীলেবু ইত্যাদি।

৮। জলবায়ুর চাহিদার (climatic requirement) ওপর ভিত্তি করে –

ক) উôমন্ডলীয় ফল ঃ খেজুর, অ্যাভোকেডো, কলা, নারিকেল, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

খ) অবউôমন্ডলীয় ফল ঃ পেয়ারা, ডালিম, কুল, কলা, জলপাই, লেবু জাতীয় ফল, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি।
গ) শীতমন্ডলীয় ফল ঃ ষ্ট্রবেরী, রাস্পবেরী, পীচ, ইউরোপীয় আঙ্গুর ইত্যাদি।

অনুশীলন (Activity) ঃ *আপনার এলাকায় সচরাচর দেখা যায় এমন ফলসম হের শ্রেণিবিন্যাস করুন।*

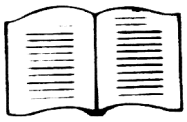

সারমর্ম ঃ ফল বলতে নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বাশয়কে বোঝায় আর যে সব ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না না করেই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলে। আমাদের প্রতিদিন কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। কিন্তু আমরা পাচ্ছি মাত্র ৩৮ গ্রাম। অথচ অনেক উন্নত দেশে দৈনিক মাথাপিছু ফল ভক্ষণের পরিমাণ ২০০ গ্রামের উপরে। বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ এবং ফলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে খুবই ধীর গতিতে। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনিক মাথাপিছু ফল ভক্ষণের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে যাচ্ছে। দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য ফলের উৎপাদন বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। ফলকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে ফলকে একবীজপত্রী ও বহু বীজপত্রী ফলে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। পরাগায়নের ভিত্তিতে স্ব-পরাগী, পর-পরাগী, স্ব ও পর-পরাগী এবং জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ফলে ভাগ করা হয়েছে। গাছের ফল প্রদানের প্রকৃতি অনুযায়ী মনোকারপিক ও পলিকারপিক ফলে

শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উৎপত্তি অনুসারে প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফল, পুষ্পমঞ্জুরীর ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে সরল, যৌগিক ও গুচ্ছফল, পেরিকার্পের বুনটের ওপর ভিত্তি করে নিরস ও সরস ফল এবং জলবায়ুর চাহিদা অনুযায়ী উôমন্ডলীয়, অবউôমন্ডলীয় ও শীতমন্ডলীয় ফলে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ফল বলতে কী বোঝায়?
- ক) নিষিক্ত ডিম্বাশয়
- খ) পরিপক্ক ডিম্বাশয়
- গ) নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বাশয়

২। উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলতে কী বোঝায়?
- ক) পরিপক্ক ডিম্বাশয়
- খ) প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল যা কাঁচা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া যায়
- গ) প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল যা পরিনত অথবা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয়।

৩। কোন্‌টি সরস ফল?
- ক) আম
- খ) সুপারী
- গ) এপ্রিকট

৪। কোন্‌টি সরল ফল?
- ক) আম
- খ) কাঁঠাল
- গ) আনারস

৫। কোন্‌টি মনোকারপিক ফল?
- ক) কলা
- খ) আম
- গ) কাঁঠাল

৬। কোন্‌টি উদ্যানতাত্ত্বিক ফল?
- ক) কলা
- খ) ধান
- গ) বেগুন

৭। কোন্‌টি অপ্রকৃত ফল?
- ক) আম
- খ) কাঁঠাল
- গ) আপেল

৮। কোন্‌টি যৌগিক ফল?
   ক) আম
   খ) তরমুজ
   গ) কাঁঠাল

পাঠ ১.২ ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ফল গাছসম হের পরিবারের নাম লিখতে ও বলতে পারবেন।
- দ্বিপদ নামকরণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নামকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

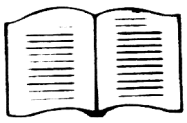

উদ্ভিদের নামের দু'টি অংশ থাকে- প্রথম অংশকে জেনেরিক ইপিথেট বা গণের অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ স্পেসিফিক ইপিথেট বা প্রজাতির অংশ। এই নামকরণের পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়।

পৃথিবীতে বহু ধরনের ভাষা প্রচলিত থাকায় একই উদ্ভিদ বিভিন্ন ভাষাভাষীর নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত। নামের বিভিন্নতার কারণে সৃষ্ট অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা একটি আন্তর্জাতিক কোড বা নিয়ম তৈরি করেছেন যাকে ইংরেজিতে (ICBN=International Code of Binomial Nomenclature) বলা হয়। এ কোড অনুযায়ী প্রতিটি উদ্ভিদের একটি নাম দেয়া হয়েছে। এই নামকে উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম বলা হয়। (ICBN) অনুযায়ী উদ্ভিদের নামের দুইটি অংশ থাকে - প্রথম অংশকে জেনেরিক ইপিথেট বা গণের অংশ যা সব সময় বড় হরফে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় অংশ স্পেসিফিক ইপিথেট বা প্রজাতির অংশ যা সব সময় ছোট হরফে শুরু হয়। একে দ্বিপদ নামকরণ বা (Binomial Nomenclature) বলা হয়। এ কোড অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন ভাষায় বা ইংরেজি বাঁকা হরফে লিখতে হয় অথবা সোজা হরফে লিখলে নামের নিচে সরল রেখা টানতে হয়।

বিভিন্ন ফল গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম

পরিবার (Family) : Anacardiaceae

ক্রমিক নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১.	আম	Mango	*Mangifera indica*
২.	কাজুবাদাম	Cashew nut	*Anacardium*

			occidentale
৩.	পেস্তা বাদাম	Pistachio	*Pistacia vera*
৪.	দেশী আমড়া	Hog plum	*Spondias mangifera*
		পরিবার (Family) : Annonaceae	
৫.	আতা/নোনা	Bullock's heart	*Anona reticulata*
৬.	শরিফা	Custard/Sugar apple/Sweetsop	*Anona squamosa*
		পরিবার (Family) : Apocynaceae	
৭.	করমচা	Caronda	*Carissa congesta*
		পরিবার (Family):Averrhoaceae	
৮.	কামরাঙ্গা/ তারকা ফল	Carambola/Star fruit	*Averrhoea carambola*
		পরিবার (Family): Betulaceae	
৯.	হ্যাজেল নাট	Hezel nut/Filbert	*Corhlus avellana*
		পরিবার (Family) : Bombaceae	
১০.	ডুরিয়ান	Durian	*Durio zibethinus*
		পরিবার (Family) : Bromeliaceae	
১১.	আনারস	Pineapple	*Anana scomosus/ Anana sativus*
		পরিবার (Family) : Caricaceae	
১২.	পেঁপে	Papaya/paw paw/papita	*Carica papaya*
		পরিবার (Family) : Cucurbitaceae	
১৩.	তরমুজ	Water melon	*Citrullus lanatus/*

			Citrullus vulgaris
১৪.	বাঙ্গী	Melon/White skinned melon	*Cucumis melo*
		পরিবার (Family) : Dilleniaceae	
১৫.	চালতা	Indian dillenia	*Dillenia indica* *Dillenia speciosa*
		পরিবার (Family) : Ebenaceae	
১৬.	দেশী গাব	River ebony	*Diospyros peregrina*
১৭.	বিলাতী গাব	Velvet apple	*Diospyros discolor*
		পরিবার (Family) :Euphorbiaceae	
১৮.	লটকা/লটকন	Burmese grape	*Baccaurea sapida*
১৯.	আমলকী/আমলা	Indian gooseberry	*Phyllanthus emblica*
২০.	অরবরই	Star gooseberry	*Phyllanthus acidus/ Phyllanthus distichus*
		পরিবার (Family) : Fagaceae	
২১.	চেষ্ট নাট	Chestnut	*Castanea sativa*
		পরিবার (Family) : Flacourtiaceae	
২২.	বইচি	Governor's/Madagascar plum	*Flacourtia indica*
		পরিবার (Family) : Guttiferae	
২৩.	কাউফল	Cowa/Garcinia	*Garcinia cowa*
		পরিবার (Family) : Juglandaceae	

২৪.	পিকান নাট	Peacan nut	*Carya illinoensis*
২৫.	ওয়াল নাট	Walnut	*Juglans regia*
		পরিবার (Family) : Lauraceae	
২৬.	অ্যাভোক্যাডো	Avocado/Alligator pear	*Persea americana*
		পরিবার (Family) : Leguminosae	
২৭.	তেঁতুল	Tamarind	*Tamarindus indica*
		পরিবার (Family) : Solanaceae	
২৮.	গেছো টমেটো	Tree tomato	*Cyphomandra betacea*
		পরিবার (Family) : Moraceae	
২৯.	কাঁঠাল	Jackfruit	*Artocarpus heterophyllus*
৩০.	ডেউয়া	Monkey jack	*Artocarpus lakoocha*
৩১.	ডুমুর	Fig	*Ficus carica*
৩২.	তুত ফল	Mulberry	*Morus alba*
		পরিবার (Family) : Musacea	
৩৩.	কলা (খাট গাছ)	Banana (Table)	*Musa cavendishii*
৩৪.	কলা (দীর্ঘ গাছ)	Banana (Table)	*Musa sapientum*
৩৫.	কাঁচ কলা	Plantain/Cooking banana	*Musa Paradisiaca*
৩৬.	বীজওয়ালা কলা	Banana (Seeded)	*Musa balbisiana/ Musa acuminata*
		পরিবার (Family) : Myrtaceae	
৩৭.	কাল জাম	Indian black berry/Jamun	*Syzygium cuminii*
৩৮.	গোলাপ জাম	Rose apple	*Syzygium jambos*

৩৯.	অমৃত ফল	Malay apple	*Syzygium malaccense*
৪০.	জামরুল	Wax jambu	*Syzygium samarangense*
৪১.	পেয়ারা	Guava	*Psidium guajava*
		পরিবার (Family) : Oleaceae	
৪২.	জয়তুন	Olive	*Olea europea*
		পরিবার (Family) : Trapaceae	
৪৩.	পানি ফল	Water chestnut	*Trapa natans*
		পরিবার (Family) : Elaeocarpaceae	
৪৪.	জলপাই	Indian olive	*Elaeocarpus floribundus*
		পরিবার (Family) : Palmaceae	
৪৫.	তাল	Palmyra palm	*Borassus flabellifer*
৪৬.	নারিকেল	Coconut	*Cocos nucifera*
৪৭.	বন্য/দেশী খেজুর	Wild date palm	*Phoenix sylvestris*
৪৮.	আরবী খেজুর	Date palm	*Phoenix dactylifera*
		পরিবার (Family) : Passifloraceae	
৪৯.	প্যাশন ফল	Passion fruit	*Passiflora edulis*
		পরিবার (Family) : Lythraceae	
৫০.	ডালিম/বেদানা	Pomegranate	*Punica granatum*
		পরিবার (Family) : Rhamnaceae	

৫১.	বরই	Jujube	*Zizyphus jujuba*
		পরিবার (Family) : Rosaceae	
৫২.	স্ট্রবেরী	Straw berry	*Fragaria ananassa*
৫৩.	আপেল	Apple	*Malus sylvestris*
৫৪.	নাশপাতি	Pear (European)	*Pyrus communis*
৫৫.	পীচ	Peach	*Prunus persica*
		পরিবার (Family) : Rutaceae	
৫৬.	বেল	Wood apple	*Aegle marmelos*
৫৭.	কাগজী লেবু	Lime	*Citrus aurantifolia*
৫৮.	টক লেবু	Sour orange	*Citrus aurantium*
৫৯.	বাতাবী লেবু	Pummelo/Shaddock	*Citrus grandis*
৬০.	জামির	Jambhiri/Rough lemon	*Citrus jambhiri*
৬১.	পাতি/এলাচী লেবু	Lemon	*Citrus limon*
৬২.	কমলা লেবু	Mandarin/Tangarine	*Citrus reticulata*
৬৩.	মিষ্টি কমলা লেবু	Sweet orange/Malta	*Citrus sinensis*
৬৪.	কথবেল	Elephant apple	*Feronia limonia*
		পরিবার (Family) : Sapindaceae	
৬৫.	লিচু	Litchi/Lychee	*Litchi chinensis*
৬৭.	আঁশফল	Longan (tropical)	*Nephelium longana*
		পরিবার (Family) : Sapotaceae	
৬৭.	সফেদা	Sapota	*Achras sapota*
৬৮.	খিরণী	Khirni	*Mimusops hexandra*
		পরিবার (Family) : Tiliaceae	

৬৯.	ফলসা	Phalsa	*Grewia asiatica*
		পরিবার (Family) : Vitaceae	
৭০.	আঙ্গুর	Grape	*Vitis vinifera*

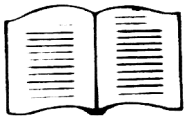

সারমর্ম ঃ পৃথিবীতে বহু ধরনের ভাষা প্রচলিত থাকায় একই উদ্ভিদ বিভিন্ন ভাষাভাষীর নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত। নামের বিভিন্নতার কারণে সৃষ্ট অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা একটি আন্তর্জাতিক কোড বা নিয়ম তৈরি করেছেন যাকে ইংরেজিতে ICBN (International Code of Binomial Nomenclature) বলা হয়। এ কোড অনুযায়ী প্রতিটি উদ্ভিদের একটি নাম দেয়া হয়েছে। এ নামকে উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম বলা হয়। ICBN অনুযায়ী উদ্ভিদের নামের দু'টি অংশ থাকে - প্রথম অংশকে জেনেরিক ইপিথেট বা গণের অংশ যা সব সময় বড় হরফে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় অংশ স্পেসিফিক ইপিথেট বা প্রজাতির অংশ যা সব সময় ছোট হরফে শুরু হয়। একে দ্বিপদ নামকরণ বা Binomial Nomenclature বলা হয়। এই কোড অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন ভাষায় বা ইংরেজি বাঁকা হরফে লিখতে হয় অথবা সোজা হরফে লিখলে নামের নিচে সরল রেখা টানতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। *Tamarindus indica* কোন্ ফলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম?
- ক) আম
- খ) কাঁঠাল
- গ) তেঁতুল

২। আমের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম কোন্‌টি?
- ক) *Mangifera dulcis*
- খ) *Mangifera indica*
- গ) *Mangifera sativa*

৩। কোন্‌টি কলার গণ নাম?
- ক) *Banana*
- খ) *Sapientum*
- গ) *Musa*

৪। কোন্‌টি পেঁপের প্রজাতি নাম?
- ক) *Papaya*
- খ) *carica*
- গ) *indica*

৫। কোন্‌টি তরমুজের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম?
- ক) *Citrullus lanatus*
- খ) *Cucumis melo*
- গ) *Cucumis sativus*

৬। কোন্‌টি টক লেবুর ইংরেজি নাম?
- ক) Sour lime
- খ) Sour orange
- গ) Sour apple

৭। কোন্‌টি বাতাবী লেবুর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম?
- ক) *Citrullus grandis*
- খ) *Citrus grandis*
- গ) *Citrus jambhiri*

পাঠ ১.৩ মানব পুষ্টিতে ফলের অবদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- খাদ্য ও পুষ্টির সংজ্ঞা লিখতে ও বলতে পারবেন।
- কোন্ ফলে কোন্ পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে তা বলতে পারবেন।
- কোন্ পুষ্টি উপাদানের কী কাজ তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব দেহের পুষ্টিতে ফলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পুষ্টি সমস্যার স্বরূপ

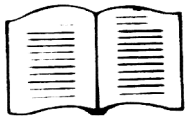

বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এদেশে প্রোটিনের ঘাটতি ব্যাপক। প্রোটিনের অভাবে এখানে শতকরা ৫০ ভাগ শিশু কাি খত ওজনের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পাঁচ বছর বয়সের নিচে শতকরা ৭৫ ভাগ শিশুই বিভিন্ন অপুষ্টির শিকার। শতকরা ৭৬ ভাগ পরিবার ক্যালরি জনিত এবং শতকরা ৯০ ভাগ পরিবার ভিটামিন এ জনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। শতকরা ৭৫ ভাগ মহিলা ও শিশু রক্ত শুন্যতায় ভুগছে এবং দশ মিলিয়ন লোক গলগন্ড রোগাক্রান্ত । ভিটামিন সি, রাইবোফ্লাভিন এবং ফলিক এসিডের ঘাটতিও খুবই প্রকট। অপুষ্টি জনিত শিশু মৃত্যুর হারও এখানে সর্বোচ্চ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো ধরনের অপুষ্টিতে ভুগছে।

খাদ্য ও পুষ্টি

যেসব দ্রব্য ভক্ষণ করলে শরীরের ক্ষয়পুরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাকেই খাদ্য বলে।

সহজ কথায় বলতে গেলে আমরা জীবন ধারণের জন্য যা খাই তাই খাদ্য। আরও একটু গুছিয়ে বলতে হলে যেসব দ্রব্য ভক্ষণ করলে শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাকেই খাদ্য বলে। খাদ্যের ছয়টি উপাদান হচ্ছে প্রোটিন (আমিষ), শর্করা (শ্বেতসার), চর্বি, ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ), খনিজ লবণ ও পানি। খাদ্য গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা। শরীরের সুস্থতা দেহের পুষ্টিসাধন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। যে প্রক্রিয়ায় দেহের অভ্যন্তরে খাদ্য পরিপাক হয়ে শক্তিতে পরিণত হয় এবং দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাপ শক্তি উৎপাদন করে তাকে পুষ্টি বলে।

ফলের পুষ্টিগত গুরুত্ব

ফলের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সহজ, সস্তা, সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ঠ উৎস হলো ফল।

মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। প্রধানত পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ফল খাওয়া হয় তবে স্বাদ ও পুষ্টিম ল্যের দিক দিয়ে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে সমাদৃত। ফলের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। আদিম যুগে মানুষ ফল খেয়েই দেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতঃ সুস্থভাবে বেঁচে থাকত। তাই বলে একই ফলে সব পুষ্টি উপাদান পরিমিত পরিমাণে পাওয়া যায়না। সব ফলেই সব ধরনের পুষ্টি উপাদান কমবেশি রয়েছে। তবে বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সহজ, সস্তা, সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট

উৎস হলো ফল। ফল রান্না ছাড়াই সরাসরি খাওয়া যায় বলে এর সব পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ কর্তৃক গৃহীত হয়। তাছাড়া ফল সহজপাচ্য, সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। মানব দেহের পুষ্টি সাধনে ফল কীভাবে অবদান রাখতে পারে তা সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হলো।

প্রোটিন সরবরাহে ফলের অবদান

ফলের মধ্যে কাঁঠাল, কলা, কিসমিস, খেজুর, ডুমুর, কথবেল, কাজুবাদাম, করমচা ইত্যাদি আমিষের উৎস হিসেবে বেশ সমৃদ্ধ।

সব বয়সের মানুষের জন্যই আমিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে ও অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলদের জন্য আমিষের চাহিদা সবচেয়ে বেশি । ফল আমিষের প্রধান উৎস না হলেও প্রত্যেক ফলেই কিছু না কিছু আমিষ থাকে। যদিও পরিমাণের দিক দিয়ে দেহের সম্পর্ণ আমিষের চাহিদা ফল পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনা। তবুও ফলের আমিষ অন্যান্য উদ্ভিদ উৎস থেকে নেয়া আমিষের আত্মীকরণ বাড়িয়ে দেয় এবং সুষমকরণ করতে সাহায্য করে। ফলে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড থাকে যা শরীরের অ্যামাইনো এসিডের ঘাটতি প রণ করে থাকে। ফলের মধ্যে কাঁঠাল (২.৬%), কলা (১.৩%), কিসমিস (২%), খেজুর (৩%), ডুমুর (১.৩%), কথবেল (৭.৩%), কাজুবাদাম (২১.২%), করমচা (২.৩%), ডালিম (১.৬%), পেয়ারা (১.৫%), বেল (১.৩%), এভোকেডো (১.৭%), ব্রেডফ্রুট (১.৫%) ইত্যাদি আমিষের উৎস হিসেবে বেশ সমৃদ্ধ।

শর্করা সরবরাহে ফলের অবদান

ফল শর্করা সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শর্করার দিক থেকে ফল খুবই সমৃদ্ধ।

দেহের শক্তির প্রধান উৎসই হলো শর্করা। ফল শর্করা সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শর্করার দিক থেকে ফল খুবই সমৃদ্ধ। ফল দানাজাতীয় শর্করার বিকল্প না হলেও পরিপূরক উৎস হিসেবে গন্য হতে পারে। ফলের মধ্যে কিসমিস (৭৭.৩%), করমচা (৬৭.১%), খেজুর (৬৭.৩%), কলা (৩৬.৪%), বেল (৩০.৬%), কথবেল (১৫.৫%), ডালিম (১৪.৬%), আনারস (১২%), পেঁপে (৯.৫%), কমলা (১০.৬%), ম্যাঙ্গোস্টিন (১৪.৩%), আম (১১.৮%), জাম (১৯.৭%), কাঁঠাল (১৮.৯%), ডুমুর (১৭.১%), কাজুবাদাম (২২.৩%), আমলকী (১৪.১%) ইত্যাদি শর্করার প্রধান উৎস।

চর্বি সরবরাহে ফলের অবদান

চর্বিজাতীয় খাদ্য দেহের সঞ্চিত শক্তি হিসেবে কাজ করে। অনেক ফল আছে যেগুলো চর্বির দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ। যেমন– কাজুবাদাম (৪৭%), এভোকেডো (২২.৮%), করমচা (৯.৬%), নারিকেল, লেমন, লাইম, কথবেল, কাঁঠাল বীজ ইত্যাদি।

খণিজ লবণ সরবরাহে ফলের অবদান

ফল হচ্ছে খণিজ লবণের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস।

খণিজ লবণ দেহ গঠনে বিশেষ করে হাড় ও দাঁত গঠনে এবং বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফল হচ্ছে খণিজ লবণের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস। প্রত্যেক ফলেই যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সালফার ও কপার আছে। এসব উপাদান দেহের প্রয়োজনীয় খণিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

এভোকেডো, বেল, করমচা, কাজুবাদাম, খেজুর, কিসমিস, কথবেল, পেয়ারা, লেচু, কাঁঠাল, লাইম, আতা, আমলকী, ব্রেডফ্রুট ইত্যাদি খণিজ লবণের উৎস হিসেবে বেশ সমৃদ্ধ।

ভিটামিন সরবরাহে ফলের অবদান

ফল ভিটামিনে ভরপুর। খাদ্যকে সুষমকরণ করতে এবং দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন সরবরাহে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

দেহের স্বাভাবিক গঠন ও পুষ্টিসাধনে ভিটামিন অপরিহার্য। ফল ভিটামিনে ভরপুর। খাদ্যকে সুষমকরণ করতে এবং দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন সরবরাহে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের মধ্যে ভিটামিন এ (ক্যারোটিন), থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নায়াসিন, নিকোটিনিক এসিড, ভিটামিন সি ইত্যাদি প্রধান। ক্যারোটিনের প্রধান উৎস হলো পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, খেজুর, ডুমুর, কমলা, বাতাবীলেবু, ডুমুর, বেল, ইত্যাদি। থায়ামিনের প্রধান উৎস হলো কলা, গ্রেপফ্রুট, কাজু বাদাম, লিচু, কমলা, আঙ্গুর, কিসমিস, ইত্যাদি। রিবোফ্লাবিনের উৎস হিসেবে ডালিম, কাজু বাদাম, পেঁপে, বেল, লিচু, আনারস ও কথবেল উল্লেখযোগ্য। কাজু বাদাম, বেল, খেজুর ও কিসমিস নায়াসিনের প্রধান উৎস। আবার আমলকী, পেয়ারা, কমলা, আনারস, পেঁপে, লেবু, লিচু, বাতাবী লেবু ইত্যাদি ফল ভিটামিন- সি এর প্রধান উৎস।

পানি সরবরাহে ফলের অবদান

শরীরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পানি। শরীরে পানির চাহিদাও সবচেয়ে বেশি। পানির কাজ হচ্ছে ক্ষতিকর, দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম হকে শরীর থেকে বের করে দেয়া এবং রক্তের প্রয়োজনীয় তরলতা (Liquidity) রক্ষা করা। বিভিন্ন ফলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে। এসব ফল পানির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে থাকে। আম, আনারস, পেঁপে, কমলা, কাঁঠাল, ম্যাঙ্গোস্টিন, লিচু, লেবুজাতীয় ফল, পেয়ারা, কুল, আমলকী, তরমুজ ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

উপরিউক্ত পুষ্টি উপাদান ছাড়াও ফলে অনেক জৈব এসিড ও এনজাইম থাকে যা শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জৈব এসিডসমূহ সাধারণত ক্ষুধার উদ্দীপক ও হজমে সাহায্য করে। পেঁপেতে পেপেইন ও আনারসে ব্রোমেলিন থাকে যা প্রোটিন হজমে সাহায্য করে। তাছাড়াও ফলে প্রচুর আঁশ থাকে যা পাকস্থলী ও অন্তকে সর্বদা উত্তেজিত ও কর্মক্ষম রাখে এবং পাচনতন্ত্রের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে। ফলের আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্যও দ র করে। ফল খেলে আনন্দে মন ভরে যায় ও তৃপ্তি লাভ হয় এবং দেহ সতেজ ও ঠান্ডা থাকে এবং মনও প্রফুল- থাকে।

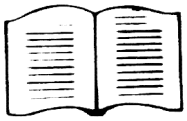

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এদেশে প্রোটিনের ঘাটতি ব্যাপক। প্রোটিনের অভাবে শতকরা ৫০ ভাগ শিশু কাক্ষিত ওজনের চেয়ে কম ওজন নিয়ে এদেশে জন্ম গ্রহণ করে। পাঁচ বছর বয়সের নিচে শতকরা ৭৫ ভাগ শিশুই বিভিন্ন অপুষ্টির শিকার। শতকরা ৭৬ ভাগ পরিবার ক্যালরি জনিত এবং শতকরা ৯০ ভাগ পরিবার ভিটামিন এ জনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। শতকরা ৭৫ ভাগ

মহিলা ও শিশু রক্ত শূন্যতায় ভুগছে এবং দশ মিলিয়ন লোক গলগন্ড রোগাক্রান্ত । প্রতি বছর এদেশে ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন সি, রাইবোফ্লাভিন ও ফলিক এসিডের ঘাটতি ও খুবই প্রকট। অপুষ্টি জনিত শিশু মৃত্যুর হারও এখানে সর্বোচ্চ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ধরনের অপুষ্টিতে ভুগছে। আমরা জীবন ধারণের জন্য যা খাই তাই খাদ্য। যেসব দ্রব্য ভক্ষণ

করলে শরীরের ক্ষয়প রণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাকেই খাদ্য বলে। খাদ্য গ্রহনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা। শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে দেহের পুষ্টিসাধন প্রক্রিয়ার ওপর। মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ফলের মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। সব বয়সের মানুষের জন্যই

আমিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে ও অন্ত ঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য আমিষের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। দেহের শক্তির প্রধান উৎসই হলো শর্করা। ফল শর্করা সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শর্করার দিক থেকে ফল খুবই সমৃদ্ধ। ফল খণিজ লবণের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস। দেহের স্বাভাবিক গঠন ও পুষ্টিসাধনে ভিটামিন অপরিহার্য। ফল হচ্ছে ভিটামিনে ভরপুর। খাদ্যকে সুষমকরণ করতে এবং দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন সরবরাহে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। একজন সুস্থ মানুষের দৈনিক কমপক্ষে কতটুকু ফল খাওয়া দরকার?
- ক) ৮০ গ্রাম
- খ) ১৬০ গ্রাম
- গ) ১১৫ গ্রাম

২। আমাদের দেশের মানুষেরা দৈনিক মাথাপিছু কতটুকু ফল খায়?
- ক) ১০ গ্রাম
- খ) ৩৮ গ্রাম
- গ) ১০০ গ্রাম

৩। কোন্ কোন্ ফলে ভিটামিন ‘এ’ বেশি থাকে?
- ক) কাঁচা পেঁপে ও কাঁচা আম
- খ) পাকা আম ও পাকা পেঁপে
- গ) পেয়ারা

৪। কোন্ কোন্ ফলে ভিটামিন ‘সি’ বেশি থাকে?
- ক) আমলকী, পেয়ারা লেবু
- খ) কলা, ও লিচু
- গ) আপেল, কিসমিস ও কাঁঠাল

৫। কোন্ কোন্ ফলে পানি বেশি থাকে?
- ক) তরমুজ ও লেবু
- খ) খেজুর, তাল ও কিসমিস
- গ) কলা, কাজুবাদাম ও আমড়া

৬। কোন্ কোন্ ফলে আমিষ বেশি থাকে?
- ক) আম, তরমুজ ও লেবু
- খ) কলা, কাজুবাদাম ও আমড়া
- গ) কাঁঠাল, কাজুবাদাম ও কিসমিস

৭। কোন্ কোন্ ফলে শর্করা বেশি থাকে?
- ক) আম, কলা ও খেজুর
- খ) নারিকেল, তাল ও ডুমুর
- গ) পেয়ারা, লেবু ও আমলকী

পাঠ ১.৪ ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান সম্পর্কে লিখতে ও বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থ বছরে ফলের রফতানি আয় সম্পর্কে লিখতে ও বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ফল চাষের অর্থনৈতিক দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

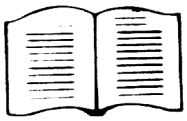

ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু খাদ্য হিসেবে নয়, মানব দেহের পুষ্টি সাধনে, জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে, সামাজিক কর্মকান্ডে, চিকিৎসা শাস্ত্রে ইত্যাদিতে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। ফল চাষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কীভাবে অবদান রাখছে সে সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান

আমাদের জি.ডি.পি.তে কৃষি সেক্টরের অবদান যেখানে শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ সেখানে ফল ও ফলজাতদ্রব্য একক-ভাবে শতকরা প্রায় ২.৩ ভাগ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র শতকরা ১.৭৫ ভাগ জমি ফল চাষের আওতায় রয়েছে অথচ মোট খাদ্য শস্যের শতকরা ৮.৫ ভাগ আসে ফল থেকে। টাকার অংকে হিসেব করলে দেখা যায় যে, মোট ফসলভিত্তিক আয়ের শতকরা ১০ ভাগ আসে ফল থেকে। ফলের বাজার-মূল্য সব সময় বেশি থাকে বিধায় ফলের গড় আয় অন্যান্য ফসলের তুলনায় কমপক্ষে পাঁচগুণ বেশি। আমাদের জি.ডি.পি.তে কৃষি সেক্টরের অবদান যেখানে শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ সেখানে ফল ও ফলজাতদ্রব্য এককভাবে শতকরা প্রায় ২.৩ ভাগ অবদান রাখছে। ফল রফতানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন অর্থ বছরের ফলের রফতানি আয় সারণি ১ এ দেখানো হলো।

সারণি ১ঃ বিভিন্ন অর্থ বছরে ফলের রফতানি আয়

অর্থ বছর	রফতানি আয় (হাজার টাকা)
১৯৮৭-৮৮	১৫১৫
১৯৮৮-৮৯	৫২৫২
১৯৮৯-৯০	৭১৩৩
১৯৯০-৯১	১৬৮১৮
১৯৯১-৯২	১০৭৬০
১৯৯২-৯৩	৯০৬৫
১৯৯৩-৯৪	৭৯৭৮
১৯৯৪-৯৫	২৬৪৬

উৎস ঃ রফতানি আয় (১৯৯৪-৯৫)

উপরের ১ নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ফল রফতানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

কৃষকের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে ফলের আবদান

কোনো কোনো ফল গাছ (যেমন– নারিকেল, পেঁপে ইত্যাদি) কৃষকের স্থাবর সম্পত্তি বা সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশের কৃষি মূলতঃ ধানভিত্তিক হওয়ায় এদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ নিতান্তই কম এবং এর পরিমাণ বাড়ানোর সম্ভাবনাও খুব সীমিত। এদেশে প্রধান প্রধান ফসল যেমন- ধান, গম, পাট, সরিষা ইত্যাদির ফলন ৩ টনেরও কম অথচ অধিকাংশ ফলেরই গড় ফলন ৮ টনের উপরে যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩০ টন পর্যন্ত হতে পারে (যেমন- কলা, পেঁপে ইত্যাদি)। বাজার মূল্যের দিক থেকে ফল সব সময়ই ধান, গম, সরিষা ইত্যাদি প্রধান খাদ্য শষ্যের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক, কারণ ফলের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় এর বাজার দর সব সময় চড়া থাকে। তাই ফল চাষ করে কৃষক আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হতে পারেন। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ফল গাছ (যেমন- নারিকেল, পেঁপে ইত্যাদি) কৃষকের স্থাবর সম্পত্তি বা সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে থাকে। পরিকল্পিতভাবে ফল চাষ করে ফলচাষী প্রতি মাসেই নগদ টাকা ঘরে আনতে পারেন এবং এ আয়ের পরিমাণ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি তা চাকুরীজীবীদের মাসিক বেতনের মত কৃষকের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অনেক পতিত জায়গা বা প্রান্তিক জমি অথবা বসতবাড়ীতে যেখানে অন্যান্য ফসল (ধান, পাট ইত্যাদি) চাষ করা সম্ভব নয় সেখানেও ফল চাষ করে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব। রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, রেল লাইনের পাশে, ঈদগাহ্ ময়দানে, মসজিদ বা মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায়, পাহাড়ের ঢালে, উপকূলীয় বাঁধে, জমির আইলে ইত্যাদি স্থানে তাল, খেজুর, নারিকেল ইত্যাদি ফলগাছ লাগিয়ে অনায়াসেই প্রচুর টাকা আয় করা যায়। যেখানে ধান, গম, পাট ইত্যাদির চাষ করে হেক্টর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করা যায় সেখানে ফল চাষ করে সহজেই কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় করা সম্ভব। অধিকন্তু ফল বাগানে আন্ত ঃফসল চাষ করে এ আয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভব।

কোনো কোনো ফল গাছ (যেমন নারিকেল, পেঁপে ইত্যাদি) কৃষকের স্থাবর সম্পত্তি বা সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে।

নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফলের অবদান

নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যের নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব। শুধুমাত্র ফলের বাণিজ্যিক নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বহু লোক আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করেছেন। দেশের উঁচু এলাকায় জমির আইল ও রাস্তার পাশে অধিক সংখ্যক তাল ও খেজুর গাছ লাগিয়ে এবং এদের রস থেকে গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে বহু পুরুষ ও মহিলার কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। এভাবে অধিক মাত্রায় গুড় উৎপাদন করে চিনির ওপর চাপ কমানো এবং বাড়তি চিনি আমদানি থেকে রেহাই পাওয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে চিনি আমদানি জনিত বৈদেশিক

দেশের উঁচু এলাকায় জমির আইল ও রাস্তার পাশে অধিক সংখ্যক তাল ও খেজুর গাছ লাগিয়ে এবং এদের রস থেকে গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে বহু পুরুষ ও মহিলার কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

মুদ্রার সাশ্রয় করা সম্ভব। ডাবের ছোবরা থেকে উন্নত মানের গাম ও ডাই (রং) তৈরি করা যায়। নারিকেলের ছোবড়া থেকে গদি, জাজিম ও কাছি তৈরি করা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশ বিদেশ থেকে অনেক ফলজাত দ্রব্য যেমন স্কোয়াশ, কর্ডিয়াল, ফলের রস ও শরবত, আচার ইত্যাদি আমদানি হচ্ছে। এসব আমদানি বন্ধ করে দেশে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব খাতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। গ্রামীন অর্থনীতিতে ফলের অবদান অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, বেশি পরিমাণে এসব ফলজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এদেশে ফলের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচুর সুযোগ ও উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কত বেশি। শুধু তাই নয়, ফল গাছের পাতা গরু- ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার, বয়স্ক ফল গাছের কান্ড ও শাখা থেকে উন্নত মানের টিম্বার উৎপাদন, যানবাহন ও ঘরের খুঁটি তৈরি, ডালপালা ও পত্র- পল্লব জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার, অনেক ফল ও ফল গাছের অংশ- বিশেষ দ্বারা ঔষুধ তৈরিকরণ, কুটির শিল্প স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে ফল গাছ, ফল ও ফলজাত দ্রব্যের অর্থনৈতিক অবদান ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

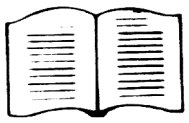

সারমর্ম ঃ ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র শতকরা ১.৭৫ ভাগ জমি ফল চাষের আওতায় রয়েছে অথচ মোট খাদ্য শস্যের শতকরা ৮.৫ ভাগ আসে ফল থেকে। টাকার অংকে হিসেব করলে দেখা যায় যে, মোট ফসলভিত্তিক আয়ের শতকরা ১০ ভাগ আসে ফল থেকে। ফলের বাজার-মূল্য সব সময় বেশি থাকে বিধায় ফলের গড় আয় অন্যান্য ফসলের তুলনায় কমপক্ষে পাঁচগুণ বেশি। আমাদের জি.ডি.পি.তে কৃষি সেক্টরের অবদান যেখানে শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ সেখানে ফল ও ফলজাতদ্রব্য এককভাবে শতকরা প্রায় ২.৩ ভাগ অবদান রাখছে। ফল রফতানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। বাজার মূল্যের দিক থেকে ফল সব সময়ই ধান, গম, সরিষা ইত্যাদি প্রধান খাদ্য শষ্যের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক, কারণ ফলের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় এর বাজার দর সব সময় চড়া থাকে। তাই ফল চাষ করে কৃষক আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হতে পারেন। বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যের নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কেমন?
- ক) খুব বেশি
- খ) মাঝামাঝি
- গ) বেশি নয়

২। অর্থনৈতিক বিবেচনায় কোন্ কোন্ ফল বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
- ক) কলা, পেঁপে, কাঁঠাল ও আম
- খ) খেজুর, তাল, বেল ও কুল
- গ) আমলকী, লেবু, ডালিম ও ডুমুর

৩। বাণিজ্যিক ফল হিসাবে কোন্ ফল সবচেয়ে বেশি জন্মানো হয়?
- ক) আম
- খ) কাঁঠাল
- গ) কলা

৪। এক হেক্টর জমিতে কলা চাষ করে কত টাকা আয় করা যায়?
- ক) এক লক্ষ টাকা
- খ) দুই লক্ষ টাকা
- গ) দেড় লক্ষ টাকা

৫। এক হেক্টর জমিতে পেঁপে চাষ করে কত টাকা আয় করা যায়?
- ক) এক লক্ষ টাকা
- খ) দুই লক্ষ টাকা
- গ) তিন লক্ষ টাকা

৬। নিম্নে উল্লেখিত কোন্ ফল চাষে লাভ বেশি?
- ক) আম
- খ) জাম
- গ) কাঁঠাল

৭। কোন্ ফলকে এম পি টি (MPT) বলা হয়?
- ক) কলা
- খ) কাঁঠাল
- গ) আনারস

৮। কোন্ ফসল চাষ করা বেশি লাভজনক?

ক) ধান

খ) ফল

গ) সবজী

পাঠ ১.৫ ফল উৎপাদন পরিস্থিতি ও ফল ব্যবহার সমীক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ লিখতে ও বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ফলের গড় ফলন বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ফল উৎপাদন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল ব্যবহার সমীক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ফল উৎপাদন পরিস্থিতি

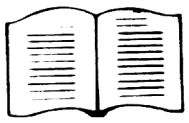

বাংলাদেশের ফল উৎপাদন পরিস্থিতি ব্যাখা করতে গেলে প্রথমেই বাংলাদেশের ফল পরিসংখ্যান জানা আবশ্যক। তবে বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা খুবই কঠিন। কারণ দু' একটি প্রধান ফল ছাড়া কোনো ফলই ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে বাগান আকারে বেশি পরিমাণ জমিতে চাষ করা হয় না। তাছাড়া বাংলাদেশে আইল ও বসতবাড়ীর সংখ্যা এত বেশি যে এগুলোতে জন্মানো বিভিন্ন ফলগাছের মোট ফলন ও জমির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।থতবুও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ফলের অধীনস্থ জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ 'বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস্' গ্রন্থে প্রকাশ করে থাকেন। এ তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত ফলের পরিসংখ্যান সারণি ২-এ দেখানো হলো।

সারণি ২ঃ বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদন

সাল	মোট জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)	ফলন (টন/হেক্টর)
১৯৯০-৯১	২৪৭	১৮৩৬	৭.৪৪
১৯৯১-৯২	২৪৯	১৮৪০	৭.৪০
১৯৯২-৯৩	২৫১	১৮৬৩	৭.৪১
১৯৯৩-৯৪	২৫৫	১৮৮৫	৭.৪০
১৯৯৪-৯৫	২৫৭	১৯০৭	৭.৪২
১৯৯৫-৯৬	২৫৯	১৯১৮	৭.৪১

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫৯ হাজার হেক্টর জমিতে ফলের চাষ করা হয়ে থাকে। হিসেব অনুযায়ী এ জমির পরিমাণ মোট চাষভুক্ত জমির মাত্র শতকরা ১.৭৫ ভাগ।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫৯ হাজার হেক্টর জমিতে ফলের চাষ করা হয়ে থাকে। হিসেব অনুযায়ী এ জমির পরিমাণ মোট চাষভুক্ত জমির মাত্র শতকরা ১.৭৫ ভাগ। এতেই বোঝা যায় বাংলাদেশে ফল চাষভুক্ত জমির পরিমাণ কত নগণ্য। যদিও দিন দিন ফলের অধীনস্থ জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে, এ বৃদ্ধির হার কোনো ক্রমেই আশাব্যঞ্জক নয়। এদেশে ফল চাষের আওতায় ১৯৭১-৭২ সালে জমির পরিমাণ ছিল ১৩০ হাজার হেক্টর। বিগত ২৫ বছরে ফলের জমি বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৯ হাজার হেক্টর। এ হিসেব থেকে সহজেই বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। সারণি ২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিগত ছয় বছরে ফলের জমির পরিমাণ ২৪৭ হাজার হেক্টর থেকে বেড়ে ২৫৯ হাজার হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ফলের মোট উৎপাদন ১৮৩৬ হাজার টন থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯১৮ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ফলের উৎপাদন ছিল ১৯১২ হাজার টন। বিগত দশ/এগার বছরে ফলের জমি বেড়েছে ২৫ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন সে তুলনায় খুব সামান্যই বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে ফল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৯১৮ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় তা মাত্র ৬ হাজার মেট্রিক টন বেশি।

সারণি ৩ঃ বিভাগ ওয়ারী ফলের জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদন

বিভাগ	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)				মোট উৎপাদন (হাজার টন)			
	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
চট্রগ্রাম	৫৩	৫৪	৫৪	৫৪	৪৩৮	৪৩৭	৪৪০	৪৪৮
ঢাকা	৪৮	৪৯	৫০	৫০	৪০৭	৪২০	৪১৬	৪১৮
রাজশাহী	৫২	৫৩	৫৪	৫৪	৩৭৮	৩৮০	৩৮৫	৩৮২
খুলনা	৫০	৫০	৫০	৫০	৩৩৯	৩৪০	৩৫১	৩৪৮
বরিশাল	৩২	৩৩	৩৩	৩৪	১৭৫	১৮০	১৮৪	১৮৭
সিলেট	১৬	১৬	১৬	১৭	১২৬	১২৮	১৩১	১৩৫
বাংলাদেশ	২৫১	২৫৫	২৫৭	২৫৯	১৮৬৩	১৮৮৫	১৯০৭	১৯১৮

সারণি ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের মধ্যে চট্রগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে ফলের অধীনস্থ জমি ও উৎপাদনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তাছাড়া ঐ বিভাগগুলোতে বিগত কয়েক বছরে ফলের জমি ও উৎপাদন মোটামুটিভাবে একই অবস্থানে আছে। আরও লক্ষণীয় যে, ফলের জমির দিক থেকে চট্টগ্রাম বিভাগ বরাবরই প্রথম স্থানে ও সিলেট বিভাগ সর্বনিম্নে অবস্থান করছে অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বাধিক জমিতে ও সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম জমিতে ফল উৎপাদিত হয়। উৎপাদনের দিক থেকেও চট্টগ্রাম বিভাগ প্রথম স্থানে। ঢাকা বিভাগ দ্বিতীয়, রাজশাহী বিভাগ তৃতীয়, খুলনা বিভাগ চতুর্থ, বরিশাল বিভাগ পঞ্চম এবং

সিলেট বিভাগ ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে। সাম্প্রতিক কালে আমের ফলন দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় রাজশাহী বিভাগে ফলের মোট উৎপাদন কমে গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সারণি ৪ঃ বিভিন্ন ফলের আওতায় জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও ফলন (১৯৯৫-৯৬)

ফলের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেঃ)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)	ফলন (টন/হেক্টর)
কলা	৪০	৬৩৪	১৫.৯
আম	৫০	১৮৬	৩.৭
আনারস	১৪	১৪৯	১০.৬
কাঁঠাল	২৬	২৫৬	৯.৮
অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল	২	৮	৪.০
পেঁপে		৩৮	৭.৬
তরমুজ	১২	৯৬	৮.০
লিচু	৪	১২	৩.০
লেবু	৪	১২	৩.০
কুল	৪	১৩	৩.৩
কমলা	১	১	১.০
পেয়ারা	৯	৪০	৪.৪
বাতাবী লেবু	৪	১৩	৩.৩
খেজুর	১০	২৩১	২৩.১
তাল	৩	৮৪	২৮.০
সুপারি	৩৬	২৬	০.৭
নারিকেল	২৯	৮৯	৩.১
অন্যান্য ফল	৬	২১	৩.৫
বাংলাদেশ	২৫৯	১৯১৮	৭.৪

এদেশে দ্রুত বর্ধনশীল ফলই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দ্রুত বর্ধনশীল ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস ও তরমুজই প্রধান।

সারণি ৪ এ উল্লেখিত তথ্য মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে দ্রুত বর্ধনশীল ফলই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দ্রুত বধর্নশীল ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস ও তরমুজই প্রধান। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ হচ্ছে দ্রুত বধর্নশীল ফল। আবার দ্রুত বধর্নশীল ফলের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে কলা। পেঁপে, লিচু, লেবু জাতীয় ফল, কুল, পেয়ারা, তাল ও অন্যান্য ফলের আওতায় জমির পরিমাণ খুবই কম। আবার লিচু, কুল, আম, পেয়ারা, নারিকেল ও লেবুজাতীয় ফলের গড় ফলন অত্যন্ত কম। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এদেশে ফলের উৎপাদন বাড়ানোর এখনও যথেষ্ট সুযোগ আছে।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফলের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬০-৭০ টন, সেখানে আমাদের দেশে তা মাত্র ৭ টনের মত।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটি ফল চাষের জন্য অনুকূল থাকায় ফলের উৎপাদন বাড়ানোর বেশ সুযোগ রয়েছে। অনেক বিদেশী ফল যেমন রাম্বুটান, ম্যাঙ্গোস্টিন,

আঙ্গুর, স্ট্রবেরী, এভোকেডো, কাজুবাদাম প্রভৃতি ফলও এদেশে জন্মানোর বেশ সুযোগ আছে। বর্তমানে এদেশে মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র শতকরা ১.৭৫ ভাগ জমিতে ফল চাষ হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলের অনেক পতিত জমি, চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বেশ কিছু পাহাড়িয়া অঞ্চল, বড় রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, বিভিন্ন অফিস সংলগ্ন মাঠ, আদালত প্রাঙ্গন, রেললাইনের পাশ, বসত বাড়ীর আশপাশে এবং অনুরূপ আরও অনেক জমিতে অধিক সংখ্যায় ফলের গাছ লাগিয়ে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ ও সম্ভবনা এদেশে এখনও বিদ্যমান আছে। তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে

ইতিপূর্বে রোপিত ফলগাছসম হের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফলের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬০-৭০ টন, সেখানে আমাদের দেশে তা মাত্র ৭ টনের মত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে আমাদের দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কত বেশি।

ফল চাষীদের সমস্যাও কিন্তু কম নয়। জমির স্বল্পতা ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা, লাগসই প্রযুক্তির অভাব, কৃষকের শিক্ষার অভাব, দারিদ্র ও ঋণগ্রস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্থিক ঝুকীর অনিশ্চয়তা, ফল সংরক্ষণের অসুবিধা, পরিবহন সমস্যা, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অভাব, বিপণন সমস্যা, শস্য বীমার অনুপস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণ কৃষকদের ফল চাষের আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ১৯১৮ হাজার মেট্রিক টন ফল উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মোট চাহিদা হচ্ছে ৫৪৫৭ হাজার মেট্রিক টন। সে মোতাবেক ফলের উৎপাদন কমপক্ষে তিনগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ফলচাষীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারী অঙ্গীকার ও সাহায্য সহযোগিতা এবং জনগণের সচেতনতা ও সদিচ্ছা ফলের উৎপাদন বাড়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

ফল ব্যবহার সমীক্ষা

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের বেশির ভাগই টাটকা অবস্থায় (Fresh) খাওয়া হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অভাব বা সংরক্ষণ সুবিধা না থাকায় উৎপাদিত ফলের বেশ কিছু অংশ (১৫-২০%) পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সময় পচে নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের বেশির ভাগ ফলই মৌসুম ভিত্তিক হওয়ায় মৌসুমের পরে ঐ ফল আর খাওয়া সম্ভব হয় না। অথচ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বেশ কিছু ফল সব সময় খাওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে কিছু কিছু ফল আবার টাটকা রস (juice) হিসেবে খাওয়া হয় যেমন- তাল, খেজুর, কমলা, আনারস, আম ইত্যাদি।

আর্থিক দৈন্যের কারণে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে খাওয়ার পর ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। অথচ উন্নত দেশে ফল ছাড়া খাওয়াই সম্পর্ণ হয় না। সেখানে কোনো কোনো ফল টাটকা অবস্থায় এবং বেশির ভাগ ফলই টাটকা অবস্থায় অথবা প্রক্রিয়াজাত করে (শুকীয়ে, আচার/চাটনি, জ্যাম, জেলী, স্কোয়াস, সিরাপ, শরবত, মার্মালেড,

মোরব্বা, কর্ডিয়াল, কেক ও কাসটার্ড হিসেবে) খাওয়া হয়, যেমন- আম, জলপাই, কুল, তেঁতুল, লেবু, কমলা, কলা, তাল ইত্যাদি। তবে আমাদের দেশে ফলের ব্যবহার বেশ বিচিত্র। প্রাচীন প্রথা হিসেবে আমরা এখনও রোগী দেখতে গেলে হাতে করে ফল নিয়ে যাই। অর্থাৎ ফল একটি উৎকৃষ্ট মানের উপাদেয় পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এ দেশে। অথচ সুস্থ অবস্থায় আমরা ফল খুব একটা খাইনা। অনেক সময় বাসায় বেড়াতে গেলে অনেকে শুধু ফল অথবা ফলের শরবত খাওয়ায়ে অতিথি/বন্ধু-বান্ধব আপ্যায়ন করে থাকেন। ফল সম্পর্কে আমাদের সনাতন মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। এর জন্যে বড় প্রয়োজন হচ্ছে দেশীয় বিভিন্ন ফলের পুষ্টিমান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন এবং স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক দৈনন্দিন প্রধান খাবারের সাথে প্রয়োজনীয় ফল খাওয়াকে রীতি বা অভ্যাস হিসেবে অধিগ্রহণ।

স্বাস্থ্যের জন্য বলকারক টনিক তৈরিতে ত্রিফলার নাম প্রায় সবার জানা যার মধ্যে থাকে আমলকী, হরিতকী ও বয়রা।

এদেশে ওষুধ শিল্পেও ফলের ব্যবহার আছে। পেটের পীড়া সারানোর জন্য বেল ও পেঁপে খেতে পরামর্শ দেয়া হয়। স্বাস্থ্যের জন্য বলকারক টনিক তৈরিতে ত্রিফলার নাম প্রায় সবার জানা যার মধ্যে থাকে আমলকী, হরিতকী ও বয়রা। কাঁচা আম চক্ষুপ্রদাহ ও পাকা আম যকৃতের জন্য কাজ করে থাকে। আমড়া ও আমলকী ফল অজীর্নতা ও স্কার্ভি রোগ নিরাময়ে ব্যবহারিত হয়ে থাকে। জন্ম বার্ষিকী পালন, বিবাহ উৎসব ও বিবাহ বার্ষিকী পালন, জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে আপ্যায়নের জন্য ফল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন পুজা পার্বনে ফল ও ফল গাছের বিভিন্ন অংশ উপাসনা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন- পুজায় বেলের ফল ও পাতা উভয়ই ব্যবহারিত হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ফল পাওয়া গেলেও নাজুক আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে

ইচ্ছে থাকা সত্বেও অনেকেই ফল কিনে খেতে পারেন না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অথবা অসুখ-বিসুখে না পড়লে ফল খাওয়ার কথা অনেকেই ভাবতে পারেন না। দারিদ্রকে এর প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করলেও দারিদ্র্য কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। পুষ্টি সম্পর্কে মানুষের সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং খাদ্যাভ্যাসও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। ফলের পুষ্টিগত মান সম্পর্কে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সুষ্ঠু ও ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে দেশের পুষ্টি সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হবে এবং ফলের উৎপাদন বেড়ে যাবে।

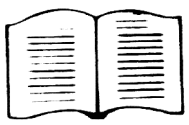

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫৯ হাজার হেক্টর জমিতে ফলের চাষ করা হয়ে থাকে। হিসেব অনুযায়ী এ জমির পরিমাণ মোট চাষভুক্ত জমির মাত্র শতকরা ১.৭৫ ভাগ। বিগত দশ/এগার বছরে ফলের জমি বেড়েছে ২৫ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন সে তুলনায় খুব সামান্যই বেড়েছে। দ্রুত বধর্নশীল ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস ও তরমুজই প্রধান। ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ হচ্ছে দ্রুত বধর্নশীল ফল। আবার দ্রুত বধর্নশীল ফলের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে কলা। এ থেকে অনুমান করা যায় যে আমাদের দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কত বেশি। বর্তমানে আমাদের দেশে

১৯১৮ হাজার মেট্রিক টন ফল উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মোট চাহিদা হচ্ছে ৫৪৫৭ হাজার মেট্রিক টন। সে মোতাবেক ফলের উৎপাদন কমপক্ষে তিনগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের বেশির ভাগই টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয়। আমাদের বেশির ভাগ ফলই মৌসুম ভিত্তিক হওয়ায় মৌসুমের পরে ঐ ফল আর খাওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমনই নাজুক যে, ইচ্ছে থাকা সত্তেও অনেকেই ফল কিনে খেতে পারেন না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অথবা অসুখ-বিসুখে না পড়লে কিংবা মৃত্যু শয্যায় না গেলে ফল খাওয়ার কথা অনেকেই ভাবতেই পারেন না। দারিদ্রকে এর প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করলেও দারিদ্র কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। পুষ্টি সম্পর্কে মানুষের সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং খাদ্যাভ্যাসও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ কত?
- ক) ২৫৯ হাজার হেক্টর
- খ) ২১০ হাজার হেক্টর
- গ) ৫০০ হাজার হেক্টর

২। আমাদের দেশের ফলের মোট উৎপাদন কত?
- ক) ১৯১৮ হাজার টন
- খ) ১৯৬০ হাজার টন
- গ) ১৯৯০ হাজার টন

৩। ফলের আওতায় জমির পরিমাণ মোট চাষযোগ্য জমির কত অংশ?
- ক) ১.৭৫%
- খ) ২.১৫%
- গ) ২.৫০%

৪। বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কত?
- ক) ১৩৬৮৮ হাজার
- খ) ১৪৮২৮ হাজার হেক্টর
- গ) ১৫০৩৩ হাজার হেক্টর

৫। দ্রুত বর্ধনশীল ফলের উৎপাদন ফলের মোট উৎপাদনের শতকরা কত ভাগ?
- ক) শতকরা ৪০ ভাগ
- খ) শতকরা ৪৮ ভাগ
- গ) শতকরা ৬০ ভাগ

৬। দ্রুত বর্ধনশীল ফলের মধ্যে কোন্ ফলটি বেশি উৎপন্ন হয়?
- ক) কলা
- খ) পেঁপে
- গ) আনারস

৭। কলার উৎপাদন মোট দ্রুত বর্ধনশীল ফলের শতকরা কত ভাগ?
- ক) শতকরা ৪০ ভাগ
- খ) শতকরা ৬০ ভাগ
- গ) শতকরা ৭০ ভাগ

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ ফলের জমি ও উৎপাদন সমীক্ষার ওপর চার্ট তৈরিকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কোন্ ফলের আওতায় কত জমি চাষ হচ্ছে তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
- ফল উৎপাদনের ওপর চার্ট তৈরি করতে পারবেন।
- ফলের জমির ওপর চার্ট তৈরি করতে পারবেন।

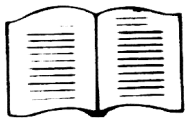

ফলের জমির ওপর চার্ট তৈরিকরণ

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

- ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ফলের জমির পরিসংখ্যান
- পেনসিল
- গ্রাফ পেপার
- স্কেল
- পেনসিল কম্পাস

কাজের ধাপ

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বছরগুলোকে গ্রাফ পেপারে X এক্সিসে ও জমির পরিমাণকে Y এক্সিসে বসান। অতঃপর সঠিকভাবে লাইন টেনে বারগ্রাফ তৈরি করুন।

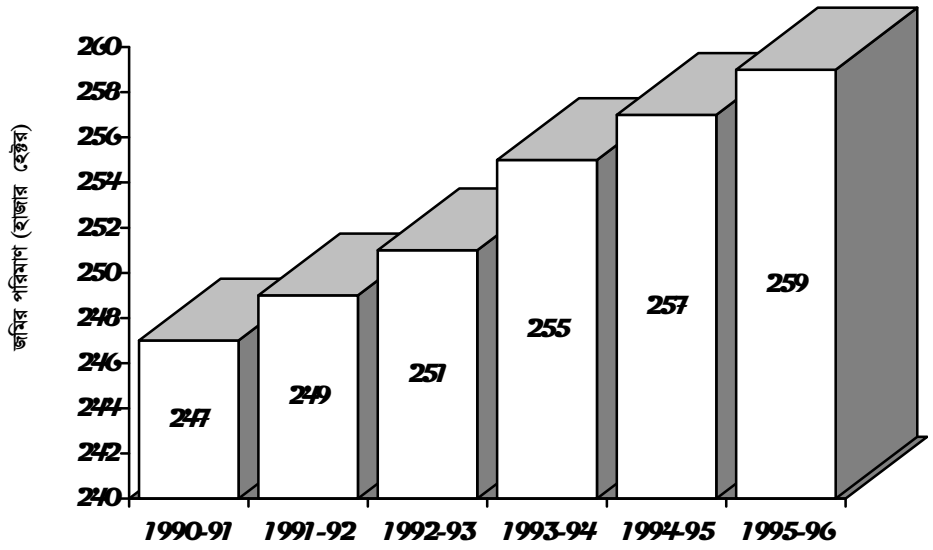

চিত্র ১.৬.১ঃ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত ফলের জমির ওপর বার গ্রাফ

ফল উৎপাদন সমীক্ষার ওপর চার্ট তৈরিকরণ।

প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ফলের উৎপাদন পরিসংখ্যান

- পেনসিল
- গ্রাফ পেপার
- স্কেল
- পেনসিল কম্পাস

কাজের ধাপ

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বছরগুলোকে গ্রাফ পেপারে X এক্সিসে ও ফলের উৎপাদনকে Y এক্সিসে বসান। অতঃপর সঠিকভাবে লাইন টেনে বার গ্রাফ তৈরি করুন।

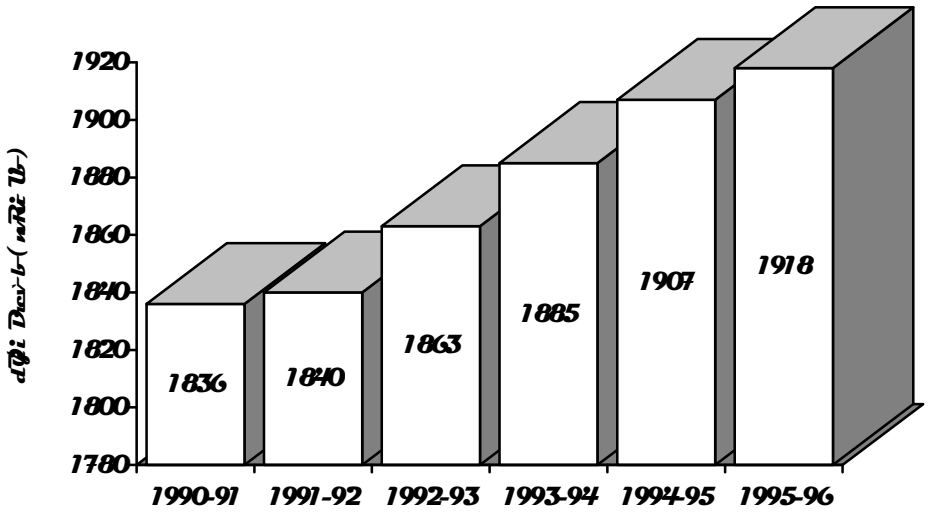

চিত্র ১.৬.২ঃ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত ফল উৎপাদনের ওপর বার গ্রাফ

অনুশীলন (Activity) ঃ ফলের জমি ও ফল উৎপাদন এর ওপর বিভাগ ওয়ারী চার্ট তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশে কোন্ ফলের আওতায় জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
- ক) আম
- খ) জাম
- গ) কলা
- ঘ) কাঁঠাল

২। বাংলাদেশে কোন্ ফলের মোট ফলন সবচেয়ে বেশি?
- ক) কলা
- খ) পেঁপে
- গ) আম
- ঘ) আনারস

৩। বাংলাদেশে কোন্ ফলের হেক্টর প্রতি গড় ফলন সবচেয়ে বেশি?
- ক) কলা
- খ) পেঁপে
- গ) আম
- ঘ) খেজুর

৪। কলার অধীনস্থ জমির পরিমাণ কত হেক্টর?
- ক) ৪০ হাজার হেক্টর
- খ) ৫০ হাজার হেক্টর
- গ) ৬৫ হাজার হেক্টর

৫। আমের অধীনস্থ জমির পরিমাণ কত হেক্টর?
- ক) ৪০ হাজার হেক্টর
- খ) ৫০ হাজার হেক্টর
- গ) ৬০ হাজার হেক্টর

পাঠ ১.৭ ফলের ভিটামিন ও খণিজ মানের ওপর চার্ট তৈরিকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন ফলে বিদ্যমান সব ভিটামিনের পরিমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ফলে বিদ্যমান খণিজ মানের পরিমাণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ফলের ভিটামিন ও খণিজ মানের ওপর চার্ট তৈরি করতে পারবেন।

ফলের ভিটামিন ও খণিজ মানের ওপর চার্ট তৈরিকরণ

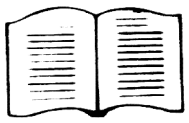

সারণি ঃ বিভিন্ন ফলের ভিটামিন ও খণিজ মানের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)

ফলের নাম	ক্যালসিয়াম মি. গ্রা.	ফসফরাস মি. গ্রা.	লৌহ মি. গ্রা.	ক্যারোটিন মি গ্রা.	থায়ামিন মি. গ্রা.	রিবোফ্লাভিন মি. গ্রা	নিয়াসন মি. গ্রা.	ভিটামিন সি মি. গ্রা.
আঙ্গুর	২০	২৩	০.৫	৩	০.০৪	০.০৩	০.২	১
আতা	১০	১০	০.৬	৬৭	-	০.০৭	০.৬	৫
আনারস	২০	৯	১.২	১৮	০.২০	০.১২	০.১	৯
আম (পাকা)	১৪	১৬	১.৩	২৭৪৩	০.০৮	০.০৯	০.৯	১৬
আমড়া	৩৬	১১	৩.৯	২৭০	০.০২	০.০২	০.৩	২১
আপেল	১০	১৪	১.০	০	-	-	০	১
আমলকী	৫০	২০	১.২	৯	০.০৩	০.০১	০.২	৬০০
কমলালেবু	২৬	২০	০.৩	১১০৪	-	-	-	৩০
কলা	১৭	৩৬	০.৯	৭৮	০.০৫	০.০৮	০.৫	৭
কাগজি লেবু	৯০	২০	০.৩	১৫	০.০২	০.০৩	০.১	৬৩
কাঁঠাল	২০	৪১	০.৫	১৭৫	০.৩	০.১৩	০.৪	৭
কুল	৪	৯	১.৮	২১	০.০২	০.০৫	০.৭	৭৬
খেজুর (শুস্ক)	১২০	৫০	৭.৩	২৬	০.০১	০.০২	০.৯	৩
গোলাপ জাম	১০	৩০	০.৫	১৪৯	০.০১	০.০৫	০.৪	৩
টমাটো (পাকা)	৪৮	২০	০.৪	৩৫১	০.১২	০.০৬	০.৪	২৭
তরমুজ	১১	১২	৭.৯	০	০.০২	০.০৪	০.১	১
নাশপাতি	৮	১৫	০.৫	২৮	০.০৬	০.০৩	০.২	০
পিচ	১৫	৪১	২.৪	০	০.০২	০.০৩	০.৫	৬

পেয়ারা	১০	২৮	১.৪	০	০.০৩	০.০৩	০.৪	২১২
পেঁপে (পাকা)	১৭	১৩	০.৫	৬৬৬	০.০৪	০.২৫	০.২	৫৭
ফুটি	৩২	১৪	১.৪	১৬৯	০.১১	০.০৮	০.৩	২৬
বাতাবি লেবু	৩০	৩০	০.৩	১২০	০.০৩	০.০৩	০.২	২০
বেদানা	১০	৭০	০.৩	০	০.০৬	০.১০	০.৩	১৬
বেল	৮৫	৫০	০.৬	৫৫	০.১৩	১.১৯	১.১	৮
লিচু	১০	৩৫	০.৭	০	০.০২	০.০৬	০.৪	৩১
লেবু	৭০	১০	২.৩	০	০.০২	০.০১	০.১	৩৯
সফেদা	২৮	২৭	২.০	৯৭	০.০২	০.০৩	০.২	৬
শরীফা	১৭	৪৭	১.৫	০	০.০৭	০.১৭	১.৩	৩৭

উৎসঃ গোপালন, শাস্ত্রী ও বালাসুব্রামানিয়াম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ ফলে ভিটামিন সি সবচেয়ে বেশি?
- ক) আমলকী
- খ) পেয়ারা
- গ) কাগজী লেবু

২। কোন্ ফলে ভিটামিন এ (ক্যারোটিন) সবচেয়ে বেশি?
- ক) পাকা আম
- খ) পাকা পেঁপে
- গ) পাকা কাঁঠাল

৩। কোন্ ফলে লৌহ সবচেয়ে বেশি থাকে?
- ক) করমচা
- খ) আমড়া
- গ) আঙ্গুর

৪। কোন্ ফলে ফসফরাস সবচেয়ে বেশি?
- ক) আঙ্গুর
- খ) কলা
- গ) কাজু বাদাম

৫। কোন্ ফলে ক্যালসিয়াম সবচেয়ে বেশি?
- ক) আতা
- খ) কুল
- গ) খেজুর (শুস্ক)

৬। কোন্ ফলে রিবোফ্লাভিন সবচেয়ে বেশি?
- ক) বেল
- খ) সফেদা
- গ) আম

৭। কোন্ ফলে থায়ামিন সবচেয়ে বেশি?
- ক) কাঁঠাল
- খ) কলা
- গ) আনারস

৮। কোন্ ফলে নিয়াসিন সবচেয়ে বেশি?
ক) কলা
খ) শরীফা
গ) তরমুজ

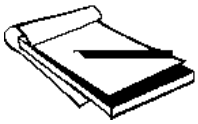

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। সংজ্ঞা লিখুন।
ক) উদ্ভিদতাত্ত্বিক ফল খ) উদ্যানতাত্ত্বিক ফল
গ) প্রকৃত ফল ঘ) অপ্রকৃত ফল

২। বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতাসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।

৩। ফল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা লিখুন।

৪। যে কোনো দশটি ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

৫। নিম্নে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ফলের দু'টি করে উদাহরণ লিখুন।

* উদ্ভিদতাত্ত্বিক ফল
* উদ্যানতাত্ত্বিক ফল
* মনোকারপিক ফল
* পলিকারপিক ফল
* প্রকৃত ফল
* অপ্রকৃত ফল
* সরল ফল
* মালটিপুল ফল
* এগ্রিগেট/গুচ্ছ ফল
* সরস ফল
* নিরস ফল
* বেরী ফল
* পেপো ফল
* হেসপেরিডিয়াম ফল
* উষ্ণমন্ডলীয় ফল
* অবউষ্ণমন্ডলীয় ফল
* শীত মন্ডলীয় ফল
* একবীজপত্রী ফল
* দ্বি-বীজপত্রী ফল
* স্ব-পরাগী ফল
* পর-পরাগী ফল

৬। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

৭। টীকা লিখুন ঃ
* বাংলাদেশে ফল উৎপাদন পরিস্থিতি
* ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
* জলবায়ুর চাহিদা অনুযায়ী ফলের শ্রেণিবিন্যাস
* সরস ফল
* নিরস ফল
* গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফল

৮। ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

৯। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

১০। আয়রন সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

১১। বাংলাদেশে ফলের আওতায় মোট জমির পরিমাণ ও মোট ফল উৎপাদনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করুন।

১২। দ্রুত বর্ধনশীল ফল মোট ফল উৎপাদনের শতকরা কত ভাগ?

১৩। কলার উৎপাদন দ্রুত বর্ধনশীল ফলের শতকরা কত ভাগ?

উত্তরমালা – ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। গ ২। গ ৩। ক ৪। ক ৫। ক ৬। ক ৭। গ ৮। গ

পাঠ ১.২

১। গ ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ক ৬। খ ৭। খ

পাঠ ১.৩

১। গ ২। খ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। ক

পাঠ ১.৪

১। ক ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। খ ৬। গ ৭। খ ৮। খ

পাঠ ১.৫

১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। গ ৭। ক

পাঠ ১.৬

১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। খ

পাঠ ১.৭

১। ক ২। ক ৩। ক ৪। গ ৫। গ ৬। ক ৭। ক ৮। খ

ইউনিট ২
ফল গাছের বংশ বিস্তার।

ইউনিট ২ ফল গাছের বংশ বিস্তার

ফলগাছ তার অস্তি ত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বংশ বিস্তার করে থাকে। কোনো কোনো ফল গাছ শুধুমাত্র বীজের মাধ্যমে আবার কোনো কোনো ফল গাছ বীজ ও অঙ্গজ উভয় পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে। কিছু কিছু ফল গাছে অঙ্গজ চারা উৎপাদন প্রায় অসম্ভব কিংবা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল, যেমন- নারিকেল। এসব ক্ষেত্রে চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ব্যবহার করাই শ্রেয়। যেসব ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই সমানভাবে প্রযোজ্য সেখানে অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করাই শ্রেয়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বংশবিস্তারের ধারণা, বংশবিস্তারের প্রকারভেদ, বীজ ও অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধা, শাখা কলম, দাবাকলম, জোড়কলম, চোখকলম এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশবিস্তার সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং গুটিকলম, ভিনিয়ার কলম, সংস্পর্শ জোড়কলম, তালি, চক্র ও-টি কলম পদ্ধতির ব্যবহারিক অনুশিলনের ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ বংশ বিস্তারের ধারণা ও প্রকারভেদের রূপরেখা, বীজ ও অঙ্গজ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বংশ বিস্তারের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- যৌন ও অযৌন বংশ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বংশ বিস্তারের ধারণা

কোনো একটি উদ্ভিদ প্রজাতির টিকে থাকা ও সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে ঐ উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলা যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বংশ রক্ষার্থে নির্দিষ্ট কোনো একটি গাছ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌনকোষের সাহায্যে বা অঙ্গজ উপায়ে তার সমতুল্য নতুন একটি গাছের জন্ম দিয়ে থাকে সে প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের বংশবিস্তার বলে।

বংশবিস্তারের প্রকার ভেদের রূপরেখা (Methods of plant propagation)

উদ্ভিদসমূহ প্রধানতঃ দুটো পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে থাকে যথা- যৌন পদ্ধতি ও অযৌন বা অঙ্গজ পদ্ধতি। আলোচনার সুবিধার্থে বংশবিস্তার পদ্ধতিসম হকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়-

১। **যৌন পদ্ধতি (Sexual propagation)**
বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার (Seedage)-আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

২। **অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতি (Asexual vegetative propagation)**

- অ্যাপোমিকটিক পদ্ধতি (Apomixis)- সাইট্রাস, আম ইত্যাদি।
- পৃথকীকরণ পদ্ধতি (separation)- পেঁয়াজ, টিউলিপ।
- কন্দর মাধ্যমে বংশবিস্তার (Bulb)- পেঁয়াজ, টিউলিপ ইত্যাদি।

- গুড়ি কন্দের মাধ্যমে বংশবিস্তার (Corm)- ওল, মুখীকচু, গ-াডিওলাস ইত্যাদি।
- বিভাজন পদ্ধতি (Division)- আলু।
- স্থুল কন্দের মাধ্যমে বংশবিস্তার (tuber)- আলু।
- মূলের মাধ্যমে বংশবিস্তার (tuberous root)-মিষ্টি আলু,ডালিয়া।
- রাইজোমের মাধ্যমে বংশবিস্তার (rhizome)- কলা, আদা, হলুদ।
- খর্ব ধাবকের মাধ্যমে বংশবিস্তার (offsets/offshoots)-আনারস,খেজুর।
- মুকুটের মাধ্যমে বংশবিস্তার (crown) - আনারস।
- ধাবকের সাহায্যে বংশবিস্তার (runner)- থানকুনি, আমর€ল।
- ধাবকের সাহায্যে বংশবিস্তার (sucker)- কলা, আনারস।
- কাটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার (propagation by cutting)
- দাবা কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার - (Propagation by layering)
- জোড় কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার (Propagation by grafting)
- কুঁড়ি সংযোজন বা চোখ কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার (Propagation by budding)
- কোষ বা কলা কালচার পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। (Proposationly time culture)

যৌন বংশবিস্তারের সুবিধাসমূহ (Advantages of sexual propagation)

- যেসব ফলগাছ সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করতে পারে না সেসব ফলগাছের বংশবিস্তারের জন্য যৌন পদ্ধতি একমাত্র উপায়।
- বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ সাধারণত অধিক কষ্ট সহিষ্ণু হয় ও বেশিদিন বাঁচে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঝড়-বৃষ্টি, খরা বা যেকোন প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।
- সঙ্করায়নের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির আর কোনো বিকল্প নেই।
- যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের জন্য তেমন কোনো কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার দরকার হয় না।
- অপেক্ষাকৃত সহজ ও সস্তায় এবং কম পরিশ্রমে চারা পাওয়া যায়।

যৌন বংশবিস্তারের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of sexual propagation)

- বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে কখনো মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে না। এ জন্য মিষ্টি আমের আঁটি থেকে উৎপন্ন গাছে যে আম হয় তা সাধারণত টক হতে দেখা যায়।
- গাছ লম্বা, উঁচু ও বড় হওয়ায় ফল সংগ্রহ কষ্টকর হয়।
- এ প্রক্রিয়ায় জন্মানো গাছে ফুল-ফল আসতে সময় লাগে।
- গাছ বড় আকারের হওয়ায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কম সংখ্যক গাছ লাগাতে হয়।
- আঙ্গিক বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ঝড়-তুফানে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে।

অযৌন বংশবিস্তারের সুবিধাসমূহ (Advantages of asexual propagation)

- কতিপয় ফলগাছ যেমন- কলা, আনারস ইত্যাদি সজীব ও প্রকৃত বীজ উৎপাদন করে না। তাই এসব গাছের বংশকে টিকিয়ে রাখার জন্য অযৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।
- বীজ থেকে উৎপন্ন চারায় মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। তাই মাতৃগুণ সম্পন্ন গাছ (true to type) পেতে হলে অযৌন পদ্ধতিই একমাত্র উপায়।
- ফলগাছের এমন কতকগুলো জাত আছে যারা উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন ফল প্রদান করে এবং উচ্চ ফলনশীল। কিন্তু জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা, রোগ, পোকামাকড় ইত্যাদির প্রতি অধিক সংবেদনশীল। এসব গাছকে বীজ থেকে না জন্মিয়ে এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির সংগে খাপ খায় এমন আদিজোড়ের সাথে কলম করে প্রতিকূল পরিবেশে টিকিয়ে রাখা যায়।
- অযৌন পদ্ধতিতে জন্মানো গাছ কম বিস্তারশিল হওয়ায় এসব গাছের ফল সংগ্রহ ও পরিচর্যা সহজতর হয়। অপরদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় অধিক সংখ্যক গাছ লাগিয়ে মোট ফলন বাড়ানো যায়।

অযৌন বংশবিস্তারের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of a sexual propagation)

- এ পদ্ধতিতে নতুন কোনো জাত সৃষ্টি (সঙ্কর বীজ) করা যায় না।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন পদ্ধতির চেয়ে অযৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের খরচ ও শ্রম বেশি লাগে।
- এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে যথেষ্ট কারিগরী জ্ঞান,দক্ষতা ও অনুশীলনের দরকার হয়।
- অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধিকারী গাছসমূহ সাধারণত কমদিন বাঁচে।
- কতিপয় অঙ্গজ বংশবিস্তার পদ্ধতিতে যেমন- দাবা কলম ও শাখা কলমের গাছে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এজন্য গাছ মাটির সাথে খুব শক্তভাবে আটকে থাকতে পারে না।

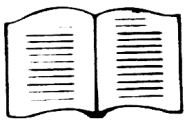

সারমর্ম ঃ যে কোনো জীবের জন্য বংশবিস্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি জীবই চায় তার স্থায়ীত্ব অর্জন বা সংখ্যাবৃদ্ধি। সহজভাবে তাই একটি গাছ থেকে অনুরূপ আর একটি উদ্ভিদ প্রজাতির টিকে থাকা ও সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে ঐ উদ্ভিদের বংশবিস্তার বলা যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বংশ রক্ষার্থে নির্দিষ্ট কোনো একটি গাছ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌনকোষের সাহায্যে বা অঙ্গজ উপায়ে তার সমতুল্য নতুন একটি গাছের জন্ম দিয়ে থাকে সেই প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের বংশবিস্তার বলে। কিছু কিছু গাছ শুধুমাত্র যৌন উপায়ে বা বীজের মাধ্যমে এবং অনেক গাছ শুধুমাত্র অযৌন বা অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করে। তবে অধিকাংশ গাছই যৌন ও অযৌন উভয় উপায়েই বংশবিস্তার করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায়?
- ক) সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ
- খ) টিকে থাকা ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ
- গ) বংশ রক্ষার্থে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার সমতূল্য নতুন একটি প্রজাতির জন্ম দিয়ে থাকে সেই প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলে

২। যৌন বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায়?
- ক) যৌন কোষ বা বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার
- খ) শাখার মাধ্যমে বংশ বিস্তার
- গ) গুটি কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার

৩। অযৌন বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায়?
- ক) শুধুমাত্র শাখার মাধ্যমে বংশ বিস্তার
- খ) শুধুমাত্র শিকড়ের মাধ্যমে বংশ বিস্তার
- গ) বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার
- ঘ) যে কোনো অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার

৪। কোন্ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব?
- ক) যৌন বংশ বিস্তারের মাধ্যমে
- খ) অযৌন বংশ বিস্তারের মাধ্যমে
- গ) বীজ দ্বারা ও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে

৫। কীভাবে বংশ বিস্তার করলে মাতৃ গাছের গুণাগুণ ঠিক থাকে না?
- ক) বীজের মাধ্যমে
- খ) শাখা কলমের মাধ্যমে
- গ) চোখ কলমের মাধ্যমে

নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

- ক) আদিজোড় তৈরির জন্য বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম।
- খ) বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম।
- গ) যৌন বংশ বিস্তারের মাধ্যমে নতুন জাত সৃষ্টি করা অসম্ভব।
- ঘ) অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে নতুন জাত সৃষ্টি করা সম্ভব।
- ঙ) যৌন উপায়ে সস্তায়, কম পরিশ্রম ও অপেক্ষাকৃত সহজে চারা উৎপাদন করা যায়।
- চ) মিষ্টি আমের আঁটি থেকে উৎপন্ন গাছে যে আম হয় তা সাধারণত মিষ্টি হয়ে থাকে।
- ছ) বীজ থেকে জন্মানো গাছে ফল আসতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে।
- জ) অঙ্গজ পদ্ধতিতে জন্মানো গাছে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।
- ঝ) অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার অপেক্ষাকৃত সহজ।

পাঠ ২.২ শাখা কলম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- শাখা কলম কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- শাখা কলমের প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখতে ও বলতে পারবেন।
- শাখা কলম কীভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শাখা কলম (Stem cutting)

এ ধরনের কলম উদ্যানতাত্ত্বিক গাছসম হের বংশবিস্তারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাখা-প্রশাখার উপযুক্ত অংশসম হ মাতৃগাছ থেকে কেটে আলাদা করে অনুকূল পরিবেশে রেখে ও উপযুক্ত যত- নিয়ে তা' থেকে মূল-পল্লব গজিয়ে নতুন চারা গাছ তৈরি করাই হলো শাখা কলম। চিরসবুজ ফল গাছসমূহ যেমন- লেবু, ডালিম, গোলাপ জাম প্রভৃতিতে সাধারণত বসন্তের শেষ থেকে বর্ষাকালে শাখা কলম করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে তখন সফলতার হার বেশি হয়। পত্র পতনশীল ফল গাছে (যেমন- আপেল) শীতকালে শাখা কলম করা হয়।

শাখা কলমের প্রকারভেদ (Types of stem cutting)

শাখা কলমের জন্যও নির্বাচিত শাখার কাষ্ট প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে শাখা কলমকে নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করা হয়েছে-

(র) শক্তকাঠ শাখা কলম (Hardwood cutting)

পূর্ববর্তী মৌসুমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শক্ত শাখাসমূহে (এক থেকে দুই বছর বয়স্ক) কলম তৈরি করাই হলো শক্তকাঠ শাখা কলম। আঙ্গুর, গোলাপজাম, ডালিম ইত্যাদি শক্ত কাঠ কলমে বংশ বৃদ্ধি করতে হয়।

শক্তকাঠ কলম তৈরি করতে হলে এক বা দেড় বছর বয়স্ক সুস্থ-সবল ও মধ্যম তেজযুক্ত শক্ত শাখা নির্বাচন করতে হবে। শাখার শীর্ষদেশ বাদ দিয়ে মধ্যবর্তী ও গোড়ার অংশ নিলে তাতে কলম ভালো হয়। সাধারণত ১০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা একটি খন্ড নির্বাচিত শাখা থেকে নিতে হয় যাতে অন্ততঃ তিনটি পর্ব (node) থাকে। খন্ডটির নিচের প্রান্ত ঠিক পর্বসন্ধির নিচে কাটা হয় এবং উপরের প্রান্ত দ্বিতীয় পর্বসন্ধির ১.৩ থেকে ২.৫ সে. মি. উপরে কাটা হয়। শাখাকলমের উপরের প্রান্তে গোলাকার ও নিচের প্রান্তে সর্বদা তির্যকভাবে কাটতে হয়। মাটিতে রোপণ করার এক থেকে দুই মাসের মধ্যে এতে শিকড় গজায় এবং তা রোপণের উপযুক্ত হয়। শাখা কলমের কাটিং সাধারণত মাটির সাথে ৪৫° কোণ করে লাগাতে হয়।

(রর) আধা শক্তকাঠ শাখা কলম (Semi-hardwood cutting)

যখন আংশিক বা আধা পরিণত কোনো গাছের ঈষৎ কাষ্ঠল বিটপে কলম করা হয় তখন তাকে আধাশক্তকাঠ শাখা কলম বলে।

যখন আংশিক বা আধা পরিণত কোনো গাছের ঈষৎ কাষ্ঠল বিটপে কলম করা হয় তখন তাকে আধাশক্তকাঠ শাখা কলম বলে। এ ধরনের কলম সাধারণত বেশ রসাল হয় ও বিটপের অগ্রবর্তী অংশ থেকে কলম করা হয়। লেবু, জলপাই, ডুমুর ইত্যাদি ফলগাছের বংশবিস্তার এ প্রকার শাখা কলমের সাহায্যে করা যায়।

এ ধরনের কলম তৈরিতে ২-৩ মাস বয়স্ক নির্বাচিত বিটপের অগ্রভাগে কয়েকটি পাতা রেখে ৭.৫-১৫ সে. মি. দৈর্ঘ্যের একটি খন্ড প্রথমে কেটে নেয়া হয়। যদি পাতার আকার খুব বড় হয় তবে পাতাগুলোর কিছু অংশ ছেঁটে আকারে ছোট করতে হয়। এ কলমের জন্য নির্বাচিত শাখাটিকে পর্বসন্ধির নিচে কাটতে হয়। কর্তনটি যাতে তির্যকভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

(ররর) কচি/কোমলকাঠ শাখা কলম (Softwood cutting)

কোমল বা কচি শাখা থেকে যে কলম তৈরি করা হয় তাকে কচি শাখা কলম বলে। এ ধরনের কলমের জন্য সাধারণত সদ্য বিকশিত শাখা নির্বাচন করা হয়। গাছ ছাঁটাই করার পর যে পার্শ্ব শাখা বের হয় সেগুলোই কোমলকাঠ শাখা কলমের জন্য সবচেয়ে ভালো। বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন ঋতুতে এ ধরনের কলম করা হয়। এ দেশে যেমন ফল গাছেই কচি কাঠ কলম করা হয় না।

(রা) বীরুৎ শাখা কলম (Herbaceous cutting)

বীরুৎ শ্রেণির বিভিন্ন উদ্ভিদ যেমন-আনারস, টমেটো, মিষ্টি আলু প্রভৃতিতে এ ধরনের কলম করা হয়ে থাকে। এ কলমসম হ সাধারণত বেশ রসালো, কোমল বা নমনীয় হয়। এ কলমের জন্য গাছের শীর্ষভাগ (যা অত্যন্ত নরম ও কোমল থাকে) কেটে নিতে হয়। এ কলমে অবশ্যই পাতা রাখতে হবে।

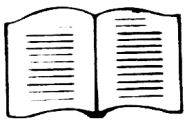

সারমর্ম ঃ শাখা কলম উদ্যানতাত্ত্বিক গাছসম হের বংশবিস্তারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাখা-প্রশাখার উপযুক্ত অংশসমূহ মাতৃগাছ থেকে কেটে আলাদা করে অনুকূল পরিবেশে রেখে ও উপযুক্ত যত্ন নিয়ে তা' থেকে মূল-পল্লব গজিয়ে নতুন চারা গাছ তৈরি করাই হলো শাখা কলম। চিরসবুজ ফল গাছসমূহ যেমন- লেবু, ডালিম, গোলাপ জাম প্রভৃতিতে সাধারণত বসন্তের শেষ থেকে বর্ষাকালে শাখা কলম করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন বাতাসে আদ্রতা বেশি থাকে তখন সফলতার হার বেশি হয়। শাখা কলম চার প্রকার যথা- শক্তকাঠ শাখা কলম, আধা শক্তকাঠ শাখা কলম, কচি/কোমলকাঠ শাখা কলম ঔ বীরুৎ শাখা কলম ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শাখা কলম বলতে কী বোঝায়?
- ক) শাখার অংশ বিশেষ কর্তন করে বংশ বিস্তারের কাজে ব্যবহারকরণ।
- খ) মূলের অংশ বিশেষ কর্তন করে বংশ বিস্তারের কাজে ব্যবহারকরণ।
- গ) শাখা ও মূলের অংশ বিশেষ কর্তন করে বংশ বিস্তারের কাজে ব্যবহারকরণ।

২। শাখা কলমে কমপক্ষে কয়টি পর্বসন্ধি থাকা উচিত?
- ক) ১টি
- খ) ২টি
- গ) ৩টি

৩। শাখা কলমের কয়টি পর্বসন্ধি মাটির নিচে ও কয়টি পর্বসন্ধি মাটির উপরে থাকবে?
- ক) ২টি পর্বসন্ধি মাটির নিচে ও ১টি পর্বসন্ধি মাটির উপরে থাকবে।
- খ) ১টি পর্বসন্ধি মাটির নিচে ও ২টি পর্বসন্ধি মাটির উপরে থাকবে।
- গ) ১টি পর্বসন্ধি মাটির নিচে ও ১টি পর্বসন্ধি মাটির উপরে থাকবে।

৪। শাখা কলমের জন্য উত্তম সময় কোন্‌টি?
- ক) গ্রীষ্মকাল
- খ) বর্ষাকাল
- গ) শীতকাল
- ঘ) বসন্তকাল

৫। শাখা কলম কত প্রকার?
- ক) চার প্রকার
- খ) তিন প্রকার
- গ) পাঁচ প্রকার।

৬। শাখা কলম সাধারণত মাটির সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে লাগাতে হয়?
- ক) ৩০°
- খ) ৪০°
- গ) ৪৫°
- ঘ) ৬০°

নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

- ক) শীতকালে বাতাসের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কম থাকে বিধায় ঐ সময় শাখা কলম করার উত্তম সময়।
- খ) বর্ষাকালে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে বলে ঐ সময় শাখা কলম করার উত্তম সময়।
- গ) সব ধরনের গাছকেই শাখা কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা যায়।
- ঘ) শাখা কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তারকৃত গাছে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়।
- ঙ) অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে শাখা কলম সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।
- চ) শাখা কলমের মাধ্যমে নতুন জাত সৃষ্টি করা যায় না।
- ছ) শাখা কলমে প্রধান মূল সৃষ্টি হতে পারে না।
- জ) শাখা কলম করলে শতকরা ১০০ ভাগ কলমই সফল হয়।

পাঠ ২.৩ দাবাকলম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- দাবাকলম কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- দাবাকলমের সুবিধা ও অসুবিধাসম হ লিখতে ও বলতে পারবেন।
- দাবাকলম কীভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

দাবাকলম (Layering)

মাতৃগাছে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় মূল উৎপাদন করে যে কলম তৈরি করা হয় তাকে দাবাকলম বলে।

(১) প্রান্ত বা শীর্ষ দাবাকলম (Tip layering)

যেসব গাছের বিটপ লতা জাতীয় সেসব গাছে এ কলম করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে গাছের শাখাকে নুয়ে তার শীর্ষদেশ মাটির ৫-৭.৫ সে. মি. গভীরে পুঁতে দেয়া হয়। ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে পুঁতে দেয়া বিটপ থেকে নতুনভাবে অস্থানিক মূল গজায় ও নতুন বিটপ উদ্‌গত হয়। তখন একে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নার্সারিতে কয়েক মাস রেখে দেয়া হয় এবং পরে অন্যত্র লাগানো হয়। বেরী জাতীয় কিছু গাছে এ কলম করা হয়।

(২) সরল দাবাকলম (Simple layering)

দাবাকলম তৈরির পদ্ধতিসম হের মধ্যে এটি সবচে' সহজে ও দক্ষতার সাথে সমাধা করা যায়। এ পদ্ধতিতে শাখা বা বিটপের অগ্রভাগ মাটির উপরে রেখে তার যে কোনো অংশ ৫-৭.৫ সে. মি. মাটির গভীরে পুঁতে মাটি দ্বারা ভালোভাবে ঢেকে দেয়া হয়। যদি এ বিটপ বা শাখা মাটির উপরে উঠে আসতে চায় তখন একটি গোঁজ (Peg) মেরে তাকে নুয়ে রাখা হয়। ৪ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে এতে মূল গজায়। তখন একে মাতৃগাছ থেকে আলাদা করে নার্সারিতে কয়েক মাস লালন পালন করে বিক্রয় করা যায়। লেবু গাছে এ কলম করা যায়।

(৩) পরিখা দাবাকলম (Trench layering)

এ পদ্ধতিতে সমগ্র শাখাটিকেই একটি অগভীর পরিখার মধ্যে রেখে কেবলমাত্র অগ্রভাগ ছাড়া বাকী অংশটুকু মাটি চাপা দেয়া হয়। এতে একটি শাখা থেকে অনেকগুলো চারা পাওয়া যায়। যখন মূল উৎপাদন সম্পন্ন হয় তখন এ দাবা কলমের চারপাশের মাটি সরিয়ে তা তুলে আনা হয় এবং মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ দেশে কোনো গাছেই এটা করা হয় না।

(৪) ঢিবি দাবাকলম (Mound or stool layering)

এপদ্ধতিতে গাছের গোড়া থেকে বিটপ গজানোর পর ভিজা মাটি দ্বারা বিটপের গোড়ায় ঢিবির মত তৈরি করা হয়। সাধারণত মাটি থেকে ৪০/৫০ সে. মি. উপরে কান্ডটি কেটে দেয়া হয়। কর্তনের কিছুদিন পরই গজানো নতুন বিটপের গোড়া থেকে নতুন মূল গজানো শুরু হয়। মূল গজানো সম্পন্ন হলে মূলসহ নতুন চারাগুলোকে মাতৃগাছ থেকে পৃথক করে নার্সারিতে পরিচর্যা করার পর তা রোপণের উপযুক্ত হয়।

(খ) বায়ব দাবাকলম বা গুটিকলম (Air layering, chinese layering, pot layering, circumposition or gootee)

মাতৃগাছে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় শাখাকে মাটিতে না নামিয়ে ভূমির ওপরে বায়ুমন্ডলে রেখে এ পদ্ধতিতে মূল সৃষ্টি করা হয় বলে একে বায়ব দাবা কলম বলে। পর্বসন্ধির ২/৩ সে. মি. নিচে শাখার বাকল উঠিয়ে ক্ষতস্থানে পচা গোবর মিশ্রিত মাটি বা করাতের গুড়া দ্বারা আবৃত করে গুটি আকারে

বেঁধে এতে ম ল সৃষ্টি করা হয়। এজন্য একে গুটি কলমও বলা হয়। পেয়ারা, লিচু, জাম্বুরা, লেবু, সফেদা, ডালিম প্রভৃতি গাছে বায়ব দাবা কলম করা হয়ে থাকে। সাধারণত গাছের এক থেকে দুই বছর বয়স্ক বিটপে এ কলম করা হয়ে থাকে। যে শাখাগুলো সধারণত নিচের দিকে ঝুলে থাকে বা

মাটির সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে ঐগুলোকে এ কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত বিটপের শীর্ষ থেকে ৩০/৪০ সে. মি. গোড়ার দিকে ৪/৫ সে. মি. চওড়া করে ঘুরিয়ে আংটির মত করে বাকল তুলে ফেলা হয়। তারপর ক্ষত স্থানের ক্যাম্বিয়াম স্তর চাকু দ্বারা ভালোভাবে চেছে তুলে ফেলা হয়। ক্যাম্বিয়াম স্তর না তুলে ফেললে এর ডশকড় গজাবে না। ক্ষতস্থানটিকে শিকড় মাধ্যম (rooting medium) দ্বারা আবৃত করে পলিথিন দ্বারা পেঁচিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। অর্ধেক পচাগোবর, অর্ধেক উর্বর দোআঁশ মাটি ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি একত্রে মিশিয়ে শিকড় মাধ্যম বা গুটি করলে বায়ব দাবা কলমে শিকড়ায়ন ভালো হয়। মাটির গুটি সবসময় ভিজা রাখতে হবে। তাই চট দ্বারা গুটি তৈরি করলে নিয়মিতভাবে গুটিতে পানি দিতে হবে। পক্ষান্তরে পলিথিন কাগজ দ্বারা গুটি বেধেঁ দিলে আর পানি দেয়ার ঝামেলা পোহাতে হয় না। বর্ষাকাল এ কলমের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সময়। এ কলম করার ৪ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে এতে মূল গজায়। তখন গুটির ২.৫ সে. মি. নিচে ২ থেকে ৩ ধাপে কেটে কলমকে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অতঃপর কলমগুলোকে নার্সারি বেডে রেখে কয়েক মাস পরিচর্যা করার পর তা রোপণের উপযোগী হয়।

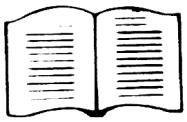

সারমর্ম ঃ মাতৃগাছে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় মূল উৎপাদন করে যে কলম তৈরি করা হয় তাকে দাবা কলম বলে। দাবা কলম মূলত দুই প্রকার যথা- ভূমি দাবা কলম ও গুটি কলম। গাছের শাখাকে মাটিতে নুয়ে তাতে মূল সৃষ্টি করে যে কলম করা হয় তাকে ভূমি দাবা কলম বলে। এ কলম বিভিন্ন

প্রকারের হয়, যথা- প্রান্ত বা শীর্ষ দাবা কলম, সরল দাবাকলম, পরিখা দাবা কলম ও ঢিবি দাবাকলম। বয়ের দাবাকলম একটি প্রচলিত কলম যা পেয়ারা, লেবু, গোলাপজাম ইত্যাদি গাছে অতি সহজে করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। দাবা কলম বলতে কী বোঝায়?
- (ক) মাতৃ গাছে থাকা অবস্থায় শাখায় মূল উৎপাদন করে যে কলম করা হয়।
- (খ) মাতৃ গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর শাখায় মূল উৎপাদন করে যে কলম করা হয়।
- (গ) মাতৃ গাছে থাকা অবস্থায় আদিজোড় ও উপজোড় একত্রে জোড়া লাগিয়ে যে কলম করা হয়।

২। দাবাকলম কত প্রকার?
- (ক) পাঁচ প্রকার
- (খ) ছয় প্রকার
- (গ) সাত প্রকার

৩। বায়ব দাবাকলমের আর এক নাম কী?
- (ক) গুটি কলম
- (খ) যৌগিক দাবা কলম
- (গ) ভূমি দাবা কলম

৪। ভূমি দাবাকলম কত প্রকার?
- (ক) চার প্রকার
- (খ) পাঁচ প্রকার
- (গ) ছয় প্রকার

৫। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কোন্ দাবাকলম?
- (ক) সরল দাবা কলম
- (খ) শীর্ষ দাবা কলম
- (গ) গুটি কলম

নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন

ক) শাখা কলমের চেয়ে দাবাকলমে সফলতার হার অনেক বেশি।

খ) দাবাকলমের সাহায্যে বংশ বিস্তারকৃত গাছ ঝড়-তুফানে সহজেই উপড়ে পড়ে যায়।

গ) বসন্ত কাল দাবাকলমের জন্য সর্বোত্তম সময়।

ঘ) দাবাকলমে ডশকড় ব্যবহার করা হয়।

ঙ) গুটিকলমের জন্য সর্বোত্তম সময় হলো বর্ষাকাল।

চ) গুটিকলমের জন্য ব্যবহৃত ডশকড় মাধ্যম সব সময় আর্দ্র থাকা বাঞ্ছনীয়।

ছ) গুটিকলমের জন্য পর্বসন্ধির ঠিক উপরে ৫ সে.মি. বাকলসহ ক্যাম্বিয়াম লেয়ার তুলে ফেলতে হয়।

জ) গুটিকলম সফল হওয়ার পর মাতৃ গাছ থেকে এক ধাপেই কেটে আনা ভালো।

ঝ) গুটিকলম মাতৃ গাছ থেকে কেটে এনে সাথে সাথে বাগানে লাগানো হয়।

পাঠ ২.৪ জোড়কলম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জোড়কলম কী তা জানতে পারবেন।
- জোড়কলমের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- জোড়কলম কীভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

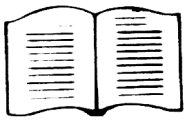

জোড়কলমের সংজ্ঞা (Definition of grafting)

গাছের আদিজোড় ও উপজোড় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসাবে বৃদ্ধিলাভ করে তখন তাকে গ্রাফ্‌ট জোড়কলম বলে এবং এ জোড়া লাগানো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রাফ্‌টিং বা জোড় কলম। যে গাছের ওপর কাঙ্ক্ষিত গাছের ছোট একটি অংশ জোড়া লাগানো হয় তাকে আদিজোড় (rootstock) এবং কাঙ্খিত গাছের এ অংশটিকে উপজোড় (scoin) বলে। সহজভাবে বলা যায় জোড়কলমের জোড়স্থানের নিচের অংশ হলো আদিজোড় ও উপরের অংশ হলো উপজোড়।

জোড়কলমের পদ্ধতিসমূহ (Methods of grafting)

জোড়কলম প্রধানত দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। প্রথমত উপজোড়কে মাতৃগাছে সংযুক্ত অবস্থায় রেখে জোড়া লাগানো হয়। একে সংযুক্ত জোড়কলম বলে এবং দ্বিতীয়ত উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদিজোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়, একে বিযুক্ত জোড়কলম বলে। এ কলম আবার বিভিন্নভাবে করা যায়। নিচে উভয় ধরনের কয়েকটি জোড়কলম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো –

ক) সংযুক্ত বা সংস্পর্শ জোড়কলম (Contact/approach grafting)

এ পদ্ধতিতে উপজোড়কে তার নিজস্ব মূলতন্ত্রের ওপর বৃদ্ধিরত অবস্থায় আদিজোড়ের সংস্পর্শে এনে জোড়া লাগানো হয়। আম এবং সফেদা গাছে এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আদিজোড়কে সাধারণত টবে বা পলিব্যাগে জন্মিয়ে এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত লালন পালন করে তারপর তাকে কলমের কাজে ব্যবহার করা হয়। টব অথবা পলিথিনের ব্যাগসহ আদিজোড়কে রশির সাহায্যে আদিজোড়ের কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ধারালো চাকু দ্বারা পরস্পরের সুবিধাযুক্তস্থানে গাছের গোড়া থেকে ২৫-৩০ সে. মি. উপরে সামান্য গভীরভাবে কিছু কাঠসহ বাকল এবং ক্যাম্বিয়াম ৪-৬ সে.মি. লম্বা করে মসৃণভাবে চেছে তুলে ফেলা হয়। উভয় জোড় দু'টির কর্তিত অংশ পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে শক্ত করে এমনভাবে বেঁধে দেয়া হয় যেন কর্তিত অংশ খুব ভালোভাবে মিলিত হতে পারে। বাঁধার ৪০-৫০ দিনের মধ্যে দুই জোড়ের মিলনস্থলে নতুন কলা উৎপন্ন হয়ে তারা জোড়া লেগে যায়। তখন সংযোগ স্থানের ২-৩ সে.মি. নিচে উপজোড় ২-৩ ধাপে কেটে মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং অনুরূপভাবে সংযোগ স্থানের ওপর থেকে আদিজোড়ের অগ্রভাগ কেটে ফেলা হয়। সংযোগ স্থানের নিচে বা উপরে আদিজোড়ে কখনও কোনো শাখা প্রশাখা জন্মিতে দেয়া যাবে না।

টব অথবা পলিথিনের ব্যাগসহ আদিজোড়কে রশির সাহায্যে আদিজোড়ের কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

খ) বিযুক্ত জোড়কলম (Detached grafting)

১। ভিনিয়ার জোড়কলম (Veneer grafting)

ভিনিয়ার জোড়কলম এক ধরনের পার্শ্ব জোড়কলম (side grafting)। এ পদ্ধতিতে আদিজোড়ের একপার্শ্বে উপজোড়ের নিম্নপ্রান্ত স্থাপন করা হয়। এ কলম করার জন্য উপজোড় হিসেবে এমন একটি শাখাগ্র নির্বাচন করা হয় যার শীর্ষ কুঁড়িটি কিছুদিনের মধ্যেই উন্মোচিত হবে। এরূপ শাখাগ্রকে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক সপ্তাহ আগেই তার পত্রবৃন্ত রেখে পাতাগুলো ছেঁটে দেয়া হয়। এর ফলে

সুপ্ত কুঁড়িটি এক সপ্তাহের মধ্যে একটু বড় ও সবল হয়। উপজোড় হিসেবে নির্বাচিত শাখার বয়স ৬/৭ মাস হলে ভালো হয়। আদিজোড়ের গোড়া থেকে কমপক্ষে ২৫ সে.মি. উপরে ধারালো চাকু দ্বারা ৫/৬ সে.মি. দীর্ঘ করে তির্যকভাবে ওপর থেকে নিচে ক্রমশঃ একটু গভীর করে কাটা হয়। এ কর্তনের নিম্নপ্রান্তে আবার তির্যকভাবে গভীর করে আর একটি ছোট কর্তন দেয়া হয়। উপজোড়ের গোড়ার দিকে অনুরূপ কর্তন দিয়ে উভয় জোড় পরস্পর মুখোমুখি স্থাপন করে পলিথিনের ফিতা দ্বারা কর্তিত স্থান টান টান করে বেঁধে দিতে হয়। এর দুই মাস পর আদিজোড় ও উপজোড়ের ক্যাম্বিয়াম স্তর জোড়া লাগে ও উপজোড়ের সুপ্ত কুঁড়ির বৃদ্ধি শুরু হয় এবং কুঁড়ি থেকে নতুন বিটপ উৎপন্ন হয়। সম্পর্ণ উপজোড় ও জোড় স্থানটিকে পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিয়ে ব্যাগের খোলা মুখ আদিজোড়ের কান্ডের গায়ে বেঁধে দিতে হয়। এতে উপজোড় ও জোড়স্থানের চারপাশে বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিযুক্ত উপজোড়টি শুকিয়ে মারা যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। দুই/তিন দিন পর পর পলিথিনের নিচের বাঁধন খুলে জমাকৃত পানি বের করে দিতে হয়। মাস দুয়েক পর সংযোগ স্থানের বাঁধনটিকে একটু ঢিলে করে পুনরায় বেধে দিতে হয়। পুরোপুরি জোড়া লাগতে গাছভেদে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগে। ভালোভাবে জোড়া লাগার পর বাঁধনটি কেটে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আদিজোড় থেকে কোনো শাখা-প্রশাখা বের হতে না পারে। কোনো শাখা-প্রশাখা বের হওয়া মাত্রই তা কেটে ফেলতে হবে। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওপর থেকে আদিজোড় ধীরে ধীরে ২-৩ ধাপে কেটে অপসারণ করা হয় এবং নতুন উপজোড় শাখাকে বাড়তে দেয়া হয়।

২। চাবুক জোড়কলম (Splice /Whip grafting)

জোড়কলম তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটিই সবচে' সহজ পদ্ধতি। আদি জোড় হিসাবে ব্যবহার করা হয় লম্বা চাবুকের মত একটা শিকড়। এ পদ্ধতিতে আদিজোড় ও উপজোড় নির্বাচনের পর তাতে তেরছা ও মসৃণভাবে শুধু একবার কাটা হয়। সমদৈর্ঘ্য (৩-৫ সে.মি.) ও একই পরিমাণ কোণ করে উভয় জোড়ে কর্তন দেয়া হয়, ফলে একের কর্তনতল অন্যের কর্তনতলের সাথে ভালভাবে খাপ খায়। আদিজোড় ও উপজোড়কে অতঃপর পারস্পরিক কর্তিত তলের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এনে পলিথিন ফিতা দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়। নাশপতি, আপেল, প্রভৃতি ফলগাছে এ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটানো যায়।

বসন্ কালে কুঁড়ি উন্মোচনের ঠিক পূর্বে এ কলম করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। চূড়ান্ত ভাবে জোড়া লাগা ও উপজোড়ের বৃদ্ধি শুরু হওয়ার পর যদি সংযোগ স্থানের নিচে আদিজোড় থেকে কোনো বিটপ বা কুকী বের হয় তবে তা অপসারণ করতে হয়।

৩। ভ্রুণকান্ড/ভিত/অঙ্কুর জোড়কলম (Epicotyle/Stone grafting)

কম সময়ে অধিক সংখ্যক গাছ উৎপাদনের জন্য এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজতলায় আদিজোড় উৎপন্নের জন্য বীজ বপন করা হয়। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর চারার বয়স যখন ৮-১৫ দিন হয় তখন তার গোড়া থেকে ৫ সে.মি. উপরে কলম করার জন্য মাথা কেটে দেয়া হয়। লক্ষনীয় যে, অংকুরিত হওয়ার পর পাতা সবুজ হওয়ার আগেই সাধারণত এ কাজ করা হয়। কর্তিত স্থানে যে কোনো বিযুক্ত জোড় কলম পদ্ধতিতে উপজোড় স্থাপন করে এ কলম করা হয় তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আদিজোড় ও উপজোড় সমব্যাসের হয়। আমগাছের অংকুরিত চারায় এ কলম অত্যন্ত সফলভাবে করা যায়। অন্যান্য জোড়কলমের চেয়ে এ পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে সময় কম লাগে (২-৪ সপ্তাহ)। জোড়কলম সফল হলে এক বছর নার্সারিতে লালন পালন করে পরবর্তী বছর তা বাগানে লাগানো যায়। বিযুক্ত জোড় কলমের আরও কয়েকটি পদ্ধতি হলো জিহ্বা জোড় কলম, জিন জোড় কলম, পার্শ্ব জোড় কলম, ফাটল জোড় কলম, গোঁজ জোড় কলম, বাকল জোড় কলম, সেতু জোড় কলম, ডশকড় জোড় কলম ইত্যাদি। এ পদ্ধতিসমূহ আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় না বলে এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি।

অনুশীলন (Activity) *ঃ জোড়কলম পদ্ধতিতে কীভাবে একটি আমগাছেকে উন্নত করবেন তা বর্ণনা করুন।*

সারমর্মঃ গাছের আদিজোড় ও উপজোড় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসেবে বৃদ্ধিলাভ করে তখন তাকে গ্রাফ্ট বলে এবং এ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রাফ্টিং বা জোড়কলম। যে গাছের ওপর কাঙ্ক্ষিত গাছের ছোট একটি অংশ জোড়া লাগানো হয় তাকে আদিজোড় (rootstock) এবং কাঙ্ক্ষিত গাছের এ অংশটিকে উপজোড় (scion) বলে। সহজভাবে বলা যায় জোড়কলমের জোড়স্থানের নিচের অংশ হলো আদিজোড় ও উপরের অংশ হলো উপজোড়। জোড়কলম প্রধাণত দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। প্রথমত উপজোড়কে মাতৃগাছে সংযুক্ত অবস্থায় রেখে জোড়া লাগানো হয়। একে সংযুক্ত জোড়কলম বলে এবং দ্বিতীয়ত উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদিজোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয় একে বিযুক্ত জোড়কলম বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বিযুক্ত জোড়কলম কত ধরনের?
- ক) ২
- খ) ৩
- গ) ৪
- ঘ) ৫

২। জোড়কলম প্রধানত কয়টি পদ্ধতিতে করা যায়?
- ক) ২টি
- খ) ৩টি
- গ) ৪টি
- ঘ) ৫টি

৩। আদি জোড়ের গোড়া থেকে কমপক্ষে কত উপরে কাটতে হয়?
- ক) ২০ সে. মি.
- খ) ২৫ সে. মি.
- গ) ৩০ সে. মি.
- ঘ) ৪০ সে. মি.

নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

- ক) ভিনিয়ার জোড়কলম এক ধরনের পার্শ্বজোড় কলম।
- খ) সংস্পর্শ জোড়কলমকে সংযুক্ত জোড়কলমও বলা হয়।
- গ) ভিনিয়ার জোড়কলমকে বিযুক্ত জোড়কলমও বলা হয়।
- ঘ) আম গাছে অঙ্কুর জোড়কলম করা যায়।
- ঙ) একবীজপত্রী গাছে জোড়কলম করা যায় না।
- চ) দ্বিবীজপত্রী গাছে জোড়কলম করা যায় না।
- ছ) বসন্ত কাল জোড়কলমের উপযুক্ত সময়।
- জ) শীতকাল ভিনিয়ার জোড়কলমের উপযুক্ত সময়।
- ঝ) ভিনিয়ার জোড়কলম সংস্পর্শ জোড়কলমের তুলনায় বেশি ঝামেলাপূর্ণ।
- ঞ) জোড়কলমের মাধ্যমে জাত পরিবর্তন করা যায়।

পাঠ ২.৫ চোখকলম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চোখকলম কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চোখকলমের সুবিধা ও অসুবিধাসম হ লিখতে ও বলতে পারবেন।
- চোখকলম কীভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

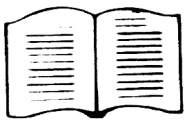

টি চোখকলম (T-budding/Shield budding)

কুঁড়ি সংযোজনের বিভিন্ন পদ্ধতিসম হের মধ্যে এটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। আদিজোড়ের গায়ে টি আকারে কেটে সেখানে বর্মাকৃতির কুঁড়ি স্থাপন করা হয় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণত যে কোনো চোখকলমের জন্য প্রথমে বীজ থেকে আদিজোড় উৎপন্ন করা হয়। এরূপ একটি আদিজোড়ের কান্ড বা শাখা নির্বাচন করে উপযোগী স্থানে টি আকারে বাকল কাটতে হয়। অতঃপর চাকুর মাথা লম্বাভাবে কর্তিত স্থানে ঢুকিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে বাকলকে কাঠ থেকে আলাদা করা হয়। কা খিত কুঁড়ি (উপজোড়) গাছ থেকে তুলে তার কাঠ পরিষ্কার করে বর্মাকারে কাটা হয় এবং সেই কুঁড়িটি- আকারে কাটা স্থানে প্রবিষ্ট করানো হয়। কুঁড়ি সংলগ্ন বাকলটি সাধারণত ২.৫ সে. মি. লম্বা ও কুঁড়ি অপেক্ষা কিছুটা চওড়া করে তৈরি করা হয়। কুঁড়ি ও পত্রবৃন্ত উন্মুক্ত রেখে পলিথিন ফিতা দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। যখন কুঁড়িটি আদিজোড়ের সাথে সাফল্যজনকভাবে লেগে যায় এবং নতুন বিটপের প্রস্ফুরণ ঘটে তখন পলিথিন ফিতা খুলে ফেলা হয়। নব বিটপ ১০-১২ সে. মি. লম্বা হলে সংযোজিত স্থানের ওপর থেকে আদিজোড়ের ডালপালা কেটে দেয়া হয়। গোলাপ গাছে এ কলম সফলভাবে করা যায়।

খ) উল্টা টি –চোখকলম (Inverted T-budding)

বৃষ্টিবহুল এলাকায় বা বর্ষাকালে টি চোখকলম করা কিছুটা অসুবিধাজনক। তাই তখন উল্টা টি চোখ কলম করা হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি যাতে সংযোজিত স্থানের ভিতরে জমে থাকতে না পারে প্রধানত সে জন্যই এ সময় এ কলম করা হয়ে থাকে। প্রথমে উল্টা টি আকারে (⊥) আদিজোড়ে বাকল কেটে সেখানে উল্টা করে তৈরিকৃত বর্মাকৃতির কুঁড়িটিকে কাটা বাকলের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। কুঁড়ি সংযোজনের কাজ সাধারণত ৫ মিনিটের মধ্যেই সম্পাদন করতে হয়। লেবুতে এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ) আই চোখকলম (I-budding)

এ ধরনের চোখকলম তৈরির জন্য কুঁড়িটিকে প্রথমে বর্গাকার বা আয়তাকারে কাটা হয়। অত:পর আদিজোড়ের বাকলে কুঁড়ির দৈর্ঘ্য সমান করে আনুভূমিকভাবে দু'টি কর্তন দেয়া হয়। এ দু'টি কাটা স্থানের মাঝখানে লম্বাভাবে একটি কর্তন দিয়ে যোগ করা হয়। ধীরে ধীরে বাডিং নাইফ বা চাকুর মাথা দিয়ে কর্তিত বাকলকে আল্গা করে সেখানে প্রস্তুতকৃত কুঁড়িটিকে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং তারপর টি চোখকলমের মতই অন্যান্য কাজ করা হয়।

ঘ) তালি চোখকলম (Patch/budding)

এ পদ্ধতিতে বাকলকে আয়তাকারে কাটা হয়। অত:পর ঐ আয়তাকার স্থানে প্রস্তুতকৃত কুঁড়িটিকে তালির মত স্থাপন করা হয় এবং মোমযুক্ত ফিতা বা পলিথিন ফিতা দ্বারা পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। তবে বাঁধার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কুঁড়িটি ফিতা দ্বারা কোনো সময় ঢাকা না পড়ে। এ কলমের জন্য ১.২৫-২.৫ সে. মি. ব্যাসের আদিজোড় উত্তম। সংযোজিত কুঁড়ি থেকে ১৫-৩০ দিনের মধ্যেই নতুন বিটপের উন্মোচন ঘটে। তখন আদিজোড়ে জন্মানো অন্যান্য নতুন কুশী বা বিটপ অপসারণ করতে

হয়। যদিও কিছু কিছু তালি চোখকলম টি চোখকলমের চেয়ে ধীরগতি সম্ন্ন তবুও কিছুটা পুর€ বাকলবিশিষ্ট গাছের জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। কুল, কমলালেবু, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি ফলগাছে সাফল্যজনকভাবে তালি চোখকলম করা যায়।

ঙ) চক্র চোখকলম (Ring budding)

উপজোড় থেকে কুঁড়িসহ চক্রাকারে সম্পর্ণ বাকল তুলে আদিজোড়ে সংযোজন করাই হলো চক্র চোখকলম। এ পদ্ধতিতে উপজোড় থেকে একটি কুঁড়িসহ চক্রাকারে ১.২৫-২.৫ সে. মি. লম্বা বাকল কাঠ থেকে আলগা করে ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হয়। অনুরূপে একই ব্যাসের আদিজোড়ের যেখানে কুঁড়ি সংযোজন করা হবে সেখান থেকেও সমদৈর্ঘ্যের বাকল তুলে নেয়া হয়। একাজ একটি দ্বিফলা ছুরি দ্বারা সম্পন্ন করলে উভয়জোড়ের কর্তিত বাকলের দৈর্ঘ্য/উচ্চতা সমান থাকে। অতঃপর কুঁড়িযুক্ত বাকলটিকে আদিজোড়ের বাকলমুক্ত স্থানে স্থাপন করে এঁটে দিতে হয়। স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই উপজোড় কুঁড়িটি আদিজোড়ের সংগে জোড়া লেগে যায় এবং ২০-২২ দিন পরে সুপ্ত কুঁড়িটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। কুল, পেয়ারা প্রভৃতি গাছে এ কলম করা যায়।

চ) কুচি চোখকলম (Chip budding)

যখন বাকলকে আদিজোড় বা উপজোড় থেকে সহজে আল্গা করা যায় না তখন এ কলম করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে আদিজোড় ও উপজোড় উভয় গাছ থেকেই চীপ বা কুচি আকারে কিছু কাঠসহ বাকল তুলে ফেলা হয়। উপজোড়ের ক্ষেত্রে এর সাথে একটি কুঁড়ি থাকে। সাধারণত: এই কুচির দৈর্ঘ্য ২.৫-৩.০ সে. মি. হয়ে থাকে। আদিজোড়ে আন্ত ঃপর্বের মসৃণ জায়গা থেকে এরূপ কুচি তোলা হয় উপজোড় শাখা থেকে এবং অনুরূপ আকৃতির একটি কুঁড়িসহ কুচি কেটে সেখানে সংযুক্ত করা হয়। সংযোজনের পর পলিথিন ফিতা দ্বারা কুঁড়ি উন্মুক্ত রেখে বেঁধে দেয়া হয়। পেয়ারা, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলগাছে এ কলম করা যায়।

ছ) জিহ্বা বা ফোরকার্ট চোখকলম (Forkert budding)

এ পদ্ধতিতে আদিজোড়ে আন্ত ঃপর্বের বাকলে ধারালো চাকু দ্বারা আড়াআড়িভাবে ১.২ সে.মি. ছেদন করার পর ঐ ছেদন রেখার প্রান্ত দ্বয় থেকে লম্বাভাবে ৪ সে.মি. লম্বা দুটি ছেদন রেখা টানা হয়। এরপর ছেদিত বাকলের মুক্তপ্রান্ত ধীরে ধীরে টান দিলে কাঠ থেকে আলগা হয়ে উঠে আসে এবং নিচের দিকে যুক্ত থাকায় জিহবার মত ঝুলে পড়ে। এজন্য একে জিহবা চোখকলমও বলে। অনুরূপভাবে উপজোড় বা মাতৃগাছ থেকে ১.২ সে.মি. চওড়া ও ৩.০ সে.মি. লম্বা একটি চোখ বা কুঁড়িসহ বাকল তুলে আদিজোড়ে স্থাপন করে কুঁড়ির অগ্রভাগ খোলা রেখে ফিতার সাহায্যে বেঁধে দিতে হয়। কুঁড়ির বৃদ্ধি শুরু হলে ফিতার বাঁধন ঢিলে করে দিতে হবে।

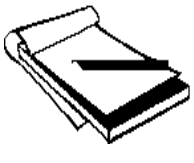

অনুশীলন (Activity) *ঃ আপনার বাগানের গোলাপ গাছের কীভাবে বংশ বিস্তার করবেন তা বর্ণনা করুন।*

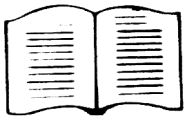

সারমর্ম ঃ কুঁড়ি সংযোজনের বিভিন্ন পদ্ধতিসম হের মধ্যে টি চোখকলম অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। আদিজোড়ের গায়ে টি আকারে কেটে সেখানে বর্মাকৃতির কুঁড়ি স্থাপন করা হয় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বৃষ্টিবহুল এলাকায় বা বর্ষাকালে টি চোখকলম করা কিছুটা অসুবিধাজনক। তাই তখন উল্টা টি চোখ কলম করা হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি যাতে সংযোজিত স্থানের ভিতরে জমে থাকতে না পারে প্রধানত সে জন্যই এ সময় এ কলম করা হয়ে থাকে। তালি চোখকলম পদ্ধতিতে বাকলকে আয়তাকারে কাটা হয়। অতঃপর ঐ আয়তাকার স্থানে প্রস্তুতকৃত কুঁড়িটিকে তালির মত স্থাপন করা হয় এবং মোমযুক্ত ফিতা বা পলিথিন ফিতা দ্বারা পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। তবে বাঁধার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কুঁড়িটি ফিতা দ্বারা কোনো সময় ঢাকা না পড়ে। উপজোড় থেকে কুঁড়িসহ চক্রাকারে সম্পর্ণ বাকল তুলে আদিজোড়ে সংযোজন করাই হলো চক্র চোখকলম। যখন বাকলকে আদিজোড় বা উপজোড় থেকে সহজে আল্‌গা করা যায় না তখন কুচি চোখকলম কলম করা হয়ে থাকে। কুঁড়ির বৃদ্ধি শুরু হলে ফিতার বাঁধন ঢিলে করে দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। টি চোখ কলমের ক্ষেত্রে কুড়ি সংলগ্ন বাকলটি সাধারনত কত সে. মি. লম্বা করে কাটা হয?
- ক) ২.০ সে. মি.
- খ) ২.৫ সে. মি.
- গ) ৩.০ সে. মি.
- ঘ) ৩.৫ সে. মি.

২। উল্টা টি চোখ কলমের ক্ষেত্রে কুড়ি সংযোজনের কাজ সাধারনত কত সময়ের মধ্যেই সম্পাদন করতে হয়?
- ক) ৩ মিনিট
- খ) ৫ মিনিট
- গ) ৭ মিনিট
- ঘ) ১০ মিনিট

৩। তালি চোখ কলমের জন্য কত ব্যাসের আদিজোড় উত্তম?
- ক) ১.২৫ - ২.৫০ সে. মি.
- খ) ৩.০০ - ৩.৫০ সে. মি.
- গ) ৩.৫০ - ৩.৭৫ সে. মি.
- ঘ) ৩.৭৫ - ৪.২৫ সে. মি.

নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

- ক) চোখকলম এক ধরনের জোড়কলম।
- খ) চোখকলমে জোড়কলমের চেয়ে কম সময় লাগে।
- গ) গাছের বাকল মোটা হলে তালিকলম করা উচিত।
- ঘ) গাছের বাকল পাতলা হলে টি চোখকলম করা বাঞ্ছণীয়।
- ঙ) বসন্ত কাল চোখকলমের উপযুক্ত সময়।
- চ) গ্রীষ্মকাল চোখকলমের উপযুক্ত সময়।
- ছ) বর্ষাকাল চোখকলমের উপযুক্ত সময়।
- জ) কুল গাছে টি চোখকলম ভালো হয়।
- ঝ) গোলাপ গাছে তালিকলম ভালো হয়।
- ঞ) লেবুজাতীয় গাছ চোখকলমের সাহায্যে বংশ বিস্তার করা যায়।

পাঠ ২.৬ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার

এ পাঠ শেষে আপনি –

- টিস্যুকালচার কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- টিস্যুকালচার পদ্ধতির উদ্দেশ্য, ব্যবহার, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখতে ও বলতে পারবেন।
- টিস্যুকালচারের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

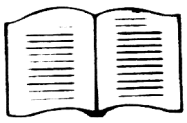

টিস্যুকালচারের সংজ্ঞা

জীবাণুম ক্ত পরিবেশে কালচার মাধ্যমের সাহায্যে পরীক্ষানলে বা অন্য কোনো পাত্রে পুষ্টি ও পরিবেশ নিয়ন্তক পূর্বক উদ্ভিদের কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গ থেকে এর বংশ বিস্তার করাকে টিস্যুকালচার বলে। টিস্যু কালচার বলতে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কৃত্রিম মাধ্যমে (ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে) উদ্ভিদের কোনো কর্তিত অংশ (explant) থেকে বংশবিস্তার করাকে বোঝায়। এর আরেকটি সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে ইন-ভিট্রো কালচার।

টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি

যে কোনো সফল টিস্যু কালচারের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত সুবিধাদির প্রয়োজন হয়, যথা- (ক) কালচার ল্যাবরেটরী (খ) জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা (গ) কালচার মাধ্যম ও (ঘ) কালচার পরিবেশ।

টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্য, ব্যবহার ও সুবিধাসমূহ

আজকাল বর্ধিত হারে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই টিস্যুকালচারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখ্যতঃ বংশবিস্তারের কাজে টিস্যু কালচার প্রাথমিকভাবে দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যথা- (ক) দ্রুত অসংখ্য নতুন চারা বা ক্লোন তৈরি করা ও (খ) নির্দিষ্ট রোগজীবাণু-পরীক্ষিত (specific pathogen-tested)

ক্লোনসম হের বর্ধন, ব্যবস্থাপনা ও বিস্তার। এ ছাড়াও দূরবর্তী অঞ্চলে রোপণদ্রব্য স্থানান্তর, দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লোনাল দ্রব্য সংরক্ষণ প্রভৃতিতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণও তাদের বিভিন্ন কাজে এ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

টিস্যু কালচারের সুবিধাসমূহ

- নির্দিষ্ট কে ানের গণবংশবিস্তার- অল্প সময়ে দ্রুত বংশবিস্তার টিস্যু কালচারের একটি অন্যতম সুবিধা।
- রোগজীবাণুমুক্ত গাছ উৎপাদন- টিস্যু কালচার এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কে ানকে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং ব্যবহারকারীদের নিকট না দেয়া পর্যন্ত জীবাণু দ্বারা পুনঃ আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়।
- হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য মাতৃগাছের ক্লোনাল বংশবিস্তার- সাধারণত অ্যাসপারাগাস, টমেটো, কুমড়া জাতীয় সবজী এবং ব্রোকলির জন্য করা হয়।
- একবীজপত্রী উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবিস্তার- একবীজপত্রী উদ্ভিদে সাধারণত বীজ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বংশবিস্তার করা যায় না। কিন্তু টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এসব গাছের বংশবিস্তার করা যায়, যেমন- নারিকেল, খেজুর ইত্যাদি।

- ভ্র€ণস্রাবজনিত সমস্যা দূরীকরণ- অনেক সময় ভ্রুণস্রাবের (embryo abortion) জন্য বীজ উৎপাদনে উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ বেশ সমস্যার সন্মুখীন হন। ভ্রুণ কালচার তাদের এ সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

টিস্যু কালচারের অসুবিধাসম হ

- এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন হয়।
- উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশি। এ পদ্ধতির কার্যপ্রণালি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় এ কাজ করতে যথেষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ লোকের দরকার হয়।
- উচ্চ আয়তনের সংরক্ষণাগার দরকার হয়।
- রোগজীবাণুর সংক্রমণ হলে অতি অল্প সময়ে খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
- রোগজীবাণু শনাক্ত করতে ভুল হলে অথবা কোনো অজানা রোগজীবাণু উদ্ভিদাংশে থেকে গেলে তা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায় এবং টিস্যু কালচার ব্যর্থ হয়।
- টিস্যু কালচার পদ্ধতি সকল প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য ব্যবহার করা যায় না। অনেক প্রজাতির উদ্ভিদের বেলায় বর্ধনের হার তত দ্রুত নয় বিধায় এ পদ্ধতি লাভজনক হয় না এবং মাঠে লাগানোর পর অনেক গাছ মারা যায়।

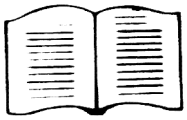

সারমর্ম ঃ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কালচার মাধ্যমের সাহায্যে পরীক্ষানলে বা অন্য কোনো পাত্রে পুষ্টি ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রক পূর্বক উদ্ভিদের কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গ থেকে এর বংশ বিস্তার করাকে টিস্যু কালচার বলে। টিস্যু কালচার বলতে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কৃত্রিম মাধ্যমে (ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে) উদ্ভিদের কোনো কর্তিত অংশ (explant) থেকে বংশবিস্তার করাকে বোঝায়। এর আরেকটি সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে ইন-ভিট্রো কালচার। যে কোনো সফল টিস্যু কালচারের জন্য সাধারণত কালচার ল্যাবরেটরী, জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা, কালচার মাধ্যম ও কালচার পরিবেশ এসব সুবিধাদির প্রয়োজন হয়। আজকাল বর্ধিত হারে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই টিস্যু কালচারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখ্যতঃ বংশবিস্তারের কাজে টিস্যু কালচার প্রাথমিকভাবে দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যথা- (ক) দ্রুত অসংখ্য নতুন চারা বা ক্লোন তৈরি করা ও (খ) নির্দিষ্ট রোগজীবাণু-পরীক্ষিত ক্লোনসমূহের বর্ধন, ব্যবস্থাপনা ও বি·স্তার। এ ছাড়াও দূরবর্তী অঞ্চলে রোপণদ্রব্য স্থানান্তর, দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লোনাল দ্রব্য সংরক্ষণ প্রভৃতিতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণও তাদের বিভিন্ন কাজে এ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সফল টিস্যুকালচারের জন্য কতটি সুবিধার প্রয়োজন?
- ক) ২ টি
- খ) ৩ টি
- গ) ৪ টি
- ঘ) ৫ টি

২। বংশ বিস্তারের কাজে টিস্যুকালচার প্রাথমিকভাবে কয়টি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?
- ক) ২ টি
- খ) ৩ টি
- গ) ৪ টি
- ঘ) ৫ টি

৩। হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য মাতৃগাছের ক্লোনাল বংশ বিস্তার কোন্‌টির জন্য করা হয়?
- ক) নারিকেল
- খ) খেজুর
- গ) তাল
- ঘ) টমেটো

ব্যবহারিক

পাঠ ২.৭ শাখা ও গুটি কলম পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ থেকে আপনি –

- শাখা ও গুটিকলম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুসঙ্গীক দ্রব্যের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- শাখা কলম হাতে কলমে তৈরি করতে পারবেন।
- গুটিকলম হাতে কলমে তৈরি করতে পারবেন।
- শাখা ও গুটিকলম তৈরি করার জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক) শাখা কলম পদ্ধতি অনুশীলন।

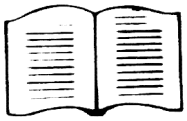

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

ক) উন্নত জাতের মাতৃগাছ
খ) সিকেচার
গ) ধারালো চাকু
ঘ) নার্সারি বেড
ঙ) খুরপী
চ) কোদাল
ছ) ছায়াযুক্ত স্থান

২। কাজের ধাপ

- শাখার অগ্রভাগ থেকে ১৫ সে. মি. বাদ দিয়ে নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে ৩টি পর্বসহ এক বছর বয়সের ২০-২৫ সে. মি. দীর্ঘ একটি শাখা সিকেচারের সাহায্যে কেটে নিন।
- শাখার উপরের প্রান্ত পর্বসন্ধির ২.০ সে. মি. উপরে গোল করে ও কর্তিত শাখার নিচের প্রান্ত পর্বসন্ধির ঠিক নিচে ৩/৪ সে. মি. দীর্ঘ করে তির্যকভাবে কাটুন।
- এক তৃতীয়াংশ মাটির উপরে ও দুই তৃতীয়াংশ মাটির নিচে রেখে মাটির সাথে ৪৫থ কোণ করে নার্সারি বেডে ছায়াযুক্ত স্থানে শাখা কলমটি রোপণ করুন।
- অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা কলম তৈরি করে নার্সারি বেডে রোপণ করুন।

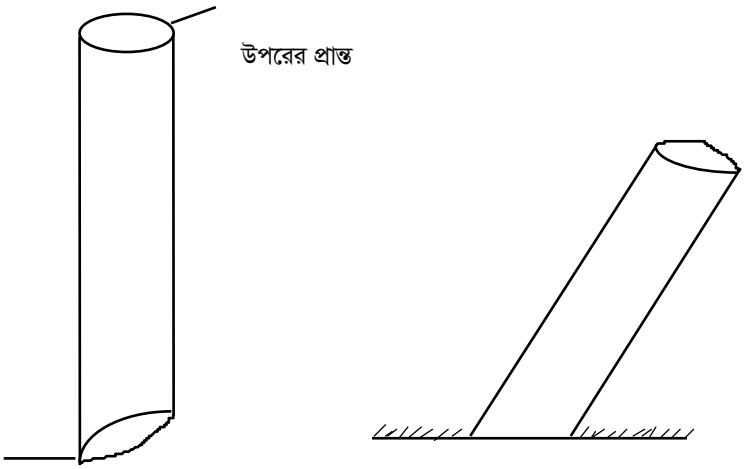

(ক) তেরচা করে কান্ডটি কাটা হয়েছে।

(খ) ভূমির সংগে ৪৫° কোণ করে লাগানো হয়েছে।

চিত্র ২.৭.১ ঃ শাখা কলম পদ্ধতি অনুশীলন

৩। সাবধানতা

- শাখা কলম রোপণের সময় অগ্রভাগ উপরে রেখে নিম্নাংশ মাটিতে পুতে দিতে হবে।
- নার্সারি বেড অর্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে হওয়া বাঞ্চনীয়।
- নার্সারি বেডের মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক কিন্তু সুনিষ্কাশিত হওয়া বাঞ্চনীয়।

খ) গুটি কলম পদ্ধতি অনুশীলন

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

- উন্নত জাতের মাতৃগাছ
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নার্সারি বেড
- গোবর মিশ্রিত মাটি
- পানি
- পলিথিন ব্যাগ
- রশি

২। কাজের ধাপ

- নির্বাচিত মাতৃগাছের ঝুলন্ত শাখার অগ্রভাগ থেকে ৩০-৩৫ সে. মি. দূরে পর্বসন্ধির ঠিক নিচে ৫-৭.৫ সে. মি. জায়গায় চাকু দিয়ে ক্যাম্বিয়ামসহ বাকল তুলে ফেলুন।

- গোবর মিশ্রিত মাটি ও পানির সাহায্যে একটি গুটি তৈরি করুন। কর্তিত অংশের উপরের পর্বসন্ধিসহ চর্তুদিকে গুটি লাগিয়ে পলিথিন কাগজ দ্বারা পেচিয়ে গুটির উপরে, নিচে ও মাঝে রশি দ্বারা বেঁধে দিন।
- অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুটি কলম তৈরি করুন। কলম করার তিন মাসের মধ্যেই গুটি কাটার উপযুক্ত হয়। গুটি থেকে নিচের দিকে ৫ সে. মি. দূরে শাখাটি চক্রাকারে দুই থেকে তিন ধাপে কাটতে হবে। কাটার পর গুটি কলমটি ছায়াযুক্ত স্থানে নার্সারিতে খড় দ্বারা ঢেকে পানি ছিটিয়ে দিয়ে সপ্তাহ খানেক মাটির উপরে রেখে দিন অতঃপর নার্সারি বেডে রোপণ করুন।

চিত্র ২.৭.২ ঃ গুটি কলমের বিভিন্ন ধাপ

ক. আংটি আকারে বাকল তুলে ফেলা হয়েছে খ. পচা গোবর ও মাটির মিশ্রণে ক্ষতিস্থান আবৃত গ. পলিথিন দিয়ে গুটি বাধা হয়েছে।

৩। সাবধানতা

- কর্তিত অংশে বাকলের নিচে সবুজাভ ক্যাম্বিয়াম লেয়ারটি ভালোভাবে তুলে ফেলতে হবে। অন্যথায় গুটি কলম সফল হবে না।

- গুটি সব সময় আর্দ্র থাকা বাঞ্চনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। শাখাকলম কত দীর্ঘ করে কাটতে হয়?
- ক) ৫-১০ সে. মি.
- খ) ১০-১৫ সে. মি.
- গ) ১৫-২০ সে. মি.

২। শাখাকলমের নিচের প্রান্তে কী ধরনের কর্তন দিতে হয়?
- ক) গোলাকার
- খ) তির্যক
- গ) সুচালো

৩। শাখাকলম মাটির সাথে কত ডিগ্রী কোণে লাগাতে হয়?
- ক) ৩০থ
- খ) ৪০থ
- গ) ৪৫থ
- ঘ) ৫০থ

৪। শাখাকলমের কত অংশ মাটির উপরে ও কত অংশ মাটির নিচে রাখতে হয়?
- ক) এক তৃতীয়াংশ মাটির উপরে ও দুই তৃতীয়াংশ মাটির নিচে।
- খ) দুই তৃতীয়াংশ মাটির উপরে ও এক তৃতীয়াংশ মাটির নিচে।
- গ) অর্ধেক মাটির উপরে ও অর্ধেক মাটির নিচে।

৫। গুটিকলমের কোন্ স্থান থেকে ডশকুঁড়ি বের হয়?
- ক) গুটির ঠিক উপরে পর্বসন্ধি থেকে।
- খ) গুটির ভিতর কর্তিত অংশ থেকে।
- গ) গুটির নিচের পর্বসন্ধি থেকে।

৬। গুটিকলম তৈরির সময় শাখার কোন্ কোন্ অংশ তুলে ফেলতে হয়?
- ক) বাকল ও কাঠ।
- খ) বাকল ও ক্যাম্বিয়াম লেয়ার।
- গ) ক্যম্বিয়াম লেয়ার ও কাঠ।

পাঠ ২.৮ ভিনিয়ার জোড়কলম পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ থেকে আপনি –

- ভিনিয়ার জোড়কলম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- ভিনিয়ার জোড়কলম হাতে কলমে তৈরি করতে পারবেন।
- ভিনিয়ার জোড়কলম তৈরি করার জন্য কী কী সাবধানতা অবম্বন করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভিনিয়ার জোড়কলম পদ্ধতি অনুশীলন

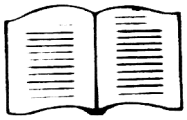

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ

- আদিজোড়
- উপজোড়
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নাইলন স্ট্রিপ
- পলিথিন ব্যাগ
- রশি

২। **কাজের ধাপ**

- নার্সারি বেডে বা টবে বীজ থেকে চারা গাছ উৎপাদন করুন। ৯ মাস থেকে শুরু করে ১৮ মাস পর্যন্ত বয়সের চারা গাছকে আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে উপজোড় সংগ্রহ করুন। উপজোড়ের পাতার বোটা ১ সে. মি. রেখে পাতাগুলো কেটে ফেলুন।
- মাটি থেকে ২৫ থেকে ৩০ সে. মি. উপরে আদিজোড়ের ওপর লম্বালম্বি ভাবে ৫/৬ সে. মি. তেরছাভাবে কাটুন। উক্ত কর্তনের নিম্নপ্রান্তে ছোট তেরছা কর্তনের মাধ্যমে কর্তিত কাঠ সরিয়ে ফেলুন।
- উপজোড়ের নিম্নাংশে আদিজোড়ের অনুরূপ কর্তন (চিত্র দ্রষ্টব্য) দিয়ে উপজোড়টি তৈরি করুন।
- আদিজোড় ও উপজোড় একত্রে ভালোভাবে বসিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দ্বারা শক্ত করে বাঁধুন।
- পলিথিন ব্যাগ দ্বারা উপজোড়টি আবৃত করে আদিজোড়ের সাথে বেঁধে রাখুন। আদিজোড় ও উপজোড় ভালোভাবে জোড়া লাগার পর (৫০-৬০ দিন পর) জোড়স্থানের ২/৩ সে. মি. উপরে আদিজোড়টি কেটে ফেলুন।

চিত্র ২.৮.১ ঃ ভিনিয়ার জোড়কলম

ক. আদিজোড়ে ৫-৬ সে. মি. দীর্ঘ তেড়ছা কর্তণ খ. উপজোড়ে কর্তণ গ. আদি ও উপজোড় যথাযথভাবে মিলিয়ে নাইলন টেপ দিয়ে বন্ধন ঘ. আদিজোড়ের শীর্ষভাগ কর্তণ ও উপজোড়ের বৃদ্ধি।

৩। সাবধানতা

- দুই তিন দিন পর পর পলিব্যাগ খুলে ভিতরে জমাকৃত পানি ফেলে দিন।
- আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোনো ফাঁক না থাকে।
- জোড়স্থানের নিচে আদিজোড়ে কোনো শাখা প্রশাখা জন্মিতে দেয়া যাবেনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ভিনিয়ার জোড়কলম কখন করতে হয়?
- ক) বর্ষাকালে
- খ) শীতকালে
- গ) গীষ্মকালে

২। ভিনিয়ার জোড়কলমে ব্যবহারিত উপজোড়র দৈর্ঘ্য কত হওয়া বাঞ্চনীয়?
- ক) ৫ - ৭ সে. মি.
- খ) ১০ - ১২ সে. মি.
- গ) ১৫ - ১৬ সে. মি.

৩। ভিনিয়ার জোড়কলমে ব্যবহারিত উপজোড়ে পাতা থাকলে কী অসুবিধা হবে?
- ক) কলম সফল হবে না
- খ) কলম সফল হবে কিন্তু পরে মারা যাবে।
- গ) কলম দুর্বল হবে।

৪। ভিনিয়ার জোড়কলমে ব্যবহারিত উপজোড় পলিথিন ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিতে হয় কেন?
- ক) উপজোড়কে শুকানোর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- খ) আদিজোড়কে শুকানোর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- গ) উপজোড়কে শুকানোর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং কলম সফল করার জন্য।

পাঠ ২.৯ সংস্পর্শ জোড়কলম পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ থেকে আপনি –

- সংস্পর্শ জোড়কলম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- সংস্পর্শ জোড়কলম হাতে কলমে তৈরি করতে পারবেন।
- সংস্পর্শ জোড়কলম তৈরি করার জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

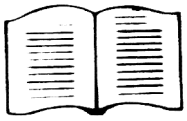

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ

- আদিজোড়
- উপজোড়
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নাইলন স্ট্রিপ
- পলিথিন ব্যাগ
- রশি

২। কাজের ধাপ

- পলিব্যাগে বীজ থেকে চারা তৈরি করুন। এই চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহারিত হবে।
- কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছে উপজোড় নির্বাচন করুন।
- নির্বাচিত উপজোড়ে ৫ থেকে ৭ সে.মি. স্থানে লম্বালম্বিভাবে কাঠসহ বাকল তুলে ফেলুন (চিত্র ২.৯.১ দেখুন)। কর্তনের উভয় প্রান্ত আড়াআড়িভাবে এবং মধ্যাংশ একটু গভীর করে কাটুন। কর্তিত স্থানটি মসৃণ করুন।
- নির্বাচিত আদিজোড়ে সুবিধামত স্থানে উপজোড়ের অনুরূপ কর্তন দিয়ে আদিজোড় তৈরি করুন।
- আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে ভালভাবে লাগিয়ে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে রাখুন।
- মাস দুই পর জোড়স্থানের ৫ সে.মি. নিচে মাতৃগাছ থেকে উপজোড় বিচ্ছিন্ন করে কলমটিকে নিচে নামিয়ে এনে নার্সারিতে লাগান।
- কলমটিতে উপজোড়ের বৃদ্ধি শুরু হলে জোড়স্থানের ৫ সে. মি. উপরে আদিজোড়কে কেটে ফেলুন।

চিত্র ২.৯.১ঃ সংস্পর্শ জোড়কলম

ক. উভয় কান্ডে কিছুটা কাটাসহ ছাল ১-২ ইঞ্চি লম্বা করে কাটা হয়েছে। গ. কাঠসহ সাল ক্যাম্বিয়ামের অতি কাছাকাছি কাটা হয়েছে। খ ও ঘ. কান্ড গুটো ফিতা দ্বারা শক্ত করে বেধে নিয়ে তার উপরে গ্রাফটিং মোমের আবরণ নেয়া হয়েছে।

৩। সাবধানতা

- আদিজোড় ও উপজোড়ের কর্তিত স্থান মসৃন হতে হবে।
- আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোনো ফাঁক না থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। সংস্পর্শ জোড়কলম কখন করতে হয়?
- ক) গ্রীষ্মকালে
- খ) বর্ষাকালে
- গ) শীতকালে

২। সংস্পর্শ জোড়কলমে ব্যবহারিত আদিজোড়ের বয়স কত হলে ভাল হয়?
- ক) ১ মাস
- খ) ১২ মাস
- গ) ২৪ মাসে
- ঘ) ৩০ মাস

৩। সংস্পশ জোড়কলমে ব্যবüত উপজোড়ের বয়স কত হলে ভাল হয়?
- ক) ১ মাস
- খ) ১২ মাস
- গ) ২৪ মাস
- ঘ) ৩০ মাস

৪। বাঁধার পর আদিজোড় ও উপজোড়ের মাঝে ফাঁক থাকলে কী অসুবিধা হয়?
- ক) কলম সফল হবে না।
- খ) কলম সফল হবে কিন্তু পরে মারা যাবে।
- গ) কলম সফল হবে কিন্তু কলম দুর্বল হবে।

পাঠ ২.১০ তালি, চক্র ও টি কলম অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- তালি, চক্র ও টি কলম হাতে কলমে তৈরি করতে পারবেন।
- তালি, চক্র ও টি কলম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করতে পারবেন।
- তালি, চক্র ও টি কলম করতে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা লিখতে ও বলতে পারবেন।

ক) তালি চোখকলম অনুশীলন

- প্রয়েজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি
- আদিজোড় ও উপজোড়
- বাডিং ছুরি
- দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি
- নাইলন স্ট্রিপ

২। কাজের ধাপ

- আদিজোড় নির্বাচিত করুন এবং নির্বাচিত আদিজোড়ের যেকোন সুবিধাজনক স্থানে বর্গাকার বা আয়তাকারে বাকল তুলে ফেলুন।
- কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ আদিজোড়ে কর্তিত স্থানের অনুরূপ আকৃতির একটি বাকল তুলে এনে আদিজোড়ের কর্তিত স্থানে স্থাপন করুন।
- কুঁড়িটি বাহিরে রেখে পলিথিন ফিতা বা নাইলন স্ট্রিপ দ্বারা বাকলটিকে আদিজোড়ের সাথে ভালোভাবে বেঁধে দিন।

চিত্র ২.১০.১ঃ তালি চোখ কলম

ক. উপজোড় থেকে আয়তাকারে কুঁড়িসহ বাকল তুলে আনা হয়েছে। খ. আদিজোড়ে আয়তাকারে বাকল তুলে নেওয়া হয়েছে। গ. উপজোড় থেকে তুলে আনা কুড়িসহ বাকলটি আদি জোড়ে স্থাপন করা হয়েছে। ঘ. জোড়াকৃত কুঁড়িটি পলিথিন দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

সাবধানতা

- বাঁধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে।
- প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

খ) চক্র চোখ কলম পদ্ধতি অনুশীলন

- প্রয়েজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুসঙ্গীক দ্রব্যাদি।
- আদিজোড় ও উপজোড়
- বাডিং ছুরি
- দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি
- নাইলন স্ট্রিপ

২। কাজের ধাপ

- নির্বাচিত আদিজোড়ে আঙ্গুলের মত মোটা কচি ডালে ২.৫ সে. মি. পরিমাণ বাকল গোল করে রিং এর মত করে তুলে ফেলুন।
- কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ আদিজোড়ে কর্তিত স্থানের অনুরূপ আকৃতির একটি বাকল তুলে এনে আদিজোড়ের কর্তিত স্থানে স্থাপন করুন।
- কুঁড়িটি বাহিরে রেখে পলিথিন ফিতা বা নাইলন ষ্ট্রিপ দ্বারা বাকলটিকে আদিজোড়ের সাথে ভাল ভাবে বেঁধে দিন।

চিত্র ২.১০.২ঃ চক্র চোখকলম

ক. আংটি আকারে কুঁড়িসহ বাকল উপজোড় থেকে তুলে আনা হয়েছে। খ. আদিজোড়ে গোলাকারভাবে আংটির মত বাকল তুলে ফেলা হয়েছে। গ. উপজোড়ের কুঁড়িসহ বাঁকল আদিজোড়ের উপর বসিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

৩। **সাবধানতা**

- বাঁধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে।
- প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

গ) টি চোখ কলম পদ্ধতি অনুশীলন

১। প্রয়েজনীয় যন্ত্র পাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

- আদিজোড় ও উপজোড়
- বাডিং ছুরি
- দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি
- নাইলন স্ট্রিপ

২। **কাজের ধাপ**

- নির্বাচিত আদিজোড়ে মাটি থেকে ২০/২৫ সে. মি. উপরে কান্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে ১.৩ সে. মি. পরিমাণ লম্বা কর্তন দিন। এ কাটা দাগের মাঝখান থেকে নিচের দিকে ৪/৫ সে. মি. পরিমাণ আরেকটি লম্বালম্বি কর্তন দিন।
- লম্বালম্বি দাগ বরাবর চাকু দ্বারা কাঠ থেকে বাকলকে আলগা করুন।
- কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ একটি বাকল কেটে নিন। বাকলটিকে ঢালের মত করে তৈরি করুন
- কুঁড়িসহ বাকলটি আদিজোড়ে কর্তিত অংশে ঢুকিয়ে দিন।
- কুঁড়িটিকে বাহিরে রেখে পলিথিন ফিতা দ্বারা বাকলটি আদিজোড়ের সাথে ভালভাবে বেঁধে দিন।

চিত্র ২.১০.৩ঃ টি চোখ কলম

৩। সাবধানতা

- বাঁধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে।
- প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। চোখকলমের উপযুক্ত সময় কোন্‌টি?
- ক) বর্ষাকাল
- খ) গ্রীষ্মকাল
- গ) শীতকাল
- ঘ) বসন্তকাল

২। টি চোখকলম কোন্ ধরনের বাকল বিশিষ্ট গাছে ভালো হয়?
- ক) মোটা বাকল বিশিষ্ট গাছে
- খ) পাতলা বাকল বিশিষ্ট গাছে
- গ) মধ্যম বাকল বিশিষ্ট গাছে

৩। তালি চোখকলম কোন্ ধরনের বাকল বিশিষ্ট হাছে ভালো হয়?
- ক) মোটা বাকল বিশিষ্ট গাছে
- খ) পাতলা বাকল বিশিষ্ট গাছে
- গ) মধ্যম বাকল বিশিষ্ট গাছে

৪। চক্র চোখকলম কোন্ গাছে ভালো হয়?
- ক) কুল গাছে
- খ) আম গাছে
- গ) পেয়ারা গাছে
- ঘ) গোলাপ গাছে

৫। কুঁড়িসহ বাকলটি বেঁধে দিলে কী হবে?
- ক) কুঁড়িটি মারা যাবে ফলে কলম সফল হবে না।
- খ) কুড়িটি শক্তিশালী হবে।
- গ) কলম দুর্বল হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্নাবলী

১। উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায়?

২। শাখা কলম কত প্রকার ও কী কী?

৩। দাবাকলম কত প্রকার ও কী কী?

৪। জোড়কলম কত প্রকার ও কী কী?

৫। চোখকলম কত প্রকার ও কী কী?

৬। সংস্পর্শ জোড়কলম ও ভিনিয়ার জোড়কলমের মধ্যে পার্থক্য কী?

৭। অঙ্গজ ও যৌন বংশ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধাসম হ লিপিবদ্ধ করুন।

৮। সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন।

(ক) গুটিকলম

(খ) সংস্পর্শ জোড়কলম

(গ) ভিনিয়ার জোড়কলম

(ঘ) চোখকলম

(ঙ) শাখা কলম

(চ) টিস্যুকালচার

৯। টিস্যুকালচারের উদ্দেশ্য, সুবিধা ও অসুবিধাসম হ লিপিবদ্ধ করুন।

১০। টিস্যুকালচারের পদ্ধতিসম হ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১১। জোড়কলমের সংজ্ঞা দিন।

১২। জোড়কলম কত প্রকার ও কী কী?

১৩। জোড়কলমের সুবিধা ও অসুবিধাসম হ লিপিবদ্ধ করুন।

১৪। ভিনিয়ার ও সংস্পর্শ জোড়কলমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

১৫। চোখকলমের সংজ্ঞা দিন।

১৬। চোখকলম কত প্রকার ও কী কী?

১৭। চোখকলমের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।

১৮। টি চোখকলম কখন করা হয় ?

১৯। উল্টা টি চোখকলম কখন করা হয় ?

২০। টিস্যুকালচার বলতে কী বোঝায়?

২১। টিস্যুকালচার পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২২। টিস্যুকালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ২

পাঠ ২.১

১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ ৫। ক

ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা ঙ) সত্য চ) মিথ্যা
ছ) সত্য জ) সত্য ঝ) মিথ্যা

পাঠ ২.২

১। ক ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। ক ৬। গ

ক) মিথ্যা খ) সত্য গ) মিথ্যা (ঘ) সত্যঙ) সত্য চ) সত্য ছ) সত্য
জ) মিথ্যা

পাঠ ২.৩

১। খ ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। গ

ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা ঙ) সত্য চ) সত্য
ছ) মিথ্যা জ) মিথ্যা ঝ) মিথ্যা

পাঠ ২.৪

১। খ ২। ক ৩। খ

ক) সত্য খ) সত্য গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) সত্য চ) মিথ্যা
ছ) মিথ্যা জ) মিথ্যা ঝ) মিথ্যা ঞ) সত্য

পাঠ ২.৫

ক) সত্য খ) সত্য গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) সত্য চ) মিথ্যা
ছ) মিথ্যা জ) মিথ্যা ঝ) মিথ্যা ঞ) সত্য

পাঠ ২.৭

১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। খ

পাঠ ২.৮

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ ২.৯

১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠ ২.১০

১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ক

ইউনিট ৩
ফল গাছের কাঠোমো তৈরি ও ছাটাইকরণ

ইউনিট ৩ ফল গাছের কাঠোমো তৈরি ও ছাটাইকরণ

ফল চাষের জন্য গাছের কাঠামো তৈরি ও ছাটাইকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছাটাইয়ের মাধ্যমে গাছের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করা হয়। ফলে গাছের আকৃতি ঠিক রাখা যায় এবং ফলন বাড়ে। গাছ ছাটাইয়ের অর্থ হলো গাছের যে কোনো অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দেয়া। ফলের উৎপাদন গাছ ছাটাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গাছের ডালপালা বৃদ্ধি ও ফলনের সাথে এর শারীরবৃত্তিক দিকের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ট্রেনিং ও প্রুনিং সংজ্ঞা, পার্থক্য ও উদ্দেশ্য, ট্রেনিং পদ্ধতি ও অনুশীলন সময়, প্রুনিং পদ্ধতি ও অনুশীলন সময় এবং ফল গাছে বিভিন্ন ট্রেনিং ও প্রুনিং পদ্ধতি অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সহ বিস্ তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ ট্রেনিং ও প্রুনিং এর সংজ্ঞা, পার্থক্য ও উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ট্রেনিং ও প্রুনিং কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ট্রেনিং ও প্রুনিং এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ট্রেনিং ও প্রুনিং করার সময় সম্মন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

ফল গাছ বিভিন্ন সময়ে ও উদ্দেশ্যে ছাটাই করা হয়। সময় ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে গাছ ছাটাইকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ট্রেনিং ও প্রুনিং ।

ট্রেনিং কী ?

গাছে ফল ধারণের পূর্বে সুগঠিত ও শক্ত কাঠামো প্রদানের জন্য যে ছাটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে

গাছে ফল ধারণের পূর্বে তাকে একটি সুগঠিত ও শক্ত কাঠামো প্রদানের জন্য যে ছাটাই কাজ করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে । গাছে ট্রেনিং করা হয় যাতে এটি ভবিষ্যতে ফল ধারণের জন্য একটি শক্ত ও সবল কাঠামো নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

প্রুনিং কী ?

গাছের যে কোনো অংশ যেমন, ডাল, পাতা, ফুল, ফল, মূল ইত্যাদি কেটে সরিয়ে ফেলা বা ছাটাইকে প্রুনিং বলে।

Gourley and Howlett (১৯৬০) প্রুনিং এর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন প্রুনিং হলো বিজ্ঞান ও কৌশলের সমন্বয় যার মাধ্যমে গাছের যে কোনো অংশ কেটে বাদ দেয়ার ফলে এর আকার-আকৃতি, বৃদ্ধি, পুষ্পায়ন, ফলধারণ, ফলের মান উন্নতকরণ এবং এমনকি জখম সারিয়ে তোলা ইত্যাদি কাজ প্রভাবান্বিত করে'। অতএব দেখা যাচ্ছে যে গাছের কোনো অংশ যেমন ডাল, পাতা, ফুল, ফল, মূল ইত্যাদি কেটে সরিয়ে ফেলাকে প্রুনিং বলে। আসলে ট্রেনিং ও প্রুনিং এর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ট্রেনিং গাছের আকার, আকৃতি ও একটি শক্ত কাঠামো প্রদানের জন্য করা হয়। অন্যদিকে প্রুনিং গাছের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে ফল ধারণ ও ফলের মান উন্নত করে। উভয় ক্ষেত্রেই গাছের কোনো না কোনো অংশ কেটে বাদ দেয়া হয়। এ জন্য সকল ট্রেনিং হলো প্রুনিং কিন্তু সকল প্রুনিং ট্রেনিং নয়।

ট্রেনিং ও প্রুনিং এর মধ্যে পার্থক্য

ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো গাছ ফুল, ফল ধারণের প র্বে যে ছাটাই করা হয় তা হলো ট্রেনিং এবং গাছ ফুল, ফল ধারণ শুর€র পর যে ছাটাই করা হয় তাকে

ট্রেনিং	প্রুনিং
১। সাধারণত গাছ ফল ধারণের স্তরে পৌঁছানোর পূর্বে যে ছাটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে।	১। গাছ ফলবর্তী হওয়ার পরে যে ছাটাই করা হয় তাকে প্রুনিং বলে।
২। গাছকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয়।	২। গাছের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিক কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়।
৩। গাছকে সুন্দর গড়ন ও বাগানের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে করা হয়।	৩। পুষ্পধারণ, ফলায়ন ও ফলের গুণগত মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রুনিং করা হয়।
৪। সব ধরনের ট্রেনিংকে প্রুনিং বলা হয়।	৪। সব ধরনের প্রুনিং ট্রেনিং নয়।

ফল গাছে ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের উদ্দেশ্য হলো গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, ফুল, ফল ধারণসহ অন্যান্য শারীরবৃত্তিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে সুষ্ঠ ও সঠিক ফলন ও ফলের মান নিয়ন্ত্রণ করা।

ট্রেনিং ও প্রুনিং এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১। গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ,
২। পুষ্প-মুকুল উৎপাদন,
৩। ফল ধারণ,
৪। ফলন বৃদ্ধি,
৫। ফলের আকার, আকৃতি, রং ও মান নিয়ন্ত্রণ,
৬। ফল গাছের পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ,
৭। শক্ত ডাল তৈরি,
৮। গাছের ক্ষত স্থান সারানো,
৯। আন্ত পরিচর্যা সহজ ভাবে করা,
১০। বয়স্ক গাছের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি,
১১। গাছকে খাটো রাখা,
১২। সহজে পোকা মাকড় দমন ও রোগাক্রান্ত ডাল পালা সরানো,
১৩। বাগানের সৌন্দর্য বাড়ানো ও
১৪। ফল গাছের একান্তর ক্রমিক ফলন সমস্যা সমাধান।

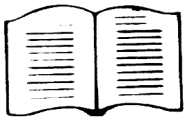

সারমর্ম ঃ গাছে ফল ধারণের পূর্বে তাকে একটি সঠিক ও শক্ত কাঠামো প্রদানের জন্য যে ছাটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলা হয়। গাছে ফল ধারণের স্তরে পৌছানোর পর যে কোনো অংশ যেমন ডাল, পাতা, ফুল, ফল, শিকড় বাকল ইত্যাদি ছাটাই করে এর ফল ধারণ প্রক্রিয়া প্রভাবান্বিত করার পদ্ধতিকে প্রুনিং বলা হয়। তবে সব ধরনের ট্রেনিংকে প্রুনিং বলা হয়। কিন্তু সব ধরনের প্রুনিং ট্রেনিং নয়। ফল গাছে ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের উদ্দেশ্য হলো গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, সঠিক ও সুষ্ঠু কাঠামো প্রদান, বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় দিক নিয়ন্ত্রণ করে সুষ্ঠ ও সঠিক মানের অধিক ফল উৎপাদন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ট্রেনিং কাকে বলে?
- (ক) গাছকে সুগঠিত ও শক্ত কাঠামো প্রদানের জন্য ছাটাইকে ট্রেনিং বলে।
- (খ) গাছকে অসংগঠিত ও দুর্বল কাঠামো প্রদানের জন্য ছাটাইকে ট্রেনিং বলে।
- (গ) গাছে কম ফল পাওয়ার জন্য ছাটাইকে ট্রেনিং বলে।
- (ঘ) কোনোটিই নয়।

২। প্রুনিং কাকে বলে?
- (ক) গাছের যে কোনো অংশ যেমন – ডাল-পালা, পাতা, শিকড়, বাকল ইত্যাদি কেটে সরিয়ে ফেলাকে প্রুনিং বলা হয়।
- (খ) গাছের শুধু ডাল-পালা ছাটাইকে প্রুনিং বলা হয়।
- (গ) গাছের শুধু পাতা ছাটাইকে প্রুনিং বলা হয়।
- (ঘ) গাছের শুধু বাকল ছাটাইকে প্রুনিং বলা হয়।

৩। ট্রেনিং ও প্রুনিং এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কোন্‌টি?
- (ক) ট্রেনিং গাছ ফল ধারণ স্তরে পৌছানোর পরে করা হয়।
- (খ) গাছ ফল দেয়ার স্তরে পৌছানোর পূর্বে যে ছাটাই করা হয় তা ট্রেনিং।
- (গ) যে কোনো সময় ছাটাই করাকে ট্রেনিং বলা হয়।
- (ঘ) কোনটিই সঠিক নয়।

৪। ট্রেনিং ও প্রুনিং এর উদ্দেশ্য কোন্‌টি?
- (ক) গাছের বৃদ্ধি, ফুল-ফল ধারণসহ অন্যান্য শারীরবৃত্তিক দিক নিয়ন্ত্রণ করা।
- (খ) গাছের বৃদ্ধি, ফুল-ফল ধারণ ও শারীরবৃত্তিক দিক নিয়ন্ত্রণ না করা।
- (গ) গাছের বৃদ্ধি, ফুল-ফল ধারণ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী বন্ধ করা।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

পাঠ ৩.২ ট্রেনিং পদ্ধতি ও অনুশীলন সময়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ট্রেনিং পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ট্রেনিং কখন করতে হবে তা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন ট্রেনিং পদ্ধতি কেন করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ট্রেনিং এক ধরনের ছাটাই যা গাছের প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ গাছ ফলবর্তী হওয়ার আগে করা হয়। ট্রেনিং এর উদ্দেশ্য হলো গাছকে একটি সঠিক, সুগঠিত ও শক্ত কাঠামো প্রদান করা যেন গাছ ভবিষ্যতে ফলবর্তী হওয়ার পর ফলের ভার সহ্য করতে পারে এবং ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতি গ্রস্থ না হয়।

ট্রেনিং পদ্ধতিসমূহ

ট্রেনিং পদ্ধতিসম হকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- উচ্চ কেন্দ্র, নাতিউচ্চ কেন্দ্র ও মুক্ত কেন্দ্র। উচ্চ কেন্দ্র ধরনের ট্রেনিং সাধারণত গাছ উঁচু করার উদ্দেশ্য করা হয়। অন্যদিকে নাতি উচ্চ কেন্দ্রে মাঝারি উচ্চতার এবং মুক্ত কেন্দ্রে নিচু গাছ পাওয়া যায়।

বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছে সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে গাছকে ট্রেনিং করা হয়। এগুলো হলো নিম্নরূপঃ

১। উচ্চ কেন্দ্র (Central leader)ঃ সাধারণত এ পদ্ধতির ট্রেনিং এ গাছের প্রধান কান্ডটিকে কোনো বাধা ছাড়াই বাড়তে দেয়া হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পার্শ্বীয় শাখাগুলোকে কেটে দেয়া হয় (চিত্র- ৩.২.১ দেখুন)। এ ট্রেনিং পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো পার্শ্বীয় শাখাসম হের বিন্যাস করা। তবে সাধারণত পার্শ্বীয় শাখাগুলো সাধারণত কম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ ট্রেনিং পদ্ধতিতে গাছের উচ্চতার কোনো বাধ্য বাধকতা থাকে না। এ জন্য ফল গাছের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ট্রেনিং খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত বনজ বৃক্ষে উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

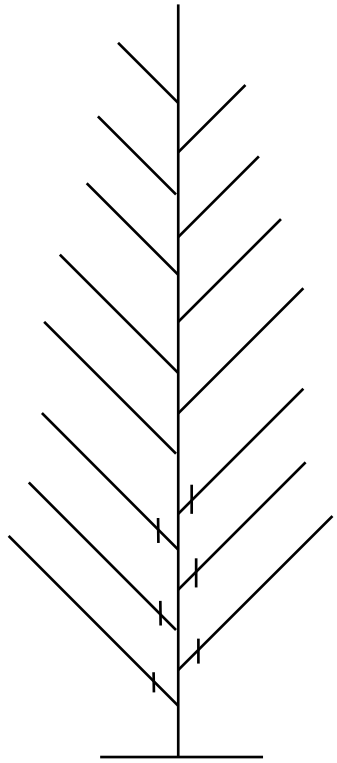

চিত্র ৩.২.১ঃ উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ

উচ্চ কেন্দ্রে গাছ অতিরিক্ত লম্বা হওয়ায় ফল পাড়া এবং আন্ত পরিচর্যা কঠিন হয়ে পড়ে। অপরদিকে নাতি উচ্চ কেন্দ্র ও মুক্ত কেন্দ্র প্রুনিংয়ে গাছ মাঝারী ও খাটো প্রকৃতির হওয়ায় ফল পাড়া বা অন্যান্য আন্ত পরিচর্যা

২। নাতি উচ্চ কেন্দ্র (Modified central leader) ঃ

এ ট্রেনিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রধান কান্ডটিকে ২-৫ বৎসর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত বাড়তে দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রধান কান্ডটির মাথা কেটে দিতে হয় এবং পার্শ্বীয় শাখাগুলোকে সুবিধামত বাড়তে দেয়া হয় (চিত্র- ৩.২.২ দেখুন)। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেনিং করা গাছ সাধারণত মাঝারী উচ্চতা সম্পন্ন হয় এবং শাখা-প্রশাখা সবল হয়। এ ছাড়াও এ পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছে একটি মজবুত ও শক্ত অবকাঠামো তৈরি হয় এবং গাছ খুব বেশি উচু না হওয়ায় ঝড় বা সাইক্লোন থেকে এসব গাছ রক্ষা করা যায়। আম, কাঠাল, লিচু ইত্যাদি ফলজ বৃক্ষ এ পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা যেতে পারে।

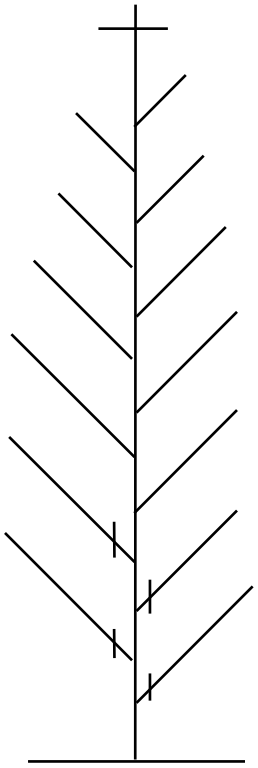

চিত্র ৩.২.২ঃ নাতি উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ

৩। মুক্ত কেন্দ্র (Open centre)ঃ এ পদ্ধতির ট্রেনিং এ প্রধান কান্ডটি কিছুটা উচ্চ হলে অর্থাৎ গাছের বয়স ১-২ বৎসর হলে তার মাথা কেটে ফেলা হয়। ফলে গাছের শীর্ষ প্রকটতা (Apical dominance) লোপ পায় এবং পার্শ্বীয় শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি লাভ করে (চিত্র- ৩.২.৩ দেখুন)। অনেক ক্ষেত্রে গাছ খুব ছোট থাকা অবস্থায় প্রধান কান্ডের মাথা ছেটে দেয়ার ফলে কয়েকটি শাখাকে সমানভাবে বাড়তে দেয়া হয়। এ পদ্ধতির ট্রেনিং এ গাছ সাধারণত খাটো এবং ঝোপালো হয়। এ ধরনের ট্রেনিং সাধারণত সৌন্দর্যবন্ধনকারী গাছের বেলায় বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত গাছের এক থেকে দুই বছরের মধ্যে করতে হয়।

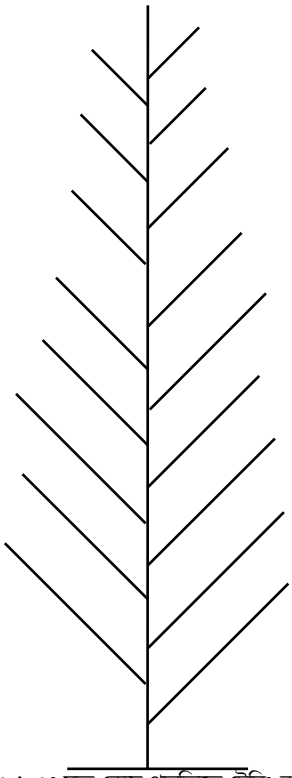

চিত্র ৩.২.৩ঃ মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ।

সারমর্ম ঃ বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছে সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে গাছকে ট্রেনিং করা হয়। এগুলো হলো উচ্চ কেন্দ্র, নাতি উচ্চ কেন্দ্র এবং মুক্ত কেন্দ্র। উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ সাধারণত খুব উচুঁ হয় এবং গাছ থেকে ফল পাড়া, পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন, হরমোন ইত্যাদি আন্ত পরিচর্যা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। নাতি উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ সাধারণত মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন হয় এবং ফল আহরণ, আন্ত পরিচর্যা এবং রোগ বালাই দমন ইত্যাদি কাজ করা সুবিধাজনক হয় বিধায় ফল গাছে এ পদ্ধতির ট্রেনিং বেশি ব্যবহৃত হয়। মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ সাধারণত খাট ও ঝোপালো হয়। যার দরুন ফল সংগ্রহ, বালাই নাশক ছিটানো ও অন্যান্য আন্ত পরিচর্যা করা সহজ হয়। কিন্তু গাছ বেশি ঝোপালো হওয়ায় ফলের রং ভালো হয় না এবং পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ বেশি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বৃক্ষজাতীয় ফল গাছকে একটি পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেয়া হয়?
- (ক) বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছকে পাঁচটি পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেয়া হয়।
- (খ) বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছকে তিনটি পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেয়া হয়।
- (গ) বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছকে কোনো ট্রেনিং দেয়া হয়না।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

২। উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছের ক্ষেত্রে নিচের কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ খুব উঁচু হয়।
- (খ) উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ খুব নিচু হয়।
- (গ) উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ মাঝারি উচ্চতার হয়।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

৩। নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি সাধারণত বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছে ব্যবহৃত হয় না।
- (খ) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি বনজ বৃক্ষ বেশি ব্যবহৃত হয়।
- (গ) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি সাধারণত বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছে বেশি ব্যবহৃত হয়।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

৪। মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ খুব উঁচু হয়।
- (খ) মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ মাঝারি উচ্চতার হয়।
- (গ) মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ খুব উঁচু ও ঝোপালো হয়।
- (ঘ) মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ খাটো ও ঝোপালো হয়।

পাঠ ৩.৩ প্রুনিং পদ্ধতি ও অনুশীলন সময়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রুনিং পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রুনিংয়ের সময় সমন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

প্রুনিং পদ্ধতিসম হ জানার আগে গাছের বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ বিকাশের ওপর প্রুনিংয়ের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা দরকার। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে প্রুনিং বা ছাটাইকৃত গাছ সব সময় অছাটাইকৃত গাছের চেয়ে ছোট থাকে। প্রুনিং এর মাধ্যমে সাধারণত গাছে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য গাছ ছোট থাকে। এ ছাড়া গাছে প্রুনিং এর ফলে মূলের বৃদ্ধিও কমে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রুনিং ফুল, ফল ধারন বৃদ্ধি করে, ফলের আকার, আকৃতি ও মান উন্নত করে এবং সবচাইতে বড় কথা প্রুনিং ফলের মোট ফলন বাড়ায়। যেমন কূল গাছে প্রুনিং করলে গুণাগুণ এবং ফলন উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

প্রুনিংয়ের পদ্ধতিসমূহ

প্রুনিংকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা - অগ্রভাগ ছেদন ও পাতলাকরণ। অগ্রভাগ ছেদনে শীর্ষ প্রকটতা হ্রাস পায় এবং গাছ ঝোপালো হয়।

১। অগ্রভাগ ছেদন (Heading back) ঃ এ পদ্ধতিতে কোনো ডালের কিছু অংশ রেখে অগ্রভাগ কেটে ফেলা হয়। (চিত্র ৩.৩.১ দেখুন)। এর ফলে গাছের শীর্ষ প্রকটতা হ্রাস পায় এবং গাছের পার্শ্বীয় কুড়িসমূহ বৃদ্ধি পেয়ে গাছকে সাধারণত ঝোপালো করে এবং ফল বহনকারী শাখাসমূহ বৃদ্ধি করে। যার দরুন গাছের মোট ফলন বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে কূল গাছে ফল আহরণের পর প্রতি বৎসর অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতিতে প্রুনিং করা হয়।

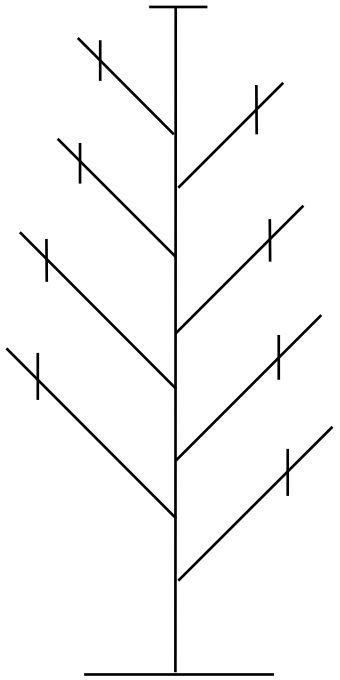

চিত্র ৩.৩.১ঃ অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতিতে প্রুনিং করা গাছ

২। পাতলা করণ (Thinning out) ঃ এ পদ্ধতির প্রুনিং এ গাছের কিছু শাখা-প্রশাখা গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়। (চিত্র ৩.৩.২ দেখুন) এর ফলে বাকী শাখাসমূহের বৃদ্ধি এবং বিকাশ ভালো হয়। এ ছাড়াও অতিরিক্ত ডালপালা সরিয়ে ফেলার দরুন ফলের আকার, আকৃতি ও রং ভালো হয় এবং পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ কম হয়। লেবু, কাগজী লেবু ইত্যাদি ফলগাছ যেগুলো অতিরিক্ত ডাল পালা উৎপন্ন করে সে সব গাছে সাধারণত গাছের অতিরিক্ত পাতা, ডাল, ফুল ও ফল পাতলা করা হয়।

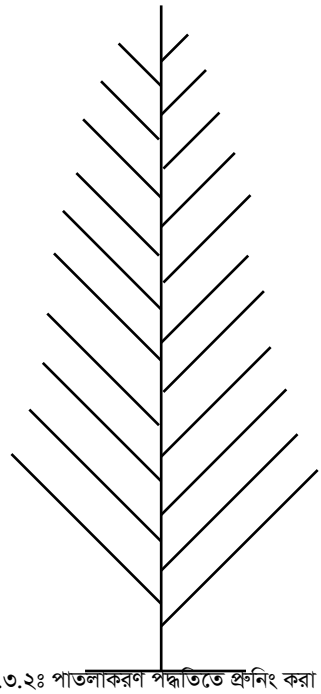

চিত্র ৩.৩.২ঃ পাতলাকরণ পদ্ধতিতে প্রুনিং করা গাছ

প্রুনিংয়ের সময়

পত্র পতনশীল গাছে সুপ্ত অবস্থায় প্রুনিং করা হয়। চিরহরিৎ গাছের বেলায় ফল পাড়ার পর প্রুনিং করা হয়। তবে বিশেষ ধরনের প্রুনিং যেমন- পাতা, ফুল বা ফল ছাটাই, সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে করতে হবে।

ফল গাছে প্র€নিং এর সময় হলো গাছ যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন। এটি সাধারণত পত্র পতনশীল গাছের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু চির হরিৎ গাছের বেলায় ফল সংগ্রহের পর গাছে প্রুনিং করা হয়। তবে বিশেষ ধরনের প্রুনিং যেমন পাতা ছাটাই, ফুল ছাটাই, ফল ছাটাই, বাকল ছাটাই ইত্যাদি সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে করতে হবে। যেমন- পেঁপের ফল পাতলা করার সময় ফল সবজি হিসেবে খাওয়া যায় এ অবস্থায় করতে হবে। অন্য দিকে দুই-তিন বৎসরের কলমের আম গাছের ফুল দেখা মাত্র ছাটাই করতে হবে। কারণ অল্প বয়সের গাছে ফুল-ফল ধরতে দিলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন পোকা-মাকড় এবং রোগব্যাধি দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকবে।

সারমর্মঃ গাছ প্রুনিংয়ের ফলে ছোট থাকে এবং ফুল, ফল ধারণ বৃদ্ধিকরে, ফলের আকার আকৃতি ও মান উন্নত করে এবং মোট ফলন বাড়ায়। গাছকে সাধারণত দুটো পদ্ধতিতে প্রুনিং করা হয়। যথা- অগ্রভাগ ছেদন ও পাতলাকরণ। অগ্রভাগ ছেদনের ফলে গাছ ঝোপালো হয় ও ফল বহনকারী শাখা সমূহ বৃদ্ধি পায়। পাতলাকরণ পদ্ধতির প্রুনিংয়ে ফলের আকার আকৃতি ও রং ভালো হয়। পত্র পতনশীল গাছের বেলায় সাধারণত সুপ্তাবস্থায় এবং চির হরিৎ গাছের বেলায় ফল পাড়ার পর গাছে ট্রেনিং করা হয়। এ ছাড়াও বিশেষ ধরনের প্রুনিং যেমন পাতা ছাটাই, ফুল ও ফল ছাটাই, বাকল ছাটাই ইত্যাদি সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ছাটাইকৃত গাছ ও অছাটাইকৃত গাছের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) প্রুনিং বা ছাটাইকৃত গাছ অছাটাইকৃত গাছ অপেক্ষা ছোট থাকে।
- (খ) ছাটাইকৃত গাছ অছাটাইকৃত গাছ অপেক্ষা বড় থাকে।
- (গ) ছাটাইকৃত গাছ অপেক্ষাকৃত বেশি লম্বা হয়।
- (ঘ) উপরের কোনোটি সঠিক নয়।

২। প্রুনিং এর ফলে ফলের আকার, আকৃতি ও মানের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) প্রুনিং ফলের আকার, আকৃতি ও মান কমায়।
- (খ) প্রুনিং ফলের আকার, আকৃতি ও মান বৃদ্ধি করে।
- (গ) প্রুনিং ফলের আকার, আকৃতি ও মান বৃদ্ধিতে কোনো ভূমিকা রাখেনা।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

৩। অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতির প্রুনিং এ গাছে কী ঘটে?
- (ক) অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতির প্রুনিংয়ে গাছ ঝোপালো হয়।
- (খ) অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতির প্রুনিংয়ে গাছের ডালপালা পাতলা করা হয়।
- (গ) অগ্রভাগ ছেদন প্রুনিংয়ে গাছের বৃদ্ধির কোনো পরিবর্তন হয় না।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

৪। পাতলাকরণ পদ্ধতির প্রুনিংয়ের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) পাতলাকরণ পদ্ধতির প্রুনিংয়ে অতিরিক্ত ডালপালা সরিয়ে ফেলার দরুন ফলের আকার, আকৃতি ও মান খারাপ হয়।
- (খ) পাতলাকরণ পদ্ধতির প্রুনিংয়ে ফলের আকার, আকৃতি ও মান ভালো হয়।
- (গ) পাতলাকরণ পদ্ধতির প্রুনিং ফলের আকার, আকৃতি ও মান নিয়ন্ত্রনে কোনো ভূমিকা রাখেনা।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

ব্যবহারিক

পাঠ ৩.৪ ফল গাছে বিভিন্ন ট্রেনিং ও প্রুনিং পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ট্রেনিং ও প্রুনিং এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- ফল গাছে ট্রেনিং পদ্ধতিসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।
- ফল গাছে প্রুনিং পদ্ধতিসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।
- ফল গাছের ট্রেনিং পরবর্তী কাজসমূহ করতে পারবেন।

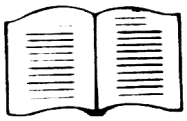

ফল গাছ থেকে সঠিক ফলন ও মান সম্মত ফল পেতে হলে গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় ট্রেনিং এবং গাছ ফল ধারণের স্তরে পৌছানোর পর প্রুনিং করা প্রয়োজন। ট্রেনিং ও প্রুনিং করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কারণ যথাযথ অভিজ্ঞতা না থাকলে অতিরিক্ত ট্রেনিং ও প্রুনিং করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভবনাই বেশি।

এ পাঠে আমরা গাছে কীভাবে ট্রেনিং ও প্রুনিং করা হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ট্রেনিং ও প্রুনিং করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক) ট্রেনিংয়ের জন্য গাছের চারা
খ) প্রুনিংয়ের জন্য ফলবতী গাছ
গ) প্রুনিং ছুরি (Pruning knife)
ঘ) প্রুনিং কাঁচি (Pruning shears)
ঙ) সিকেটিয়ার (Secateur)
চ) প্রুনিং করাত
ছ) বড় গাছের ডাল কাটা কাঁচি (Tree pruner)
জ) ডাল কাটার দা (Billhook)
ঝ) বর্দো পেষ্ট (Bordeux paste)
ঞ) গরম মোম (Hot wax)

ট্রেনিং পদ্ধতি ঃ ফল গাছে সাধারণত তিন পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা হয়। এগুলো হলো–
(১) উচ্চ কেন্দ্র
(২) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ও
(৩) মুক্ত কেন্দ্র।

১) উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে ট্রেনিংয়ে কাজের ধাপ

প্রথমে নার্সারিতে ১ বৎসরের একটি চারা নির্বাচন করুন। চারাটির উচ্চতা ১ মিটারের মত হলে ভালো হয়। এরপর ছবিতে প্রদর্শিত নিয়ম মোতাবেক এর পার্শ্বীয় শাখাগুলো কাটুন (চিত্র-৩.২.১ দেখুন)। পার্শ্বীয় শাখা কাটার সময় কাটাটি মাটির সাথে যেন খাড়া হয়। কাটাটি মাটির সাথে খাড়া হওয়ার দরুন পানি জমতে পারবে না অথবা অতিরিক্ত সূর্যের তাপে কাটা জায়গা থেকে অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যেতে পারবে না। এছাড়া কাটাটি গাছ প্রধান কান্ড থেকে কম পক্ষে ২.৫০ সেমি. দূরে কাটতে হবে। কাটার নিচে কোনো পর্ব সন্ধি থাকবে না। কারণ কাটার নিচে পর্ব সন্ধি থাকলে মুকুল প্রস্ফুটিত হয়ে নতুন শাখা প্রশাখার জন্ম দিবে। যার দরুন উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিংয়ের

উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। পার্শ্বীয় শাখা চিকন হলে প্রুনিং চাকু এবং মোটা হলে সিকেটিয়ার অথবা প্রুনিং কাঁচি ব্যবহার করতে হবে। পার্শ্বীয় শাখা কাটার সাথে সাথে সেখানে বর্দো পেষ্ট লাগিয়ে দিতে হবে যেন কাটা জায়গাটি রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। এ ভাবে গাছের প্রজাতি অনুযায়ী ২-৩ বৎসর পর্যন্ত চারাটির পার্শ্বীয় শাখা কেটে দিতে হবে যেন একটি সুন্দর ও সুষ্ঠ প্রধান কান্ড বেড়ে উঠতে পারে।

২) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ঃ এ পদ্ধতির ট্রেনিংয়ের জন্য নার্সারিতে ১-২ বছরের একটি গাছের চারা নির্বাচন করুন। চারাটি ১ মিটার উচু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর পার্শ্বীয় শাখা উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিংয়ের মত ছাটাই করুন। এরপর চারাটির ৫-৬ টি পার্শ্বীয় শাখা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাড়তে দিন। এরপর চারাটি ১.৫ মিটার থেকে ২.০ মিটার হওয়ার পর এর প্রধান কান্ডটির শীর্ষ কুড়িটি কেটে ফেলুন (চিত্র- ৩.২.২ দেখুন) এবং পার্শ্বীয় শাখাগুলো সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাড়তে দিন। এ পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা গাছ খুব উচু হবেনা। কিন্তু এর একটি সুগঠিত গুড়ি ও ৫-৬ টি সুষ্ঠ ও সবল পার্শ্বীয় শাখা থাকবে।

৩) মুক্ত কেন্দ্র ঃ এ পদ্ধতির ট্রেনিংয়ের জন্য নার্সারিতে ১ বছরের চারা নির্বাচন করুন। চারাটি ০.৫-১.০ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন হতে হবে। চারাটির শীর্ষকুড়ি প্রুনিং ছুরি অথবা সিকেটিয়ার দ্বারা কেটে দিন এবং এর পার্শ্বীয় শাখাগুলো বাড়তে দিন (চিত্র- ৩.২.৩ দেখুন)। গাছটি বেশি ঝোপালো করতে চাইলে পার্শ্বীয় শাখাগুলো কিছু দিন বাড়তে দেয়ার পর সেগুলোর মাথা কেটে দিন। এভাবে গাছটি মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতিতে ২-৩ বৎসর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন প্রতিবার কাটার পর ডালের কাটা জায়গায় বর্দো পেষ্ট লাগাতে হবে। নচেৎ কাটা অংশটি রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চারাটি মারা যেতে পারে।

প্রুনিং পদ্ধতি ঃ ফল গাছে সাধারণত দুটো পদ্ধতিতে প্রুনিং করা হয়। এগুলো হলো–
(১) অগ্রভাগ ছেদন ও
(২) পাতলাকরণ।

(১) অগ্রভাগ ছেদন ঃ এ পদ্ধতিতে প্রুনিং পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য ৫-৬ বছর বয়সের কূল গাছ নির্বাচন করুন। ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাড়ার পর প্রধান শাখাগুলো দৈর্ঘ্যের ২৫ ভাগ রেখে বাকী অংশ প্রুনিং দা অথবা প্রুনিং করাতের সাহায্যে কেটে ফেলুন (চিত্র- ৩.৩.১ দেখুন)। ডালগুলো কাটার পর কাটা অংশে বর্দো পেষ্ট অথবা গরম মোম লাগিয়ে দিন। ডালগুলো প্রুনিংয়ের বা কাটার সময় কাটা অংশটি মাটির সাথে খাড়া হবে। এভাবে প্রতি বছর ফল পাড়ার পর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কূল গাছে অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতিতে প্রুনিং করুন।

(২) পাতলাকরণ ঃ এ পদ্ধতিতে প্রুনিং অনুশীলনের জন্য ৪-৫ বছরের একটি লেবু গাছ নির্বাচন করুন। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণের পর গাছে প্রুনিং করুন। যে ডালগুলো ছাটাই করবেন সেগুলো নির্বাচন করুন। এরপর চিত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী ডালগুলো প্রধান শাখার কাছাকাছি থেকে প্রুনিং দা অথবা প্রুনিং কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলুন (চিত্র- ৩.৩.২ দেখুন)। এরপর কাটা অংশে বর্দো পেষ্ট অথবা গরম মোম লাগিয়ে দিন। এভাবে অন্য যেকোন গাছে পাতলাকরণ পদ্ধতিতে ছাটাই বা প্রুনিং অনুশীলন করুন।

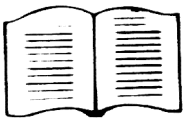

সারমর্ম ঃ ফল গাছে ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার। এগুলোর মধ্যে প্রুনিং ছুরি, প্রুনিং কাঁচি, সিকেটিয়ার, প্রুনিং করাত ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়াও ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের জন্য নার্সারি ও বাগানে যথাক্রমে চারা ও ফলবতী গাছ দরকার। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে গাছকে সঠিক ও সবল কাঠামো দেয়া হয়। পক্ষান্তরে প্রুনিং গাছের ফুল, ফল ধারণ, ফলন ও মান প্রভাবিত করে। অভিজ্ঞতার আলোকে ফল গাছে সঠিক সময়ে পরিমিত ট্রেনিং ও প্রুনিং করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। প্রুনিংয়ের জন্য কোন্‌টি প্রয়োজন?
- (ক) আচড়া
- (খ) প্রুনিং কাঁচি
- (গ) কোদাল
- (ঘ) লাঙ্গঁল

২। কোন্‌টি প্রুনিংয়ের পদ্ধতি?
- (ক) নাতি উচ্চ কেন্দ্র
- (খ) মুক্ত কেন্দ্র
- (গ) অগ্রভাগ ছেদন
- (ঘ) উচ্চ কেন্দ্র

৩। প্রুনিংয়ের সময়ে ঢাল কাটতে হবে কীভাবে?
- (ক) মাটির সমান্তরালে
- (খ) ৪৫$^{\circ}$ কোণে
- (গ) মাটির সাথে খাড়াভাবে
- (ঘ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়

৪। ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের পর গাছের কাটা স্থানে ব্যবহার করা হয় কোন্‌টি?
- (ক) পানি
- (খ) চুন
- (গ) বার্গান্ডি মিকশ্চার
- (ঘ) বর্দো পেষ্ট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। ট্রেনিং কী ও প্রুনিং কী? ফল গাছে ট্রেনিং ও প্র€নিংয়ের পার্থক্যসম হ লিখুন।
২। ফল গাছে ট্রেনিং ও প্রুনিংয়ের উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।
৩। ফল গাছে ট্রেনিংয়ের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন।
৪। ফল গাছে প্রুনিং পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন।
৫। ফল গাছে প্রুনিংয়ের সময় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১
১। ক ২। ক ৩। খ ৪। ক

পাঠ ৩.২
১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ ৩.৩
১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠ ৩.৪
১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

ইউনিট ৪
ফল গাছ চাষের মৌল বিষয়াবলী

ইউনিট ৪ ফল গাছ চাষের মৌল বিষয়াবলী

অধিকাংশ ফল দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হিসেবে বিবেচিত। এ জন্য কোনো স্থানে ফল বাগান স্থাপন করতে হলে সেই জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু ও মাটি সম্বন্ধে অবশ্যই ফল চাষীর সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এ ছাড়াও ফল বাগান স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুব প্রয়োজন। কারণ স্বল্প মেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে কোনো ভুলত্রুটি হলে তা পরবর্তী সময়ে সহজে সংশোধন করা যায়। কিন্তু বৃক্ষ জাতীয় ফল বাগান প্রতিষ্ঠার সময় কোনো ভূলত্রুটি থাকলে তা পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ থাকে না। এ জন্য বৃক্ষ জাতীয় ফল চাষের জন্য বাগান বিন্যাস, গাছ নির্বাচন, বাজারজাতকরণ, সেচ, পানি নিষ্কাশণ, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শ্রমিক সরবরাহ, সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক বাগান ব্যবস্থাপনা, ফলের জাত, গাছের আকার আকৃতি ও বৃদ্ধির স্বভাব ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াবলী সম্মন্ধে একজন আধুনিক ফলচাষীর অবশ্যই তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ফল চাষের জন্য জায়গা নির্বাচন, জলবায়ু, মাটি, বাগান পরিকল্পনা, জমি নির্বাচন ও তৈরি, গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ, চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ ফল চাষের সাথে জলবায়ুর সর্ম্পক

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জলবায়ু কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জলবায়ুর নিয়ামকগুলো লিখতে ও বলতে পারবেন।
- জলবায়ুর সাথে ফল চাষের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

জলবায়ু

কোন স্থানের আবহাওয়ার কয়েক বছরের গড়কে ঐ স্থানের জলবায়ু বলে। জলবায়ু অনুসারে ফলসম হকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফল, অবগ্রীস্ম মন্ডলীয় ফল নাতি-শীতোষ্ণ মন্ডলীয় ফল ও মধ্য সাগরীয় অঞ্চলীয় ফল।

কোনো স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতিবেগ, আর্দ্রতা, শিলাবৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদির দৈনিক পরিবর্তনকে ওই স্থানের আবহাওয়া বলা হয় এবং কোনো স্থানের আবহাওয়ার কয়েক বছরের গড়কে সে স্থানের জলবায়ু বলা হয়। কোনো স্থানের জলবায়ুর সাথে ওই স্থানের ফল চাষের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে ফলসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফল (Tropical fruits)
(২) অবগ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফল (Sub- tropical fruits),
(৩) শীত প্রধান অঞ্চলের ফল (Temperate fruits) এবং
(৪) ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলীয় ফল (Mediterranean fruit)।

(১) গ্রীষ্ম মন্ডলীয় ফল ঃ বিষুব রেখা হতে ২৩°২৭' উত্তর ও ২৩°২৭' দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকায় সাধারণত যেসব ফল উৎপন্ন হয় সেগুলোকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল বলে। যেমন- আম, কলা, পেঁপে, আনারস, নারিকেল, কামরাঙা, কাঁঠাল ইত্যাদি। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং দিনের দৈর্ঘ্য ১১ থেকে ১৩ ঘন্টার মধ্যে সীমিত থাকে। বাংলাদেশে বেশির ভাগ গ্রীষ্মমন্ডীয় ফল উৎপন্ন হয়।

(২) অবগ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চল ঃ ২৩°২৭' ও ৪০° উত্তর ও দক্ষিন অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলে একটি সুনির্দিষ্ট শীতকাল বর্তমান। কিন্তু শীত বেশি তীব্র নয় এবং তাপমাত্রা সাধারণত হিমাংকের নিচে নামে না। কমলা, লেবু, লিচু, কূল, ডুমুর, খেজুর, ডালিম, নাশপাতি, আঙুর ইত্যাদি অবগ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল।

(৩) শীত প্রধান অঞ্চলের ফলঃ ৪০° থেকে ৬০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলই শীত প্রধান অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলে শীতকালে প্রচন্ড শীত পড়ে এবং তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে চলে যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া গরম থাকে। শীত প্রধান অঞ্চলীয় ফলের ফুল ও ফল ধারণের জন্য গাছকে অবশ্যই কিছু দিনের জন্য হিমাংকের নিচের তাপমাত্রায় রাখতে হয়। আপেল, নাশপাতি, পীচ, প্লাম ইত্যাদি শীত প্রধান অঞ্চলের ফল।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ফল উৎপাদনের জন্য খুব বিখ্যাত।

(৪) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফলঃ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য অনেকটা অবগ্রীষ্ম মন্ডলীয় জলবায়ুর মত। তবে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট হলো শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং বৃষ্টিবহুল শীতকাল। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত রাত্রিকালীন কুয়াশা কিছু আর্দ্রতা প্রদান করে। খেজুর, ডালিম, কমলা, জলপাই, আঙ্গুর, ডুমুর এ জলবায়ুতে খুব ভালো জন্মে।

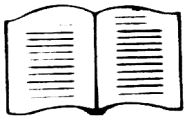

সারমর্ম ঃ কোনো স্থানে ফল উৎপাদনের জন্য ঐ স্থানের জলবায়ু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। জলবায়ুর চাহিদা অনুযায়ী ফলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল, অবগ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল, শীত প্রধান অঞ্চলের ফল এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলীয় ফল। আম, কলা, পেঁপে, আনারস, নারিকেল, কামরাঙা কাঠাল ইত্যাদি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল। কমলা, লেবুজাতীয় ফল, লিচু কূল, ডুমুর, খেজুর, ডালিম, নাসপাতি, আঙুর ইত্যাদি অবগ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল। আপেল, নাশপাতি, পীচ, প্লাম ইত্যাদি শীত প্রধান অঞ্চলের ফল। এ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ফল চাষের জন্য বিখ্যাত। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে খেজুর, ডালিম, কমলা, আঙুর, জলপাই, নাশপাতি, এবং লেবু জাতীয় ফল ভালো জন্মে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোনো স্থানের জলবায়ুর সাথে ঐ স্থানের ফল চাষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) কোনো স্থানের জলবায়ুর সাথে ঐ স্থানের ফল চাষের কোনো সম্পর্ক নাই।
- (খ) কোনো স্থানের জলবায়ুর সাথে ঐ স্থানের ফল চাষের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।
- (গ) কোনো স্থানের জলবায়ুর সাথে ঐ স্থানের ফল চাষের তেমন সম্পর্ক নাই।
- (ঘ) ওপরের কোনটিই সঠিক নয়।

২। জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর ফলসম হকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
- (ক) সাত ভাগে
- (খ) চার ভাগে
- (গ) দুই ভাগে
- (ঘ) পাঁচ ভাগে

৩। আম, পেঁপে ও কলা কোন্‌ অঞ্চলের ফল?
- (ক) ভূমধ্যসাগরীয় ফল
- (খ) অবগ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল
- (গ) শীত প্রধান অঞ্চলের ফল
- (ঘ) গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল

৪। কোন্‌টি জলবায়ুর নিয়ামক নয়?
- (ক) অক্ষাংশ
- (খ) বায়ুবেগ
- (গ) দ্রাঘিমাংশ
- (ঘ) বৃষ্টিপাত

পাঠ ৪.২ ফল চাষের সাথে মাটির সম্পর্ক

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন প্রকার মাটির সাথে ফল চাষের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন্ ফল কোন্ মাটিতে ভালো জন্মায় তা বলতে পারবেন।
- মাটির বৈশিষ্ট্যের সাথে কোনো ফলের গুণাগুণ কীভাবে নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

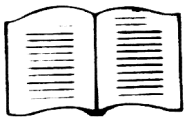

মাটির সাথে ফল চাষের সম্পর্ক

ফল চাষের জন্য মাটি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যে কোনো দুটি জায়গার একই রকম জলবায়ুতে ফল চাষের জন্য মাটি deciding factor হিসেবে কাজ করে। সাধারণত অস্থায়ী কৃষিজ ফসলের জন্য যোগ্য মাটি ফল চাষের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। ফলগাছ বহুবর্ষজীবী হওয়ায় উপরিভাগের মাটির (Surface soil) সাথে সাথে নিচের মাটিও (Sub-soil) ভালো দরকার। ফল চাষের জন্য মাটির রাসায়নিক গঠনের চেয়ে ভৌত গুণাবলী বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ফলচাষে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর গুরুত্ব

ভৌত গুণাবলী

মাটির ভৌত গুণাবলী যেমন- ছিদ্রতা, বাতাস প্রবাহতা এবং গভীরতা ফল চাষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছ চাষের ক্ষেত্রে মাটির গভীরতা ২ মিটার হওয়া উচিত। মাটির পানিতল দুই মিটার নিচে থাকতে হবে।

মাটির ছিদ্রতা (Porosity), বায়ু চলাচল (Aeration) এবং গভীরতা ফল চাষের জন্য প্রধান ভৌত বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ জাতীয় ফল চাষের জন্য ২ মিটার গভীর, সুষম বুনট সম্পন্ন সুনিষ্কাষিত মাটি সব চেয়ে ভালো। বেশির ভাগ বৃক্ষ জাতীয় ফলের শোষক শিকড় (feeding roots) ২ মিটার বা তার চেয়ে বেশি গভীরতায় প্রবেশ করে। মাটির বুনট সুষম না হলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, খাদ্য উপাদান সরবরাহ এবং মাটির ছিদ্রতার পরিবর্তন হয়। এ জন্য গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাটির বুনটের পরিবর্তনের সাথে নিষ্কাষণেরও পরিবর্তন ঘটে। মাটির পানির তল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত বৈশিষ্ট্য যা ফল চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চ পানি তল বিশেষ করে দুই মিটারের উপরের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী পানিতল এমন কী ক্ষনস্থায়ী উচ্চ পানিতল ফল চাষের জন্য ক্ষতিকর। উচ্চ পানি তল মাটিতে বাতাস প্রবাহ ব্যাহত করে যার ফলে অনেক গাছে শিকড়ের শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে শিকড় পচে যায়। যেমন কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস প্রভৃতি ফল গাছ উচ্চ পানি তল বিশিষ্ট মাটিতে জন্মাতে পারে না। মাটির বুনট নির্ভর করে বিভিন্ন আকারের কণার ওপর। অধিকাংশ ফল যে কোনো ধরনের বুনটের মাটিতে অর্থাৎ এঁটেল, বেলে, দোঁয়াশ ও কাকরযুক্ত মাটিতে চাষ করা যায়। তবে হালকা ধরনের মাটি অর্থাৎ বেলে দোয়াঁশ এবং দোঁয়াশ মাটি ফল চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। হালকা বুনটের মাটিতে আনারস ও পেঁপের চাষ করলে ফলের আকার ছোট হয়। কিন্তু ফলের গুণাগুণ যেমন মিষ্টতা বাড়ে। অন্য দিকে ভারী মাটিতে এ ফলগুলোর চাষ করলে ফলের আকার বড় হয়। কিন্তু ফলের মিষ্টতা কমে।

হালকা ধরনের মাটি যেমন বেলে দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটি ফল চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। অন্যদিকে ভারী মাটি যেমন কাদা দোঁয়াশ বা কাদা মাটিতে কাজ করা কঠিন এবং পানি নিষ্কাশনের খরচ বেশি বিধায় ভারী মাটিতে ফল চাষ না করাই উচিত।

বাগান স্থাপনের আগে দুই মিটার গভীর পর্যন্ত মাটির প্রোফাইল নির্ণয় করা ভালো। কারন মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ যত সহজে পরিবর্তন করা যায় তত সহজে ভৌত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় না। বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্ন মাটির তাপমাত্রা প্রয়োজন। এ জন্য যে কোনো ফল চাষের জন্য এর শিকড়ের বৃদ্ধির জন্য মাটির অনুকূল তাপমাত্রা জানা থাকা ভালো।

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে মাটির পি,এইচ ও লবণাক্ততা ফলচাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফল চাষের জন্য সব চেয়ে ভালো পি, এইচ (pH) হলো ৫.৫-৮.০। গাছের কয়েকটি খাদ্য উপাদানের শোষণ-যোগ্য অবস্থা মাটির পি.এইচ এর ওপর নির্ভরশীল। মাটি অতিরিক্ত অম্লীয় ধরনের হলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বেশি দ্রবণীয় হয়। যার দরুন সেগুলো গাছের জন্য বিষাক্ত হয়ে পড়ে। অন্য দিকে অতিরিক্ত ক্ষারীয় মাটিতে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কপার ও

ফল চাষের জন্য মাটির পি. এইচ ৫.৫-৮.০ এর মধ্যে থাকা ভালো। মাটি বেশি ক্লীয় হলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ মাটিতে অতিরিক্ত দ্রবণীয় হয়ে তা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কোবাল্ট মাটিতে কম দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বিধায় সেগুলো গাছ শোষণ করতে পারে না। অতিরিক্ত ক্লীয় মাটিতে আনারসের লৌহ কমতি লক্ষণ দেখা যায়। এ অবস্থায় মাটিতে চুন প্রয়োগ করে অথবা গাছে $FeSO_4$ এর ০.১% দ্রবণ ছিটিয়ে লৌহের ঘাটতি কমানো যায়। সাধারণত মাটি অতিরিক্ত ক্ল হলে চুন প্রয়োগ করে এবং অতিরিক্ত ক্ষারীয় হলে সালফার জাতীয় সার প্রয়োগে আকাংখিত পি.এইচ মান স্থিতিশীল করা যায়। নারিকেল বাদে সকল ফল অতিরিক্ত লবণাক্ততা পছন্দ করে না। ফল বাগান স্থাপন করার আগে ফল বাগানের মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে নেয়া ভালো।

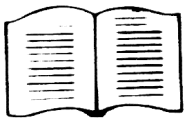

সারমর্ম ঃ ফল চাষের জন্য কোনো স্থানের মাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফল চাষের জন্য উপরিভাগ ও নিচের মাটি উভয়েই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফল চাষের জন্য মাটির ভৌত গুণাবলী যেমন মাটির

রন্ধ্রতা, বায় চলাচল ও মাটির গভীরতা প্রধান। মাটির পানিতল কম পক্ষে ২ মিটারের নিচে হওয়া উচিত। এ ছাড়াও মাটির বুনট ফল চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বেলে দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটি ফল চাষের জন্য উত্তম। ভৌত গুণাবলীর সাথে সাথে মাটির রাসায়নিক গুণাবলী যেমন মাটির পি.এইচ ফল চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফল চাষের জন্য মাটির পি.এইচ ৫.৫-৮.০ এর মধ্যে থাকা ভালো। কম ও বেশি পি.এইচ উভয়েই ফল চাষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। ফল চাষের আগে ফল বাগানের মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী পরীক্ষা করে নেয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। উচ্চ পানিতল ফল চাষের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) খুব উপকারী
- (খ) খুব ক্ষতিকর
- (গ) তত ক্ষতিকর নয়
- (ঘ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়

২। ফল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাটি কোন্‌টি?
- (ক) বেলে দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটি
- (খ) কাদা মাটি
- (গ) বেলে মাটি
- (ঘ) কাদা দোঁয়াশ মাটি

৩। ফল চাষের জন্য উপযোগী ক্ল-ক্ষারত্ব সঠিক মাত্রা কোন্‌টি?
- (ক) ৩ - ৪
- (খ) ১০ - ১২
- (গ) ৫.৫ - ৮.০
- (ঘ) ৩ এর নিচে

পাঠ ৪.৩ বাগানের পরিকল্পনা ও নকশা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাগানের পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল বাগানের বিভিন্ন নকশা সম্বন্ধে লিখতে ও বলতে পারবেন।

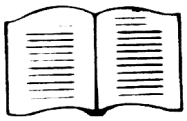

ফল বাগান স্থাপনের আগে বাগান-পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী। কারন স্বল্প স্থায়ী ফসলের বাগান স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হলে তা সারিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী ফলের বাগান স্থাপনের কয়েক বৎসর পর কোনো ভুল ধরা পড়লে তা আর সংশোধনের উপায় থাকে না।

ফল বাগান প্রতিষ্ঠার জন্য জমি, মাটি, জলবায়ু ফল চাষের জন্য উপযোগী হতে হবে। বাগান পরিকল্পনায় খেয়াল রাখতে হবে যেন ফল চাষ করে চাষী লাভবান হতে পারেন।

ফল বাগান স্থাপনকল্পে পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে

১। যে স্থানে বাগান স্থাপন করা হবে সেই স্থানের জমি, মাটি ও জলবায় অবশ্যই পরিকল্পিত ফল চাষের জন্য উৎকৃষ্ট হতে হবে।

২। পতিত জমিতে বাগান স্থাপন করার সময় সেখানকার অপ্রয়োজনীয় গাছ-পালা পরিস্কার করতে হবে। জমি যদি পাহাড়ী ধরনের হয় তাহলে বিভিন্ন উচ্চতায় জমি কেটে বা পাহাড় কেটে সমতল করে নিতে হবে। একে টেরেসিং বলা হয়। সাধারণত জমির ঢাল ১০% এর বেশি হলে টেরেসিং প্রয়োজন হয়।

৩। বাগানের অফিস, রাস্তা-ঘাট, নালা-নর্দমা ইত্যাদি স্থায়ী- স্থাপনা তৈরি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এগুলোর জন্য যতদ র সম্ভব কম জমি ব্যবহার করা হয় এবং তা যেন কোনোক্রমেই বাগানের জমির ১০% এর বেশি না হয়।

৪। বাগানের প্রধান অফিস এবং ফল বা অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র যথা স্থানে হতে হবে।

ফল বাগান পরিকল্পনায় সেচ, ফল সংগ্রহের সময়, ক্ষতিকর প্রাণী, লাভজনক ফল, পর-পরাগায়িত ফল, বায়ু নিরোধক গাছ, নালা-নর্দমা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

৫। খাটো জাতের ফল গাছসমূহ বাগানের সামনে এবং লম্বা জাতের গাছসমূহ বাগানের পিছনের দিকে লাগাতে হবে।

৬। যে সব গাছে নিয়মিত পানি সেচের দরকার হয় সেই সব গাছ পানির উৎসের কাছাকাছি লাগাতে হবে এবং যে সব গাছে নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয় না তা পানির উৎস থেকে দূরে লাগাতে হবে।

৭। যে সব গাছে এক সংগে ফল ধরে ও ফল পাকে বাগানে সে সব গাছ পাশাপাশি জমিতে লাগাতে হবে।

৮। ফল চাষের জন্য উপযুক্ত দূরত্ব অবশ্যই অভিজ্ঞতার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে যেন নির্দিষ্ট জমিতে পারত পক্ষে বেশি পরিমাণ গাছ লাগানো যায়।

৯। ফল বাগানের চার পাশে বেড়া এবং বায়ু নিরোধক (Windbreaks) গাছ লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এসব গাছ ফল গাছের সাথে পানি, আলো বা খাদ্য উপাদানের জন্য প্রতিযোগিতায় না আসে।

১০। ফল বাগানের জন্য সব চাইতে উত্তম ফলের জাত, বীজ, কলম বা চারা সংগ্রহ করতে হবে।

বাগানে গাছ লাগানোর নকশা

বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে ফল বাগান স্থাপন করতে হলে বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা তৈরি করা অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফল বাগানের নকশা বা পরিকল্পনা করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো হলো–

১। আয়তাকার পদ্ধতি (Rectangular system),

২। বর্গাকার পদ্ধতি (Square system)

৩। ত্রিভূজাকার পদ্ধতি (Triangular system)

৪। ষড়ভূজী পদ্ধতি (Hexagonal system)

৫। কর্ণ বা কুইনকাংশ পদ্ধতি (Quincunx system) এবং

৬। সমঢাল এবং সিড়িবাধ পদ্ধতি (Contour and terrace system)

আয়তাকার পদ্ধতি (Rectangular system)

এ পদ্ধতিতে মাঠে এক দিক থেকে আন্ত পরিচর্যা করা হয়। ফলের চেয়ে সবজি চাষে এ পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করা হয়।

এ পদ্ধতিতে লাগানো দুই সারির চারটি গাছ একটি আয়তাকার তৈরি করে। সাধারণত এ পদ্ধতিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব গাছ থেকে গাছের দূরত্বের চেয়ে বেশি থাকে। ফলে দুই সারির মাঝের জায়গায় বিভিন্ন আন্ত পরিচর্যা যেমন চাষ, পানি সেচ ইত্যাদি কাজ সহজে করা যায়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ফলের চেয়ে সবজি জাতীয় ফসলের চাষ বেশি করা হয়।

বর্গাকার পদ্ধতি (Square system)

এ পদ্ধতিতে মাঠে দুই দিক থেকে আন্ত পরিচর্যা করা যায় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ বলে আমাদের চাষীরা ফল চাষে বেশি ব্যবহার করে থাকেন।

এ পদ্ধতিতে দুই সারির চারটি গাছ একটি বর্গের সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতিতে লাগানো গাছ থেকে গাছের দূরত্ব সারি থেকে সারির দূরত্বের সমান হয়। যার দরুন যে কোনো দুই দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের আন্ত পরিচর্যা করা যায়। এ পদ্ধতিতে আমাদের দেশে সাধারণত আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে প্রভৃতি চাষ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি তূলনাম লক ভাবে সহজ এবং মাঠে নকশা প্রণয়নের কাজ খুব সহজেই করা যায়। এ জন্য বর্গাকার পদ্ধতি আমাদের দেশের চাষীরা ফল চাষে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। আয়তাকার ও বর্গাকার পদ্ধতিতে মাঠে গাছ নিরূপণের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

মাঠে মোট গাছের সংখ্যা = প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা

কুইনকাংশ পদ্ধতি (Quincunx system)

কুইনকাংশ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গের মাঝখানে একটি ফিলার বা পূরক গাছ লাগানো হয় যা থেকে আগাম আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়।

এ পদ্ধতিটি বর্গাকার পদ্ধতির একটি রূপান্তর মাত্র। এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ মেয়াদী ফল যেমন আম, জাম, কাঁঠাল বর্গাকার পদ্ধতিতে লাগানো হয় এবং প্রতি বর্গের মাঝখানে একটি স্বল্প মেয়াদী ফলের গাছ লাগানো হয়। স্বল্প মেয়াদী ফল গাছটিকে পূরক গাছ বা Filler plant বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বর্গাকার প্রণালীতে লাগানো দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের বাগান থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের বেলায় লেবু, ডালিম পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছকে পূরক বা ফিলার গাছ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পূরক বা ফিলার গাছসসমূহ যখন মূল গাছের সাথে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তখন পূরক বা ফিলার গাছ কেটে ফেলা হয়। কোনো মাঠে নিম্নবর্ণিত ফরমুলা অনুযায়ী পূরক বা ফিলার গাছ নিরূপণ করা হয় ঃ

ফিলার গাছ = (সারিতে মূল গাছের সংখ্যা-১) × (সারির সংখ্যা-১)

তিন দিক থেকে এ পদ্ধতিতে আন্ত পরিচর্যা করা যায়। তবে গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান রাখলেও মাঠে বর্গাকার পদ্ধতির চেয়ে কম গাছ লাগানো যায়। এ জন্য পদ্ধতিটি খুব কম ব্যবহৃত হয়।

ত্রিভূজাকার পদ্ধতি (Triangular system)

এ পদ্ধতিতে প্রথম সারিতে বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছ লাগানো হয় এবং প্রতি একান্তর বা জোড় সারিতে প্রথম সারির দুই গাছের মাঝখানে একটি গাছ লাগানো হয়। এ পদ্ধতিতে লাগানো দুই সারির তিনটি গাছ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের সৃষ্টি করে। ত্রিভূজাকার পদ্ধতিতে প্রতি একান্তর সারিতে একটি

করে গাছ কম লাগানো যায়। একান্তর সারিতে একটি করে গাছ কম লাগানোর জন্য বর্গাকার পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতিতে মাঠে গাছের সংকুলান কম হয়। এ পদ্ধতিতে অবশ্য তিন দিক থেকে আন্ত পরিচর্যা করা যায় এবং তিন দিক থেকে গাছগুলোকে একই সারিতে দেখা যায় বিধায় বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে মাঠে গাছের সংখ্যা নিরূপণের ফর্মুলা নিম্নরূপ ঃ

গাছের সংখ্যা = (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা)-একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

ষড়ভ জী পদ্ধতি (Hexagonal system)

ফল বাগানে ষড়ভূজী পদ্ধতিতে গাছ লাগালে বর্গাকার পদ্ধতির চেয়েও শতকরা ১৫ ভাগ গাছ বেশি লাগানো যায় এবং বাগানে তিন দিক থেকে আন্ত পরিচর্যা করা যায় এবং যে কোনো দিক থেকে তাকালে গাছসম হকে একই সারিতে দেখা যায়। এ জন্য ফল বাগানে এ পদ্ধতি বিশেষভাবে লাভজনক।

ষড়ভূজী পদ্ধতি ত্রিভূজাকার পদ্ধতির একটি বিশেষ রূপমাত্র। এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ একটি ষড়ভূজের সৃষ্টি করে এবং ষড়ভূজের কেন্দ্রে একটি গাছ থাকে। অপর দিকে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ একটি সমবাহু ত্রিভূজের সৃষ্টি করে। এ জন্য ইহাকে সমবাহু ত্রিভূজাকার পদ্ধতিও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে এক গাছের দূরত্ব অপর গাছ থেকে সব দিক থেকে সমান থাকে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব গাছ থেকে গাছের দূরত্বের কম হয় বিধায় বর্গাকার পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতিতে আনুমানিক ১৫% গাছ বেশি লাগানো যায়। সাথে সাথে এক গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সব দিক থেকে সমান থাকে বলে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদি সমানভাবে বন্টিত হয়। এ পদ্ধতিতেও তিন দিক থেকে বাগানে আন্ত পরিচর্যা করা যায় এবং তিন দিক থেকে গাছগুলোকে একই সারিতে দেখা যায় বলে বাগান সুন্দর দেখায়। এ পদ্ধতিতে বাগানে গাছ নিরূপনের ফর্মূলা ত্রিভূজাকার প্রণালির মত।

সমঢাল ও সিড়ি বাধ পদ্ধতি (Contour and terracing system)

কোন জমির ঢাল ৩% এর বেশি এবং ১০% এর কম হলে ঢাল পদ্ধতি এবং ১০% বেশি হলে সিঁড়ি বাধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

পাহাড়ী অঞ্চল বা যেসব স্থান উচু-নিচু সে সব স্থানে গাছ লাগানোর জন্য সমঢাল ও সিড়ি বাধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যে সব স্থানে ভূমির ঢাল ৩% এর বেশি এবং ১০% এর কম সেইসব স্থান সমঢাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ভূমির ঢাল অনুযায়ী সমান স্থানগুলোকে একই রেখা দ্বারা সংযোগ করলে সমোন্নতি রেখার সৃষ্টি হয়। এ রেখাগুলোকে সারিরূপে ব্যবহার করে ঢাল পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয়। অন্যদিকে জমির ঢাল যখন শতকরা ১০ ভাগের বেশি হয় তখন নির্দিষ্ট উচ্চতায় পাহাড়ের গায়ে সিড়ি বাধ (Terrace) তৈরি করে সেই স্থানে গাছ লাগানো হয়। ফলে পানি সেচ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে করা যায় এবং ভূমির ক্ষয় রোধ করা যায়।

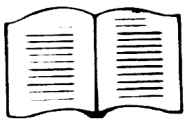

সারমর্ম ঃ অধিকাংশ ফলের বাগান দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় বাগান প্রতিষ্ঠার আগে সঠিক পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করা উচিত। কোনো জায়গায় বাগান প্রতিষ্ঠার আগে সে জায়গার জমি, মাটি, জলবায়ু, শ্রমিক প্রাপ্যতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় আনতে হবে। বাগান প্রতিষ্ঠার সময় এর প্রতিটি অংশ সুপরিকল্পিত ভাবে করতে হবে যেন কোনো ভুলত্রুটি না থাকে। ফল বাগানে গাছ নকশা করে লাগাতে হবে। বাগানে নকশা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত না করে নির্দিষ্ট পরিমাণে জমিতে অধিক সংখ্যক গাছ লাগানো যায়, বাগানে আন্ত পরিচর্যা সূচারুভাবে করা যায় এবং বাগান দেখতে সুন্দর হয়। ফল বাগানে ছয়টি পদ্ধতিতে নকশা করে গাছ লাগানো হয়। এগুলো হলো (১) আয়তাকার পদ্ধতি, (২) বর্গাকার পদ্ধতি, (৩) কুইনকাংশ পদ্ধতি, (৪) ত্রিভূজাকার পদ্ধতি, (৫) ষড়ভূজী পদ্ধতি সমঢাল ও সিড়ি বাধ পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) জমির ঢাল ..... এর বেশি হলে টেরেসিং প্রয়োজন হয়।

খ) ..... গাছসম হ বাগানের সামনে এবং আংশিক বা সম্পর্ণ পত্র পতনশীল গাছসমূহ বাগানের পিছনের দিক লাগাতে হবে।

গ) ষড়ভূজী পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ..... ভাগ গাছ বেশি লাগানো যায়।

ঘ) জমির ঢাল ৩% এর বেশি এবং ১০% এর কম হলে ..... পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

২। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) ফল বাগান স্থাপণের জন্য বাগান পরিকল্পনা তেমন জরুরী নয়।
খ) বাগনে গাছ লাগানোর জন্য ৬টি রোপণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
গ) ফিলার গাছ ষড়ভূজী পদ্ধতিতে লাগানো হয়।
ঘ) বর্গাকার পদ্ধতিতে মাঠ গাছ নিরূপণের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ
(প্রথম সারিতে গাচের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা) – একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

পাঠ ৪.৪ জমি নির্বাচন ও তৈরি, গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফল চাষের জন্য জমি নির্বাচনের শর্তসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল চাষের জন্য কীভাবে জমি তৈরি করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফলগাছ লাগানোর জন্য গর্ত ও সার প্রয়োগ কীভাবে করতে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

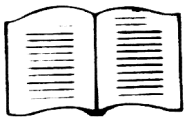

ফল চাষের জন্য জমি নির্বাচন একটি অন্যতম প্রধান কাজ। কারণ কোনো ফল চাষের জন্য সঠিক জমি নির্বাচনে ব্যর্থ হলে উক্ত ফল চাষ ব্যাহত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ জন্য কোনো ফল চাষ করার আগে উক্ত ফলের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

ফল বাগানের জন্য জমি নির্বাচন

ফল বাগানের জন্য নির্বাচিত জমি উঁচু এবং সুনিষ্কাশিত হওয়া উচিত। জমির মাটি দোয়াঁশ প্রকৃতির এবং পি. এইচ ৫.৫-৮.০ এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

ফল বাগানের জন্য নির্বাচিত জমি অবশ্যই উচু হবে এবং কখনও বন্যার পানি উঠবে না। কারণ অধিকাংশ ফল গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারেনা। ফল বাগানের জন্য নির্বাচিত জমির মাটি অবশ্যই গভীর হতে হবে। কারণ বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছের শিকড় মাটির খুব গভীরে প্রবেশ করে খাদ্য উপাদান ও পানি সংগ্রহ করে থাকে। মাটির উপযুক্ত পানি ধারণ ক্ষমতা থাকা উচিত। এ জন্য অধিকাংশ ফল গাছ বেলে দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ ধরনের মাটিতে ভালো হয়। আম, কাঁঠাল, লিচু, কালজাম, বেল, চালতা ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছের জন্য গভীর মাটি দরকার। অন্যদিকে কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি ফল সুনিষ্কাশিত অগভীর মাটিতেও ভালো ফলন দেয়। জমি নির্বাচন করার সময় মাটির পি. এইচ অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে। কারণ অধিকাংশ ফল গাছ অতিরিক্ত ক্ষারীয় বা অম্লীয় মাটি পছন্দ করে না।

বাগানের জমি তৈরি

ফল বাগানে ৫-৬ টি গভীর চাষ ও মই দ্বারা মাটি প্রস্তুত করতে হবে। জমি অসমান থাকলে তা সমান করে নেয়া ভালো।

ফল চাষের জন্য জমি তৈরি একটি অন্যতম কাজ। পতিত জমিতে ফল চাষ করতে হলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে যেন ইট, পাথর বা অন্যান্য আবর্জনা যেমন গাছের গুড়ি ইত্যাদি না থাকে। এর পর জমিকে গভীর ভাবে কর্ষন করে মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। স্বল্প মেয়াদী ফল যেমন কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ফুটি ইত্যাদির জন্য ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী ফল যেমন আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদির জন্যও জমি চাষের গভীরতা বেশি হওয়া প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে একই বাগানে বিভিন্ন রকমের ফলের চাষ করলে বিভিন্ন ফলের জন্য জমি পূর্বেই নির্দিষ্ট করে নেয়া ভালো।

চারা রোপণের জন্য গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ

বাগানে ফলের চারা রোপণের জন্য সঠিক সময়ে পরিমিত মাপের গর্ত করা উচিত। চারা লাগানোর কমপক্ষে ২ সপ্তাহ আগে জমিতে গর্ত করা

বাগানে পরিমিত ফলন পেতে হলে চারা রোপণের জন্য গর্ত করা এবং গর্তে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য্য। চারা গাছ লাগানোর সময় পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা আবশ্যক। তবে গর্তের আকার নির্ভর করে চারার আকার ও গাছের প্রজাতির ওপর। জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপনের প্রণালী মোতাবেক ফিতা বা মাপ কাঠির মাধ্যমে নির্ধারিত দূরত্বে খুটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। এরপর সঠিক স্থানে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত খনন করে খননকৃত মাটি চার পাশে ছড়িয়ে রাখতে হবে যেন গর্তের মাটি ভালোভাবে রোদে শুকায়। চারা লাগানোর কম পক্ষে দু-সপ্তাহ আগে গর্ত তৈরি করা উচিত।

জমিতে গর্ত তৈরির এক সপ্তাহ পর মাটির সাথে পরিমাণ মত সার মিশিয়ে গর্ত পূরণ করতে হবে।

গর্তে সার প্রয়োগ

গর্ত তৈরির এক সপ্তাহ পরে গর্তের মাটির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার মিশিয়ে মাটি ও সারের মিশ্রণ দ্বারা গর্ত পূরণ করতে হবে। প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ নির্ভর করে মাটির উর্বরতা, গাছের প্রজাতি, গাছ থেকে গাছের রোপণ দূরত্ব ইত্যাদির ওপর । সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত পূরণ করতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার পর গর্তে গাছ লাগানোর জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

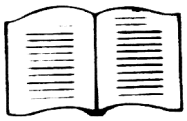

সারমর্ম ঃ ফল বাগানের জন্য জমি অবশ্যই উঁচু হবে এবং কখনও বন্যার পানি উঠবে না। জমি সুনিষ্কাশিত ও গভীর হবে। বেলে দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটি ফল চাষের জন্য উত্তম। পতিত জমিতে ফল চাষ করতে চাইলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। জমি ৫-৬টি চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করতে হবে। গর্তের আকার নির্ভর করে চারার আকার ও গাছের প্রজাতির ওপর। গর্তে গাছ লাগানোর কম পক্ষে এক সপ্তাহ আগে মাটি ও সারের মিশ্রণ দিয়ে গর্ত পূরণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ফল বাগানের জন্য জমি কেমন হওয়া উচিত ?
- (ক) ফল বাগানের জন্য জমি নিচু হবে
- (খ) ফল বাগানের জন্য জমি উঁচু হবে
- (গ) ফল বাগানের জন্য জমি উঁচু বা নিচু যে কোনটি হলেই হবে
- (ঘ) উপরের কোনটিই সত্য নয়

২। ফলের জমিতে কতটি চাষ দিতে হয়?
- (ক) ফলের জন্য জমি চাষের প্রয়োজন নাই
- (খ) ফলের জন্য ৫-৬টি চাষ দিয়ে জমি তৈরি প্রয়োজন
- (গ) ফলের জন্য ২-৩টি চাষ দিয়ে জমি তৈরি প্রয়োজন
- (ঘ) ফলের জন্য ১০-১২টি চাষ দিয়ে জমি তৈরি প্রয়োজন

৩। চারা লাগানোর কত সময় আগে গর্ত তৈরি করা উচিত?
- (ক) কম পক্ষে ১ সপ্তাহ আগে গর্ত তৈরি করা উচিত
- (খ) কম পক্ষে ৫ সপ্তাহ আগে গর্ত তৈরি করা উচিত
- (গ) কম পক্ষে ২ সপ্তাহ আগে গর্ত তৈরি করা উচিত
- (ঘ) চারা লাগানোর সময়ই গর্ত তৈরি করা উচিত

৪। সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার কত সময় পরে গাছ লাগানো উচিত?
- (ক) ৪ সপ্তাহ পর
- (খ) ৬ সপ্তাহ পর
- (গ) ৮ সপ্তাহ পর
- (ঘ) ১ সপ্তাহ পর

পাঠ ৪.৫ চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মাঠে কীভাবে চারা রোপণ করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাঠে চারা লাগানোর পরবর্তী পরিচর্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

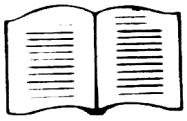

চারা রোপণ

আমাদের দেশে গ্রীষ্মের শেষ এবং বর্ষার প্রথমভাগ মাঠে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় পরিমাণ মত বৃষ্টিপাত হয় এবং বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা থাকায় গাছ সহজে মাটিতে লেগে যায়। মেঘলা দিন অথবা বিকেল বেলা চারা রোপণের উত্তম সময়। চারা লাগানোর জন্য প্রথমে চারার গোড়ায় লেগে থাকা মাটির বলের পরিমাণ মাটি গর্ত হতে সরিয়ে নিতে হবে। এরপর চারাটি সাবধানে বের করে আনতে হবে যেন চারার গোড়ার মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। এরপর চারাটি সোজা করে গর্তে বসাতে হবে। চারা গর্তে বসানোর পর চারিদিকের মাটি চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোপিত চারার গর্ত জমি থেকে উচু হয়। তা না হলে বর্ষাকালে গর্তের মাটি বসে গিয়ে চারার চারদিকে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করবে। চারাটি যাতে সহজে খাড়া থাকতে পারে এজন্য রোপণের পর চারার পাশে খুটি পুতে খুটির সাথে বেধে দিতে হবে। চারা রোপণের পর ঝারি বা ঝরণা দিয়ে গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং তা কয়েকদিন অব্যাহত রাখতে হবে। চারা গরু-ছাগল দ্বারা

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে লাগানোর পর পরই চারপাশে বাঁশের তৈরি খাচা দিয়ে গরু-ছাগলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। চারা রোপনের পর অতিরিক্ত সূর্যালোকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চারার উপরে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

রোপিত চারা যেন সহজে মাটিতে লেগে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় সে জন্য যত্ন নিতে হবে। চারার গোড়া পরিষ্কার রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ অথবা মালচিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন মত চারার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বর্ষার শুরু ও শেষে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করতে হবে।

মাঠে চারা রোপণের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চারাটির যত্ন নিতে হবে যাতে করে তা মাটিতে সহজে লেগে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এ জন্য চারার গোড়ায় বেশ কিছু দিন ঝরণা দিয়ে পানি দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে চারার গোড়ায় কোনো কারণে পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়াও চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা নিড়ানী দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। চারার গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকলে চারার গোড়ার চারপাশে শুকনা খড়, ঘাস ইত্যাদি বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে মাটিতে পানি সংরক্ষণের পদ্ধতিকে মালচিং বলা হয়। এ ছাড়া চারা গাছটি যাতে সোজা হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সেজন্য বাঁশের খুটি দ্বারা গাছকে বেধে দিতে হবে। অনেক সময় চারা গাছের গোড়া থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়। প্রয়োজন মোতাবেক শাখা-প্রশাখা রেখে বাকীগুলো ছাটাই করে ফেলতে হবে। এ ছাড়াও গাছের প্রজাতি অনুসারে চারার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় খুব অল্প সময়ে কলমের চারা গাছে ফুল আসে। যার ফলে চারা গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব অনাকাংখিত ফুল ছাটাই করে ফেলতে হবে। বৎসরে দু-বার গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় গর্তে যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয়েছে সেই পরিমাণ সার সমান দু-ভাগে ভাগ করে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে সারের পরিমাণ

বৎসরওয়ারী বৃদ্ধি করতে হবে। এ ভাবে চারা গাছ লাগানোর পর তা ফলবতী হওয়া পর্যন্ত যত্ন নিতে হবে যাতে সুস্থ ও সবল গাছ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে কাংখিত ফলন পাওয়া যায়।

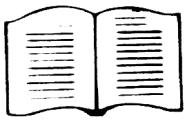

সারমর্ম ঃ আমাদের দেশে গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষার প্রথম ভাগে মাঠে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। মেঘলা দিন অথবা বিকেল বেলা মাঠে চারা লাগানো উচিত। চারা লাগানোর সময় চারার গোড়ার মাটির বলের পরিমাণ মাটি গর্ত থেকে সরিয়ে নিতে হবে। এরপর চারাটি গর্তে বসিয়ে ভালোভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা যেন সোজা থাকে এ জন্য খুটি দিয়ে চারাটি সোজা করে বেধে দিতে হবে এবং গরু-ছাগল দ্বারা যেন চারা আক্রান্ত হতে না পারে সেজন্য চারার চারদিকে খাচা দিতে হবে। আগাছা পরিষ্কার, পানি সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, ছাটাই এবং সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। মাঠে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় কোন্‌টি?
- (ক) মাঠে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় শীতকাল
- (খ) মাঠে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় খরার সময়
- (গ) মাঠে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় গ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষার প্রথম ভাগ
- (ঘ) মাঠে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হেমন্তকাল

২। গরু ছাগলের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য কোন্‌টি প্রয়োজন?
- (ক) গরু-ছাগলের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য গাছের চারদিকে খাচা দিতে হবে
- (খ) গরু-ছাগলের অত্যাচারের জন্য খাচার দরকার নেই
- (গ) গরু-ছাগলের অত্যাচার থেকে চারা রক্ষা করার জন্য খাচার ব্যবহার বাঞ্চনীয় নয়
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সত্য নয়

৩। কোন্‌ সময় চারার জন্য সেচ প্রয়োজন?
- (ক) বর্ষা মৌসুমে চারার জন্য সেচের দরকার
- (খ) খরার সময় চারার জন্য সেচের দরকার
- (গ) খরার সময় চারার জন্য সেচের দরকার নেই
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়

৪। চারা গাছে প্রতি বছর কতবার সার দেয়া উচিত?
- (ক) চারা গাছে সার প্রয়োগের দরকার নেই
- (খ) চারা গাছে বছরে ১২ বার সার প্রয়োগ করা উচিত
- (গ) চারা গাছে বছরে ২ বার সার প্রয়োগ করা উচিত
- (ঘ) চারা গাছে বছরে ৫ বার সার প্রয়োগ করা উচিত

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৬ বর্গাকার প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি, নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বর্গকার প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতির নকশা তৈরি করতে পারবেন।
- নকশা অনুসরণ করে জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে গাছ লাগাতে পারবেন।
- বর্গাকার পদ্ধতিতে মাঠে লাগানো গাছের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন।

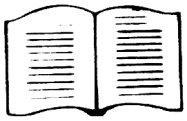

বর্গাকার প্রণালিতে লাগানো গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ও পাশাপাশি দুই সারির দূরত্ব সমান থাকে অর্থাৎ পাশাপাশি দুই সারির চারটি গাছ একটি বর্গক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

বর্গাকার প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতির নকশা তৈরিকরণের উপকরণ

বাড়ীতে অথবা ল্যাবরেটরীতে বর্গাকার প্রণালিতে গাছ লাগানোর নকশা তৈরি করা এবং নকশা অনুযায়ী মাঠে গাছ লাগানোর জন্য নিম্নলিখিত উপকরণ প্রয়োজনঃ

১। সাদা কাগজ
২। পেন্সিল
৩। ত্রিকোণী (সেট স্কয়ার) ও মিটার স্কেল
৪। চিহ্নিতকরণ দন্ড (Pole)
৫। দূরত্ব মাপার ফিতা
৬। সরু কাঠি

কাজের ধাপ

ক) প্রথমে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জেনে নিন।

খ) এরপর কাগজে জমির নকশা তৈরির জন্য স্কেল বা মান ধরে তা লিখুন। উদাহরণস্বরূপ স্কেল বা মান ১ সেমি.= ৫ মিটার (চিত্র ৪.৬.১ দেখুন)।

গ) এরপর স্কেল অনুযায়ী কাগজে জমির দৈর্ঘ্য মোতাবেক একটি লাইন আঁকুন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের লাইন যেন একটি আরেকটির সাথে লম্ব তৈরি করে এজন্য সেট স্কায়ার ব্যবহার করুন। এভাবে চিত্র অনুযায়ী জমির চারদিকের বাউন্ডারী লাইন আঁকুন।

ঘ) এরপর বাউন্ডারী থেকে চারদিকে গাছ থেকে গাছের দূরত্বের অর্ধেক রেখে মূল রেখা আঁকুন।

ঙ) মূল রেখা আঁকার পর গাছ থেকে গাছের দূরত্বের স্কেল অনুযায়ী পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করুন। তেমনি ভাবে সারির পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করুন।

চ) এরপর সারি ও গাছের পয়েন্টগুলো লাইন টেনে সংযুক্ত করুন। এখন দেখবেন দুই সারির চারটি গাছ একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছে।

ছ) নকশা অনুযায়ী জমিতে সীমানা ও মূল রেখা প্রস্তুত করুন। মূল রেখা তৈরির জন্য যথাযথ লম্বা একটি দড়িতে ৩ঃ৪ঃ৫ অনুপাতে চিহ্নিত করুন। এর মধ্যম অংশের উভয় দিক মূল রেখাতে এমনভাবে ধরতে হবে যেন এর বা প্রান্ত মূল রেখার প্রথম গাছটির অবস্থানের সাথে মিলিত হয় এবং ডান প্রান্ত মূল রেখাতে চেপে দড়িটির প্রান্ত দুটি একসাথে ধরে নিচের দিকে টান দিলে দড়ির প্রথমাংশ বরাবর লম্ব রেখা তৈরি হবে এবং একটি ৯০° কোণ তৈরি করবে। মূল রেখা তৈরির পর নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুসারে কাঠি পুতে চারা রোপণের স্থানগুলো চিহ্নিত করুন।

জ) এরপর একটি দড়ির এক প্রান্ত মূল রেখার প্রথম গাছের অবস্থানে বেধে লম্ব রেখা বরাবর জমির অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর লম্ব রেখা বরাবর সারির অবস্থান কাঠি দ্বারা চিহ্নিত করুন। এরপর সারিতে প্রথম সারির মত করে গাছের অবস্থান কাঠি দ্বারা চিহ্নিত করুন। এরপর প্রথম ও শেষ সারির পরস্পরমুখী গাছগুলো বরাবর দড়ি দিয়ে সংযুক্ত করুন। এরপর এ দড়ি বরাবর সারির দূরত্ব মোতাবেক কাঠি দিয়ে গাছের অবস্থান চিহ্নিত করুন। এভাবে পরবর্তীতে পূর্বের ন্যায় প্রথম ও শেষ সারির গাছ দুটি দড়ি দ্বারা সংযুক্ত করে সারির দূরত্ব মোতাবেক গাছের অবস্থান চিহ্নিত করুন। এভাবে নকশা মোতাবেক মাপের ফিতা ও কাঠি ব্যবহার করে বর্গাকার পদ্ধতিতে মাঠে গাছের অবস্থান চিহ্নিত করুন।

বর্গাকার প্রণালিতে জমিতে গাছের সংখ্যা

নিম্নলিখিত ফর্মূলা অনুযায়ী বর্গাকার পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় ঃ

জমিতে গাছের সংখ্যা = জমির প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা

চিত্র ৪.৬.১ঃ বর্গাকার প্রণালিতে নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি।

স্কেল বা মান ঃ ১ সে. মি. = ১০ মিটার
আয়তন = ১ হেক্টর বা ১০০০০ বর্গমিটার
গাছ থেকে গাছের দুরত্ব = ১০ মিটার
সারি থেকে সারির দুরত্ব = ১০ মিটার
মোট সারির সংখ্যা = ১০

প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা = ১০
মোট গাছের সংখ্যা = ১০×১০ = ১০০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে চিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বর্গাকার প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির চারটি গাছ এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) বর্গাকার প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির চারটি গাছ একটি আয়তক্ষেত্র তৈরি করে।
- (খ) বর্গাকার প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির চারটি গাছ একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে।
- (গ) বর্গাকার প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির চারটি গাছ একটি রম্বস তৈরি করে।
- (ঘ) বর্গাকার প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির চারটি গাছ একটি সামন্তরিক তৈরি করে।

২। নিচের কোন্‌টি বর্গাকার প্রণালিতে নকশা করার জন্য দরকারী?
- (ক) দা
- (খ) প্রুনিং কাচি
- (গ) ত্রিকোণী বা সেট স্কয়ার
- (ঘ) আচড়া

৩। জমির কোণ ৯০° করতে কোন্‌ অনুপাত ব্যবহার করা হয়?
- (ক) ৩ঃ৪ঃ৫
- (খ) ২ঃ৩ঃ৫
- (গ) ১ঃ৩ঃ৫
- (ঘ) ৪ঃ৫ঃ৫

৪। বর্গাকার প্রণালিতে জমিতে গাছের সংখ্যার ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা-১) × (মোট সারির সংখ্যা-১)
- (খ) প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা
- (গ) (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা-১) × মোট সারির সংখ্যা
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

পাঠ ৪.৭ ত্রিভূজী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ত্রিভূজী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতির নকশা তৈরি করতে পারবেন।
- নকশা অনুসরণ করে জমিতে ত্রিভূজী প্রণালিতে গাছ লাগাতে পারবেন।
- ত্রিভূজী প্রণালিতে মাঠে লাগানো গাছের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন।

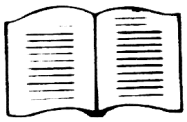

ত্রিভূজী প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের সৃষ্টি করে। নিচে ত্রিভূজী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি নকশাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

নকশাকরণ ও নকশা অনুযায়ী গাছ লাগানোর জন্য উপকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সাদা কাগজ
২। পেন্সিল
৩। ত্রিকোণী (সেট স্কয়ার) ও মিটার স্কেল
৪। চিহ্নিতকরণ দন্ড (Pole)
৫। দূরত্ব মাপার ফিতা
৬। সরু কাঠি

কাজের ধাপ

ক) প্রথমে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করুন।

খ) এরপর বর্গাকার প্রণালির ন্যায় জমির নকশা তৈরির জন্য স্কেল বা মান ধরে তা লিখুন। উদাহরণ স্বরূপ স্কেল ঃ
১ সেমি. = ৫ মিটার (চিত্র- ৪.৭.১)

গ) স্কেল মোতাবেক কাগজে জমির দৈর্ঘ্য আঁকুন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যেন একে অপরের সাথে লম্ব তৈরি করে এ জন্য সেট স্কয়ার ব্যবহার করুন। এভাবে চিত্র অনুযায়ী কাগজে জমির চারদিকের বাউন্ডারী বা সীমানা লাইন আঁকুন।

ঘ) এরপর সীমানার ভিতর চারপাশে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ও সারি থেকে সারির দূরত্বের অর্ধেক রেখে মূল রেখা আঁকুন।

ঙ) মূল রেখাকে প্রথম সারি হিসেবে বিবেচনা করে স্কেল অনুযায়ী সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্বের পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করুন।

চ) এখন স্কেল অনুযায়ী সারির পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করুন।

ছ) এরপর সারির সংখ্যা বিজোড় হলে শেষ সারিতে প্রথম সারির ন্যায় গাছের পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করুন। সারির সংখ্যা জোড় হলে প্রথম সারির দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছের স্থান চিহ্নিত করুন।

জ) তারপর চিত্রানুযায়ী নকশা তৈরি করুন।

ঞ) নকশা অনুযায়ী বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় জমিতে সীমানা ও মূল রেখা তৈরি করুন। মূল রেখাকে প্রথম সারি হিসেবে গণ্য করে গাছের দূরত্ব অনুযায়ী স্থান চিহ্নিত করুন। এরপর জমিতে সারিগুলো চিহ্নিত করুন। সারি চিহ্নিত করার পর বিজোড় সারিগুলোতে প্রথম সারির ন্যায় গাছের স্থান চিহ্নিত করুন এবং জোড় সারিগুলোতে প্রথম সারির দু গাছের মাঝে গাছের স্থান চিহ্নিত করুন। এভাবে বিজোড় ও জোড় সারিতে গাছের স্থান চিহ্নিত করুন (চিত্র ৪.৭.২ দেখুন)। নকশা বা মাঠে জোড় সারিগুলো একান্তর ক্রমিক সারি হিসেবে পরিচিত। প্রতি

একান্তর ক্রমিক সারিতে একটি করে গাছ কম লাগানো যায়। ত্রিভূজী প্রণালিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নিচের ফর্মূলা অনুযায়ী নির্ণয় করা হয় ঃ

জমিতে গাছের সংখ্যা = (জমিতে প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা)– একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

চিত্রঃ ৪.৭.১ ত্রিভূজী প্রণালীতে নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি।

স্কেল বা মান ঃ ১ সে. মি. = ৫ মিটার
আয়তন = ০.৭৫ হেক্টর

গাছ থেকে গাছের দুরত্ব = ৫ মিটার
সারি থেকে সারির দুরত্ব = ৬ মিটার
প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা = ২৫
একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা = ৫
মোট গাছেল সংখ্যা = (২৫ও১০)- = ২৪৫

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ত্রিভ জীয় প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির গাছ এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
   (ক) ত্রিভূজী প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির তিনটি গাছ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ তৈরি করে।
   (খ) ত্রিভূজী প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির তিনটি গাছ একটি সমবাহু ত্রিভূজ তৈরি করে।
   (গ) ত্রিভূজী প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুটি সারির তিনটি গাছ একটি অসমবাহু ত্রিভূজ তৈরি করে।
   (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

২। ত্রিভূজী প্রণালিতে প্রতি একান্তর সারির ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
   (ক) প্রথম সারির ন্যায় গাছ লাগানো হয়।
   (খ) প্রথম সারির দুটি গাছের মাঝখানে গাছ লাগানো হয়।
   (গ) একভাবে লাগালেই হয়।
   (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

৩। ত্রিভূজী প্রণালিতে জমিতে গাছ নির্ণয়ের ফর্মূলা কোন্‌টি?
   (ক) সারিতে গাছের সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা
   (খ) (সারিতে গাছের সংখ্যা) × (মোট সারির সংখ্যা-১)
   (গ) (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা) × (মোট সারির সংখ্যা) - একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা
   (ঘ) প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা × একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

পাঠ ৪.৮ ষড়ভূজী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতি নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ষড়ভূজী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতির নকশা তৈরি করতে পারবেন।
- নকশা অনুসরণ করে জমিতে ষড়ভূজী প্রণালিতে গাছ লাগাতে পারবেন।
- ষড়ভূজী প্রণালিতে মাঠে লাগানো গাছের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেন।

ষড়ভূজী প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ একটি ষড়ভূজ তৈরি এবং এ ষড়ভূজের কেন্দ্রে একটি গাছ থাকে। এ প্রণালিতে লাগানো দুই সারির তিনটি গাছ একটি সমবাহু ত্রিভূজের তৈরি করে। এজন্য এ পদ্ধতিকে সমবাহু ত্রিভূজ প্রণালিও বলা হয়। এ প্রণালিতে লাগানো এক গাছের দূরত্ব অন্য গাছ হতে সব দিক থেকে সমান থাকে। যার দরুন প্রতিটি গাছ সমান ভাবে খাদ্য উপাদান, আলো, বাতাস, পানি পেয়ে থাকে এবং তিনদিক থেকে আন্ত পরিচর্যা করা যায় এবং গাছগুলো তিনদিক থেকে একই লাইনে দেখা যায়। এছাড়া বর্গাকার প্রণালির চেয়ে এ প্রণালিতে শতকরা ১৫ ভাগ গাছ বেশি লাগানো যায়। যার দরুন মাঠ পর্যায়ে এ প্রণালিতে গাছ লাগানোর জন্য বলা হয়ে থাকে।

ষড়ভূজী প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতির নকশা তৈরিকরণের জন্য উপকরণ

বর্গাকার প্রণালিতে গাছ লাগানো পদ্ধতির নকশা তৈরি করণের জন্য যে সব উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়, এ ক্ষেত্রে ও সে সব উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সাদা কাগজ
২। পেন্সিল
৩। ত্রিকোণী (সেট স্কয়ার) ও মিটার স্কেল
৪। চিহ্নিতকরণ দন্ড (চড়ষব)
৫। দূরত্ব মাপার ফিতা
৬। সরু কাঠি

কাজের ধাপ

ক) প্রথমে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জেনে নিন।
খ) এরপর বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় কাগজে জমির নকশা তৈরির জন্য স্কেল বা মান ধরে তা লিখুন।
গ) স্কেল অনুযায়ী কাগজে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী বাউন্ডারী বা সীমানা আঁকুন।
ঘ) এর পর গাছ থেকে গাছের দূরত্বের অর্ধেক এবং সারি থেকে সারির দূরত্বের অর্ধেক সীমানার চারিদিকে রেখে মূল রেখা আঁকুন। ষড়ভূজী প্রণালিতে দুই সারির তিনটি গাছ একটি সমবাহু সৃষ্টি করে এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব তিনদিক থেকেই সমান থাকে (চিত্র- ৪.৮.২ দেখুন)। অতএব সমবাহু ত্রিভূজের যে কোনো কোণ থেকে অপর বাহুর ওপর লম্ব আকলে তা অপর বাহুকে সমান ভাগে ভাগ করে। আর ঐ লম্বই হবে সারি থেকে সারির দূরত্ব। আমরা যদি তিনটি বিন্দুতে ক, খ ও গ দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে কখগ একটি সমবাহু ত্রিভূজের সৃষ্টি করবে। এখন 'ক' বিন্দু থেকে 'খগ' বাহুর উপর 'কঘ' লম্ব আকলে 'কঘ' ই হবে সারি থেকে সারির দূরত্ব। এখন পিথাগোরাসের তত্ত্ব অনুযায়ী সমকোণী ত্রিভূজের (চিত্র ৪.৮.১ দেখুন) অতিভূজের উপরের বর্গ = ভূমির ওপর বর্গ + ঢালের ওপর বর্গ অর্থাৎ

$$কগ^২ = ঘগ^২ + কঘ^২$$

$$অতএব, কঘ^২ = কগ^২ - ঘগ^২$$

$$অতএব, কঘ = \sqrt{কগ^২ - ঘগ^২} \text{ অর্থাৎ}$$

এক সারি থেকে অপর সারির দূরত্ব $কঘ = \sqrt{কগ^২ - ঘগ^২}$ ।

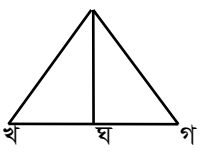

চিত্র ৪.৮.১ সমকোণী ত্রিভূজ

ঙ) এভাবে সারি থেকে সারির দূরত্ব বের করে তা নকশায় চিহ্নিত করুন।

চিত্র ৪.৮.২ঃ ষড়ভূজী প্রণালিতে নকশাকরণ ও গাছের সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি

স্কেল বা মান ঃ ১ সে.মি = ৫ মিটার
আয়তন = ১ হেক্টর বা ১০০০০ বর্গমিটার
গাছ থেকে গাছের দুরত্ব = ১০ মিটার
সারি থেকে সারির দুরত্ব = ৮.৭ মিটার
মোট সারির সংখ্যা = ১১
প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা = ১০
একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা = ৫
মোট গাছের সংখ্যা = (১১ী ১০)-৫ = ১০৫

চ) এখন মূল সারিতে গাছের স্থান চিহ্নিত করুন। সাথে সাথে জমিতে সারির স্থান চিহ্নিত করুন। সারির সংখ্যা বিজোড় হলে শেষ সারিতে প্রথম সারির ন্যায় গাছের স্থান চিহ্নিত করুন। সারির সংখ্যা জোড় সংখ্যা হলে প্রথম সারিতে চিহ্নিত করা দুই গাছের মাঝখানে গাছের স্থান চিহ্নিত করুন। এরপর চিত্র অনুযায়ী চিহ্নিত স্থান গুলো লাইন দ্বারা সংযুক্ত করুন।

ছ) এরপর নকশা অনুযায়ী ত্রিভূজী প্রণালির ন্যায় জমিতে সারি ও চারার স্থান চিহ্নিত করে সেই মোতাবেক চারা লাগান। ষড়ভূজী প্রণালিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের ফর্মূলা ত্রিভূজী প্রণালির মত। অর্থাৎ

গাছের সংখ্যা = (প্রথম সারিতে চারার সংখ্যা × মোট সারির সংখ্যা) - একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ষড়ভূজী প্রণালিতে লাগানো পাশাপাশি দুই সারি তিনটি গাছ এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ তৈরি করে।
- (খ) সমবাহু ত্রিভূজ তৈরি করে।
- (গ) অসমবাহু ত্রিভূজ তৈরি করে।
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়।

২। ষড়ভূজী প্রণালিতে লাগানো গাছ থেকে গাছের দূরত্ব এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) সারি থেকে সারির দূরত্বের সমান
- (খ) সারি থেকে সারির দূরত্বের চেয়ে বেশি
- (গ) সারি থেকে সারির দূরত্বের চেয়ে কম
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়

৩। ষড়ভূজী প্রণালিতে নকশাকরণ এর ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) খুব সহজ
- (খ) কঠিন
- (গ) মোটামুটি সহজ
- (ঘ) কোনোটিই সঠিক নয়

পাঠ ৪.৯ গর্তকরণ, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কীভাবে চারা লাগানোর জন্য গর্ত করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে সার প্রয়োগ করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাঠে চারা কীভাবে রোপণ করতে হয় তা আলোচনা করতে পারবেন।

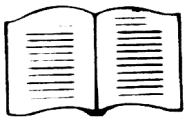

মাঠ ফসলের সাথে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মূল পার্থক্য হলো এই যে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের ক্ষেত্রে ভালোভাবে চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট আকারের গর্ত খনন করার পর গর্তে সার প্রয়োগ করে গাছ লাগানো হয়। তাই জমিতে গর্তকরণ, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি সম্বন্ধে এ পাঠে আলোচনা করা হলো।

গর্তকরণ, সার প্রয়োগ ও চারা রোপণের জন্য উপকরণাদি

১। কোদাল
২। খন্তা/শাবল
৩। পচা গোবর ও রাসায়নিক সার
৪। ঝুড়ি
৫। মাপযন্ত্র
৬। ঝরণা
৭। বাঁশের কাঠি
৮। বাঁশের খাচা
৯। দড়ি

কাজের ধাপ

ক) চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত করুন। গর্তের মাটি গর্তের চারদিকে ছড়িয়ে রাখুন।

খ) এক সপ্তাহ পর গর্তের মাটির সাথে গাছের প্রজাতি অনুযায়ী পচা গোবর ও রাসায়নিক সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে গর্তটি সার মিশানো মাটি দিয়ে পূরণ করুন। এরপর কমপক্ষে গাছ লাগানোর জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন যেন প্রয়োগকৃত সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশে যায়।

গ) সার মিশানো মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার এক সপ্তাহ পর গর্তে চারা লাগান। চারা যদি পটে থাকে তবে চারাটি সাবধানে পট থেকে বের করতে হবে। চারাটি যদি নার্সারি বেডে থাকে তবে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে চারাটি খাসি করুন। খাসি করার এক সপ্তাহ পরে চারার চারদিক বাঁকা দা দিয়ে মাটি কেটে চারাটি নার্সারি বেড থেকে উঠিয়ে পলিথিন ব্যাগে রাখুন এবং চারাটি নার্সারিতে ছায়ায় রাখুন।

ঘ) এখন চারা গাছের গোড়ার বলের পরিমাণ মাটি গর্ত হতে সরিয়ে রাখুন। এরপর পলিথিন ব্যাগটি চাকু দ্বারা লম্বালম্বি ভাবে কেটে দিন। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন মাটির বলটি পলিথিন ব্যাগ কাটার সময় অথবা পট থেকে বের করার সময় ভেঙ্গে না যায়।

ঙ) এখন চারাটির কান্ড বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের মধ্যে নিন এবং বলটি ডানহাতের তালুতে নিয়ে চারাটি সোজা করে গর্তে বসান। গর্তে বসানোর পর গর্ত হতে সরিয়ে নেয়া মাটি দিয়ে বলটি ভালো করে চেপে দিন। এরপর একটি শক্ত কাঠি দিয়ে চারাটি সোজা করে বেধে দিন।

চ) চারা রোপণের পর তাতে ঝরণা দিয়ে পানি দিন এবং বাঁশের খাচা দিয়ে চারাটি গরু-ছাগলের আক্রমন হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণের পর কমপক্ষে একমাস রোপিত চারার গোড়ায় পানি দিন। মাঠে চারা রোপণের উত্তম সময় হলো বিকেল বেলা এবং মেঘাচ্চন্ন দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্‌টি চারা রোপণের উপকরণ নয়?
- (ক) কোদাল
- (খ) ঝরণা
- (গ) বাঁশের খাচা
- (ঘ) প্রুনিং কাঁচি

২। চারা লাগানোর কমপক্ষে কত সময় পূর্বে গর্ত করতে হবে?
- (ক) ২ সপ্তাহ পূর্বে
- (খ) ১ সপ্তাহ পূর্বে
- (গ) ৪ দিন পূর্বে
- (ঘ) ১ দিন পূর্বে

৩। চারা রোপণের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- (ক) চারার গোড়ার বলটি ভেঙ্গেঁ গর্তে চারা রোপণ করতে হবে
- (খ) চারার গোড়ার বলটি অক্ষত রেখে চারা রোপণ করতে হবে
- (গ) চারার গোড়ার বলটি অর্ধেক ভেঙ্গেঁ চারা রোপণ করতে হবে
- (ঘ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়

৪। রোপণকৃত চারাটি খাড়া রাখার জন্য কী করতে হবে?
- (ক) শক্ত কাঠি বেধে দিতে হবে
- (খ) কোনো কাঠির দরকার নেই
- (গ) দড়ি দিয়ে খাড়া রাখা যাবে
- (ঘ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্নাবলী

১। জলবায়ু কী? উদাহরণসহ জলবায়ুর চাহিদা অনুযায়ী ফলসম হের শ্রেণিবিন্যাস করুন এবং বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

২। ফল চাষে ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩। ফল বাগান পরিকল্পনার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করা দরকার তা লিপিবদ্ধ করুন।

৪। ফল বাগানে গাছ রোপণ প্রণালির গুরুত্ব কী? ফল বাগানে বিভিন্ন গাছ রোপণ প্রণালি বর্ণনা করুন।

৫। ফল চাষের জন্য উপযুক্ত জমির বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

৬। জমিতে গাছ লাগানোর জন্য গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৭। মাঠে চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যাসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১
১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠ ৪.২
১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠ ৪.৩
১। ক) ১০% খ) চির সবুজ গ) ১৫% ঘ) সমঢাল
ক) মিথ্যা খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা

পাঠ ৪.৪
১। খ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠ ৪.৫
১। গ ২। ক ৩। খ ৪। গ

পাঠ ৪.৬
১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ

পাঠ ৪.৭
১। ক ২। খ ৩। গ

পাঠ ৪.৮
১। খ ২। খ ৩। খ

পাঠ ৪.৯
১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক

ইউনিট ৫
ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ইউনিট ৫ ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফল চাষের জন্য ফল ধারণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গাছে ফল ধারণ বিভিন্ন কারণে বিঘ্নিত হতে পারে। পরিনামে গাছে ফল উৎপাদন কম হয়। এমন কি অনেক সময় গাছ কোনো ফল উৎপাদন করে না। গাছের ফলধারণ প্রক্রিয়া চার ধাপে সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো (১) ফুল-কলার বৃদ্ধি শুর€ (২) পরাগায়ন পূর্ব বিকাশ (৩) পরাগায়ন পরবর্তী বৃদ্ধি এবং (৪) পরিপক্কতা, পাকা এবং বার্ধক্য প্রাপ্তি। ফল ধারণের উপোরক্ত চারটি ধাপের যে কোনোটি গাছের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কারণে ব্যাহত হতে পারে। গাছের ফল ও সঠিক সময় গাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ জন্য ফলকে অবশ্যই সঠিক পরিপক্কতায় গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ ফল উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল সংরক্ষণের বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গাছে ফল ধারণ, বাগানে আন্তপরিচর্যা, অফলোদপাদিকার কারণ ও তার সমাধান, ফসল পর্যায়, সাথী ফসলের চাষ, ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ, সংগ্রহোত্তর ফলের শারীরবৃত্তীয় ও সংরক্ষণের নীতি, তাজা ফল সংরক্ষণের পরিবেশ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ আন্ত পরিচর্যা ও অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আন্ত পরিচর্যা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল গাছে করণীয় আন্ত পরিচর্যাসম হ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল গাছ অফলন্ত হওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অফলন্ত ফল গাছকে ফলবর্তীকরণের জন্য করণীয় কাজসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আন্ত পরিচর্যা

জমিতে চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত ফল গাছের যত্ন নেয়ার জন্য যে সব কাজ করা হয় সেগুলোর নাম আন্ত পরিচর্যা (Intercultural operations)। ফল বাগানে বিভিন্ন আন্ত পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে আগাছা দমন, আন্ত কর্ষণ, সেচ, পানি নিষ্কাষণ, সার প্রয়োগ, অঙ্গ ছাটাই, সাথী ফসলের চাষ, ভূমিক্ষয় রোধ, পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন ইত্যাদি।

আগাছা দমন

আগাছা জায়গা, খাদ্য উপাদান, পানি ও সূর্য রশ্মির জন্য গাছের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং পোকা-মাকড়কে আশ্রয় দেয়। এজন্য স্বল্প মেয়াদী ফল গাছের জন্য আগাছা দমন একটি অন্যতম করণীয় কাজ। দীর্ঘ মেয়াদী ফলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছা দমনের প্রয়োজন হলেও পরবর্তীতে তা খুব দরকার হয় না। কারণ আগাছা পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়দী ফলের সাথে টিকে থাকতে পারে না।

আন্ত কর্ষণ (Inter-tillage)

আগাছা দমন ও জমিতে রস সংরক্ষণের জন্য বর্ষার আগে এবং বর্ষার শেষে আন্ত কর্ষণের ফলে মাটিতে পানি প্রবেশ করে এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে সংরক্ষিত পানি গাছের খুব উপকারে আসে।

মালচিং (Mulching)

খড়, গাছের পাতা, কালো প্লাষ্টিক ইত্যাদি মালচিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

মালচিং মাটিতে রস সংরক্ষণ এবং আগাছা দমনের জন্য বেশ উপকারী। খড়, গাছের পাতা, কালো প্লাষ্টিক ইত্যাদি মালচিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- আনারসের ক্ষেতে কালো প্লাষ্টিক মালচ আগাছা দমন ও মাটির রস সংরক্ষণে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পানি সেচ

অন্যান্য ফসলের ন্যায় ফল গাছে পানি প্রয়োজন। গাছের বৃদ্ধি ও ফলধারণের জন্য পানির দরকার। কলা, পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ ইত্যাদি ফল যাদের মূল অগভীর ধরনের সে সব ফলের বাগানে অবশ্যই শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ফল গাছে থালা পদ্ধতিতে (Basin system) সেচ প্রদান সবচেয়ে উপযোগী। প্রত্যেকটি থালা পানির প্রধান নালার সাথে সংযুক্ত করতে হবে। দুপুর বেলায় গাছের যে পারিমাণ জায়গায় ছায়া পড়ে থালাটি ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। থালা পদ্ধতিতে বৃক্ষজাতীয় ফল গাছে সেচ প্রদানে পানির অপচয় কম হয় এবং গাছের সঠিক স্থানে পানি সেচ প্রদান সম্ভব হয়। অবশ্য স্বল্প মেয়াদী ফল যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল বাগানে প্লাবন পদ্ধতিতেও সেচ প্রদান করা যায়। বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ফল বাগানে একবার সেচ প্রদান করতে পারলে ভালো।

পানি নিষ্কাশণ

আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় যা প্রয়োজনের তূলনায় অনেক বেশি। সাথে সাথে পানিতল অনেক সময় মাটির সমতলে চলে আসে। যার দরুন বাগানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বিশেষ করে পেঁপে, কাঠাল ইত্যাদি ফল জলাবদ্ধতা মোটেই পছন্দ করে না। ফল বাগানে যেন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় এজন্য পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাঠে সার প্রয়োগ

আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছের বাগানে নিয়মিত সার প্রয়োগ করেন না। এ জন্য ফলন অনেক কম পান। বাগানে সার প্রয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন বিষয় যেমন- মাটির উর্বরতা, গাছের প্রজাতি, আকার, মৌসুম ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়ানো উচিত।

প্রুনিং

প্রুনিং বা ছাটাইকরণ ফলচাষে একটি অন্যতম করণীয় কাজ।

প্রুনিং বা ছাটাইকরণ ফলচাষে একটি অন্যতম করণীয় কাজ। চারা রোপণের পর প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ছাটাই করা দরকার যাতে গাছের একটি সুষ্ঠ ও সবল কাঠামো গড়ে উঠে। পরবর্তীতে কোনো কোনো ফল গাছে ছাটাই করতে হয। যেমন কুল গাছের ফল সংগ্রহের পর সব ডালপালা কেটে ফেলতে হয়। এতে ফলের মান ও ফলন উভয়েই বাড়ে। তেমনিভাবে আঙুর, লেবু, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল গাছে নিয়মিত ও পরিমিত ছাটাই করা প্রয়োজন।

অনেক সময় যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও গাছ ফলবর্তী না হলে শিকড় ছাটাই করে এ সমস্যা দূর করা যায়। গাছ যে পরিমাণ জায়গায় বিস্তৃতি লাভ করে সেই জায়গা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে গভীরভাবে চাষ করে শিকড় ছাটাই করা হয়।

আন্ত চাষ

ফল বাগানের মাটিতে রস সংরক্ষণের জন্য বর্ষার প্রথমে ও শেষে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলে উপকার পাওয়া যায়। চাষ করলে গাছের পাতা ও আবর্জনা মাটির সাথে মিশে এবং পানি খুব সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে এবং অনেকদিন ধরে তা মাটিতে সংরক্ষিত থাকে। যার দরুন মাটির জৈব পর্দাথের পরিমাণ বাড়ার সাথে পানি ধারণ ক্ষমতা ও খাদ্য উপাদানের পরিমাণ বাড়ে।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন

বিভিন্ন সময় ফল বাগানে বিভিন্ন পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ দেখা যায়। এ সব পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পোকামাকড় ও রোগ বালাই প্রতিরোধকারী জাত ব্যবহার করতে হবে।

অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ

গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি একেবারে অথবা আকাংখিত পরিমাণ ফল না দেয় তাহলে সেই গাছকে অফলন্ত গাছ বলা হয়। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের প্রক্রিয়া সমূহ আলোচনা করার আগে ফলন্ত ও অফলন্ত গাছ কী তা আমাদের জানা উচিত।

ফলন্ত গাছ

গাছ নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি পরিমিত ফুল, ফল ধারণ করে এবং সংগ্রহ পর্যন্ত গাছ ফল বহন করে

কোনো গাছ নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি পরিমিত ফুল ও ফল ধারণ করে এবং ফল সংগ্রহ পর্যন্ত গাছ ফল বহন করে তখন তাকে আমরা ফলন্ত গাছ বলি। গাছে ফুলের মুকুল বিকশিত হওয়ার পর তা প্রস্ফুটিত হয় এবং পরাগায়ন ও নিষিক্ত করণের পর ফুলের গর্ভাশয় স্ফীত হয়ে ফলে পরিনত হয়। ফলন্ত গাছে শুধু প্রচুর পরিমাণ ফুল ফলই ধরে না, ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তা বহন করে। এটি ফলন্ত গাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখি অনেক গাছে প্রচুর পরিমাণ ফুল ও ফল ধরে। কিন্তু সেই ফল পরিপক্ক হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। এ ক্ষেত্রে গাছটিকে ফলন্ত বলা যাবে না। কারণ গাছটি যে ফল বহন করেছিল তা পরিপক্কতার আগেই ঝরে পড়েছে এবং তা চাষী অথবা ভোক্তার কোনো কাজেই লাগেনি।

অফলন্ত গাছ

কোনো গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি ফল না দেয়, ফুল, ফল ঝরে পড়ে, কম পরিমাণ ফল ধারণ করে অথবা অনিয়মিত ও ত্রুটি যুক্ত ফল দেয় তখন সেই ফল গাছকে আমরা অফলন্ত গাছ বলি।

অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের পদক্ষেপ সমুহ

অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। তবে আগে থেকে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে এ সমস্যা অনেকগুলো এড়ানো যেতে পারে। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের কয়েকটি পদক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

(১) বিপরীত লিঙ্গের গাছ জন্মান এবং কৃত্রিম পরাগায়ন (Growing plants of opposite sex and artificial pollination) t যে সব গাছে স্থতী ও পুরুষ ফুল ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয় যেমন তাল, খেজুর, পেঁপে গাছের ক্ষেত্রে বাগানে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্থতী ও পুরুষ গাছ লাগিয়ে অফলন্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়েও এ সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন পেঁপে গাছে কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে ফল ধারণ করানো যায়।

(৪) সুষম সার ব্যবহার (Use of balanced fertilizers) ঃ ফল বাগানে সুষম সার ব্যবহার করে গাছের বৃদ্ধি এবং ফুল-ফল বিকাশকে সঠিক পর্যায়ে রাখা যায়।

(৫) পরিচর্যা ঃ অনেক সময় অবহেলা ও পরিচর্যার অভাবে গাছে ফল ধরা বন্ধ হয়ে যায়। পরিচ্ছন্নতা, আগাছা দমন, রোগ বালাই দমন করে ও যথা সময়ে সেচ প্রদান সহ যথোপযুক্ত পরিচর্যা করে গাছকে ফলবর্তী করা যায়।

(৬) গাছে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের সঠিক অনুপাত সংরক্ষণ (Maintaining right C:N ratio in the plants) ঃ গাছে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের সঠিক অনুপাত ফুল ও ফল ধারনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য গাছে উক্ত খাদ্য দুটির সঠিক অনুপাত বজায় রাখা উচিত। গাছের মূল ছাটাই, বাকল ছাটাই, ফুল-ফল পাতলাকরণ প্রভৃতি উদ্যানতাত্ত্বিক কৌশল অবলম্বন করে গাছে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের সঠিক উপাদান সংরক্ষণ করে অফলন্ত গাছকে ফলবর্তী করা যায়।

(৭) মৌমাছি পালন (Bee keeping) ঃ বাগানে মৌমাছি পালন পরাগায়নে সাহায্য করে এবং গাছে ফল ধারণ বেশি হয় ও গাছ প্রতি ফলন বাড়ে।

(৮) হরমোন প্রয়োগ (Application of hormones) ঃ গাছে হরমোনের অসাম্যতার জন্য ফুল-ফল ঝরে পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন NAA অত্যন্ত কম মাত্রায় গাছে প্রয়োগে ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করে, ফল ঝরা রোধ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফলের আকার আকৃতি বৃদ্ধি করে।

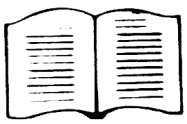

সারমর্ম ঃ জমিতে চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত ফল গাছের যত্ন নেয়ার জন্য যেসব কাজ করা হয় সেগুলোকে আন্ত পরিচর্যা বলে। যেমন– আগাছা দমন, আন্ত কর্ষণ, সেচ, পানি নিষ্কাশণ, সার প্রয়োগ, অঙ্গঁ ছাটাই, সাথী ফসলের চাষ, রোগ বালাই দমন ইত্যাদি। ফল গাছ বিভিন্ন কারণে অফলন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন বাগানে বিপরীত লিঙ্গেঁর গাছ জন্মান, কৃত্রিম পরাগায়ন, উপযুক্ত পরিচর্যা, সুষম সার ব্যবহার, গাছের শর্করা ও নাইট্রোজেনের সঠিক অনুপাত সংরক্ষণ, শিকড় ছাটাই, বাকল ছাটাই, হরমোন প্রয়োগ, ইত্যাদি গ্রহণ করে অফলন্ত গাছকে ফলন্ত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিম্ন লিখিত কোন্‌টি আন্ত পরিচর্যা নয়?
- (ক) আগাছা দমন
- (খ) সেচ
- (গ) গাছ রোপণ
- (ঘ) অঙ্গ ছাটাই

২। কোনো গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি ফল না দেয় তাকে কী বলে?
- (ক) ফলন্ত গাছ বলে
- (খ) অফলন্ত গাছ বলে
- (গ) ফলবহনকারী গাছ বলে
- (ঘ) উপরের কোনোটিই সঠিক নয়

৩। নিচের কোন্‌টি অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের উপায় নয়?
- (ক) শিকড় ছাটাই
- (খ) বাকল ছাটাই
- (গ) ফুল-ফল পাতলাকরণ
- (ঘ) ট্রেনিং

পাঠ ৫.২ ফসল পর্যায় ও সাথী ফসলের চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফসল পর্যায় কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল চাষে ফসল পর্যায়ের ব্যবহার ব্যাখা করতে পারবেন।
- সাথী ফসল কী তা ব্যাখা করতে পারবেন।
- ফল চাষে সাথী ফসলের চাষ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

ফসল পর্যায়

ফল চাষে ফসল পর্যায় ও সাথী ফসলের চাষ করা হয়ে থাকে। তবে ফসল পর্যায় ব্যবহার করা হয় স্বল্প মেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে। কিন্তু সাথী ফসলের চাষ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উভয় ধরনের ফল চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জমিতে চাষ করাকে ফসল পর্যায় বলা হয়।

একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে জমিতে চাষ করাকে ফসল পর্যায় বলে।

ফসল পর্যায় কেন ব্যবহার করা হয়?

বিভিন্ন ফসলের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রকম। কিছু কিছু ফসল মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান আহরণ করে। অপর দিকে কিছু কিছু ফসল অল্প পরিমাণ খাদ্য উপাদান মাটি থেকে আহরণ করে। আবার কিছু ফসল আছে যেগুলো মাটি থেকে বিশেষ উপাদান প্রচুর পরিমানে আহরণ করে। ফলে মাটিতে ওই উপাদানের অভাব দেখা যায়। তাছাড়া কিছু কিছু ফসল মাটির উপরের স্তর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে। অপর দিকে কোনো কোনো ফসল মাটির খুব গভীর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে। এ ছাড়াও বিশেষ কোনো ফসলের সাথে বিশেষ বিশেষ আগাছা জন্মানো এবং পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই আক্রমনের সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য দেখা যায় যে একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল জন্মালে মাটিতে বিশেষ কোনো খাদ্য উপাদানের অভাব দেখা যায়। সাথে সাথে বিশেষ আগাছা, পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ জন্য মাটির উর্বরতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বেশি করে ফসল উৎপাদন এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য জমিতে ফসল পর্যায় ব্যবহার করা হয়।

ফসল পর্যায়ের মূলনীতি

জমিতে ফসল পর্যায় গ্রহণ করতে কিছু মৌলিক নিয়মাবলী গ্রহণ করা উচিত। ফসল পর্যায় গ্রহণের মৌলিক নীতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

ফসল পর্যায়ের মূলনীতি হলো বেশি খাদ্য উপাদান গ্রহণকরী গাছের পর কম খাদ্য উপাদান গ্রহণকারী গাছের চাষ, গভীর মূলী ফসলের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ, অধিক চাষ পছন্দকারী ফসলের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ, জমি কিছু দিনের জন্য খালি রাখা, সবুজ সারের চাষ, স্থানীয় জলবায় , শ্রমিক প্রাপ্যতা ইত্যাদি।

১। যে সকল ফসল মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে (Gross feeder) সেগুলোর পরে যে সব ফসল অল্প খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে (Poor feeder) সেগুলোর চাষ করতে হবে।

২। যে সকল ফসল মাটির গভীর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে সে সকল ফসল চাষের পর যে সকল ফসল মাটির উপরের স্তর থেকে খাবার গ্রহণ করে সে সকল ফসলের চাষ করতে হবে। অর্থাৎ গভীর মূলী ফসল চাষের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ করতে হবে।

৩। অধিক চাষ পছন্দকারী ফসল চাষের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ করতে হবে।

৪। জমিতে অনবরত ফসল চাষ না করে ২-৩ বৎসর পর কমপক্ষে এক মৌসুমের জন্য খালি রাখতে হবে।

৫। জমিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সবুজ সার চাষ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬। স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, শ্রমিক-প্রাপ্যতা, বাজার ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ফসল পর্যায়ের জন্য ফসল নির্বাচন করতে হবে।

৭। ফসল পর্যায় তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খামারের শ্রমিকদের সঠিকভাবে সঠিক সময়ে কাজ দেয়া যায়।

সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদী ফসল যেমন আম, জাম, কাঠাল, নারিকেল ইত্যাদি ৫০-৬০ বৎসর মাঠে থাকে বিধায় এসব ফসল চাষের ক্ষেত্রে ফসল পর্যায় ব্যবহার করা কঠিন। কিন্তু স্বল্প মেয়াদী ফসল যেমন কলা, পেপে, তরমুজ, আনারস প্রভৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট ফসল পর্যায় ব্যবহার করা উচিত। সারণি ১-এ আহমেদ (১৯৭৬) এর মতানুযায়ী উচ্চ জমিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের একটি ফসল পর্যায়ের নমুনা দেয়া হলো।

সারণি ১ঃ একটি ফসল পর্যায়ের নমুনা

শস্য	সময়
কলা (১ বৎসর)	বৈশাখ(১ম বছর) - বৈশাখ (২য় বছর)
সবুজ সার (৩ মাস)	জৈষ্ঠ্য (২য় বছর)- শ্রাবণ (২য় বছর)
আনারস (২ বৎসর)	ভাদ্র (২য় বছর)-শ্রাবণ (৪র্থ বছর)
মুড়ি আনারস (১ বৎসর)	শ্রাবণ (৪র্থ বছর)-ভাদ্র (৫ম বছর)
শীতকালীন সবজী বা ডাল (৬ মাস)	আশ্বিন (৫ম বছর)-ফাগুন (৫ম বছর)
পেঁপে (১ বৎসর)	চৈত্র (৫ম বছর)-চৈত্র (৬ষ্ঠ বছর)

সাথী ফসল

প্রধান ফসলের মাঝে যখন কোনো অস্থায়ী ফসল চাষ করা হয় তখন অস্থায়ী ফসলটিকে সাথী ফসল বা আন্ত ফসল বলে। সাথী ফসল চাষে বাগান থেকে স্বল্প সময়ে কিছু আগাম উপার্জন করা যায়।

যখন কোনো প্রধান ফসলের মাঝে কোনো অস্থায়ী ফসল চাষ করা হয় তখন এ অস্থায়ী ফসলটিকে সাথী ফসল বা আন্ত ফসল বলা হয়। ফল বাগানে গাছ লাগানোর পর এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বেশ কিছু সময়ের দরকার হয়। যার দরুন দু-গাছের মাঝখানের জমি খালি থাকে। এ খালি জমিতে অস্থায়ী ফসল লাগিয়ে বাগান থেকে কিছু আগাম উপার্জন করা যায়। এ অস্থায়ী ফসলটি হলো সাথী ফসল। যেমন কলা ও পেঁপে বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, সরিষা ও ডালজাতীয় সাথী ফসলের চাষ করা হয়। অপর দিকে দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের বেলায় কলা, পেঁপে, লেবু, আনারস ইত্যাদি ফলজাতীয় গাছকে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়।

সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়মাবলী

সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়ম হলো- সাথী ফসল মূল ফসলের সাথে পানি ও খাদ্য উপাদানের জন্য প্রতিযোগিতা করবে না, পোকা মাকড় বা রোগ বালাইকে আশ্রয় দিবেনা, আন্ত পরিচর্যায় বাধা দিবেনা, মূল ফসলের ফুল-ফল ধারনে কোন ক্ষতি করবে না।

১। সাথী ফসল কোনো সময়ই মূল বা প্রধান ফসলের সাথে পানি ও খাদ্য উপাদনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।

২। সাথী ফসল বাগানে পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে না।

৩। সাথী ফসল মূল ফসলের জন্য আন্ত পরিচর্যা যেমন- প্রুনিং, সেচ, ঔষধ ছিটানো, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

৪। মূল ফসলের ফুল-ফল ধারণে সাথী ফসল কোনো ক্ষতি করবে না।

৫। সাধারণভাবে সাথী ফসল হিসেবে বহুবর্ষজীবী ফসল অপেক্ষা একবর্ষজীবী ফসলকে প্রধান্য দেয়া উচিত

৬। যেহেতু ফল বাগান থেকে আগাম আর্থিক সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাথী ফসল চাষ করা হয় সেহেতু সাথী ফসল হিসেবে তুলনামুলকভাবে দামী ফসলকে নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় বাজারে চাহিদা ও দামের ওপর নির্ভর করে সাথী ফসল নির্বাচন করা উচিত।

৭। সাধারণভাবে লিগিউম বা সীম জাতীয় ফসল যাদের ভালো বাজার মূল্য আছে সেগুলোর চাষ করা উচিত। কারণ সীম জাতীয় ফসল আর্থিক সহায়তার সাথে সাথে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়।

৮। সাথী ফসল ম ল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কেটে ফেলতে হবে। আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদী ফল বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি, তেল ও ডালজাতীয় ফসলের চাষ করা হয়। অন্য দিকে দীর্ঘ মেয়াদী ফল বাগানে স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ যেমন, পেঁপে কলা, আনারস লেবু, আতা, শরীফা, ইত্যাদি ফলের চাষ করা হয়।

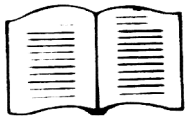

সারমর্ম ঃ একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করাকে ফসল পর্যায় বলে। ফসল পর্যায় তৈরি করার সময় কিছু মৌলিক নীতি অবলম্বন করা হয়। যেমন– প্রচুর খাদ্য উপাদান গ্রহণকারী ফসলের পর কম খাদ্য উপাদান গ্রহণকারী ফসলের চাষ, গভীর মূলী ফসলের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ, বেশি চাষ পছন্দকারী ফসলের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ, ২-৩ বৎসর পর জমি কম পক্ষে এক মৌসুমের জন্য খালি রাখা, জমিতে সবুজ সারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কোনো দীর্ঘ মেয়াদী ফসলের মাঝে স্বল্প মেয়াদী ফসলের চাষ করলে,

স্বল্প মেয়াদী ফসলকে সাথী ফসল বা আন্ত ফসল বলা হয়। সাথী ফসল কখনই মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না, পোকা মাকড়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে না ইত্যাদি নীতি মেনে চলা উচিত। মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সাথী ফসল সরিয়ে ফেলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। একই জমিতে একই ফসল চাষ না করে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করাকে কী বলা হয়?
- ক) ফসল পর্যায় বলে
- খ) আন্ত ফসল বলে
- গ) সাথীফসল বলে
- ঘ) আন্ত কর্ষণ বলে

২। কোন্‌টি ফসল পর্যায়ের নীতি নয়?
- ক) গভীর মূলী ফসলের পর অগভীর মূলী ফসলের চাষ।
- খ) বেশি চাষ পছন্দকারী ফসলের পর কম চাষ পছন্দকারী ফসলের চাষ।
- গ) জমিতে সবুজ সার চাষের ব্যবস্থা করা।
- ঘ) একই জমিতে একই ফসলের বার বার চাষ করা।

৩। সাথী ফসল কীভাবে চাষ করা হয়?
- (ক) প্রধান ফসলের সাথে চাষ করা হয়।
- (খ) দুই ফসলের মাঝের সময়ে চাষ করা হয়।
- (গ) মূল ফসল জমিতে লাগানোর পূর্বে চাষ করা হয়।
- (ঘ) মূল ফসল জমিতে চাষের পরে চাষ করা হয়।

৪। সাথী ফসল জমি থেকে কখন সরিয়ে ফেলতে হবে?
- (ক) যখন প্রধান ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করবে না।
- (খ) যখন মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।
- (গ) যখন এক বৎসর বয়স হবে।
- (ঘ) যখন পাঁচ বৎসর বয়স হবে।

পাঠ ৫.৩ ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ফলের পরিপক্কতা ও পাকার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- ফল বাছাই কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল বাজারজাতকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

ফলের পরিপক্কতা (Maturity)

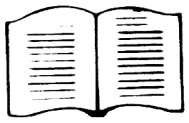

ফল যথাযথ পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের পর তা ভালোভাবে বাছাই করতে হবে। বাছাইয়ের সময় কাটা ফাটা বা থেতলানো ফল আলাদা করে ফেলতে হবে। তারপর ভালো ফল আকার অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে বাজারজাত করতে হবে।

ফল যখন আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে তখন তাকে পরিপক্কতা বলে।

ফলের পরিপক্কতা এমন একটি অবস্থা যখন ফল আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে অর্থাৎ এর পর ফল আর আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় না। কিছু লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরূপণ করা যায়। এই লক্ষণগুলোকে ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ বা গধঃৎরঃু রহফবী বলা হয়। ফল ধারন থেকে দিবস সংখ্যা, আকার, আকৃতি, রং, বুনট, আপেক্ষিক গুরুত্ব, ষ্টার্চের পরিমাণ, দ্রবণীয় শক্ত পদার্থ, চিনি অত্নর হার এবং চর্বির পরিমাণ ইত্যাদি পরিপক্কতার লক্ষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ফল পাকা (Ripening of fruits)

ফল পাকার অর্থ হলো পরিপক্কতার পর ফলের গুণগত পরিবর্তন যার মাধ্যমে ফল ভক্ষণযোগ্য বা খাবার উপযোগী হয়। ফল পাকার সাথে সাথে ফলের রং, গন্ধ ও বুনটের পরিবর্তন হয় যার দরুন ফল ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

ফল সংগ্রহ

ফল যথাযথভাবে পরিপক্ক হলে গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে ফল আঘাত না পায় বা থেতলিয়ে না যায়।

ফল পরিপক্ক হলে পরেই তা গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করলে গুণাগুণ বজায় থাকে না। এ জন্য চাষীরা ফলের সঠিক মূল্য পায় না। আমাদের দেশে সাধারণত মই, ঝুড়ি, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দ্বারা গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়। গাছ থেকে সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফল আঘাত না পায় বা থেতলিয়ে না যায়। যে সব ফল সংগ্রহকারীর নাগালের বাইরে থাকে সেগুলো উচু মই বা প্লাট ফরম মই ব্যবহার করে সংগ্রহ করা উচিত। হাত দ্বারা ফল সংগ্রহের সময় বোটাসহ ফল পাড়া উচিত।

ফল বাছাই

বাজারে ফলের ভালো দাম পেতে হলে খারাপ ও ভালো ফল বাছাই করে নিতে হবে। এরপর ভালোগুলো আকার ও মান অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।

ফল সংগ্রহের সময় কেটে, ফেটে অথবা থেতলিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও ফল সংগ্রহের সময় ছোট, মাঝারী, বড়, পাকা, কাচা বা অতিরিক্ত পাকা প্রভৃতি ফল একসঙ্গে সংগ্রহ করা হয়। আঘাত প্রাপ্ত বা অতিরিক্ত পাকা ফল বাছাই না করলে ভালো ফলও বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে যেতে পারে। এ জন্য গাছ থেকে সংগ্রহের পর পরই ভালো ফলকে আঘাত প্রাপ্ত ফল থেকে বাছাই করে নিতে হবে। বাছাইয়ের পর ফলের আকার ও মান অনুযায়ী ফল শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। কারণ ভালো ফল বেশি অর্থায়নে সাহায্য করে।

ফল বাজারজাতকরণ (Marketing of fruits)

আমাদের দেশে ফল বাজারজাতকরণ একটি জটিল ব্যবস্থা। এ দেশে ফল বাজারজাতকরণের প্রধান সমস্যা হলো মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের প্রভাব, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব, ফল গুদামজাতকরণের অভাব ইত্যাদি।

আমাদের দেশে ফল বাজারজাতকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। ফল সংগ্রহ করার পর ঠিকভাবে বাজারজাত করতে না পারলে ফল চাষীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন। ফলকে সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করতে পারলে ফল চাষী এবং ভোক্তা উভয়েই লাভবান হন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু ফল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যার দরুন চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফলের সঠিক মূল্য পান না। অপর দিকে ভোক্তাদের অধিক মূল্যে ফল কিনতে হয়। এর জন্য ফল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি যেমন দালাল, ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রভাব, সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ফলের সুষ্ঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অভাব, ফল গুদাম জাতকরণের অভাব ইত্যাদি কারণ দায়ী। ফল বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নতকরনের জন্য সঠিক জাতের ফল উৎপাদন করতে হবে, ফল সংগ্রহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে, ফল চাষীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করতে হবে, ফল চাষে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, উৎপাদন এলাকার সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে, রেলওয়ে, ট্রাক, ষ্টীমার ইত্যাদিতে হিমাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ফড়িয়া, দালাল ইত্যাদি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। অন্যান্য ফসলের ন্যায় ফলের ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য প্রচার মাধ্যম তথা খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে প্রচারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ফল বহনকারী যানবাহন সম হকে হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদির বাইরে রাখতে হবে। সর্বোপরি ফলজাত দ্রব্য তথা জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশ, শরবত ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

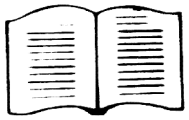

সারমর্ম ঃ ফল যখন আকার আয়তন ও বয়সে সর্বশেষ স্তরে পৌছে তখন তাকে পরিপক্কতা বলা হয়। পাকা ফল বলতে আমরা সেই ফলকে বুঝি যেটি পরিপক্কতার পর গুণগত পরিবর্তনের দরুন খাবার উপযোগী হয়। যে সকল লক্ষণ দেখে ফল পরিপক্ক হয়েছে বোঝা যায় সেই সকল লক্ষণকে পরিপক্কতার লক্ষণ বলা হয়। পরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত। সংগ্রহের পর ফল বাছাই করে মান অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে হয়। ফল বাছাই ও শ্রেণিবিন্যাসের পরবর্তী স্তর হলো বাজারজাতকরণ। আমাদের দেশে ফল বাজারজাতকরণ খুব জটিল প্রক্রিয়া এবং দালাল, ফড়িয়া ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমবায় ব্যবস্থা, ফল চাষের জন্য ঋণ, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা, হিমাগার স্থাপন, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রভাব খর্ব করা, আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফলজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে ফল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ অবস্থায় ফলকে পরিপক্ক বলা যাবে?
- ক) ফল যখন আকারে আর বৃদ্ধি পায় না
- খ) ফলের যখন রং বদলায়
- গ) ফল যখন আয়তনে আর বৃদ্ধি পায় না
- ঘ) ফল যখন আকারে ও আয়তনে আর বৃদ্ধি পায় না

২। কোন্ অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা উচিত?
- ক) নিজে নিজেই গাছ থেকে ফল পড়ে যেতে থাকলে
- খ) ফলের রং বদলাতে থাকলে
- গ) কিছুটা অপরিপক্ক অবস্থায়
- ঘ) সম্পর্ন পরিপক্ক অবস্থায়।

৩। ফল বাছাই এর ক্ষেত্রে কোন্ বাক্যটি প্রযোজ্য?
- ক) ফল সংগ্রহের পর সব ফলকে একত্রে রাখা হয়।
- খ) ফল বাছাই করলে বেশী লাভবান হওয়া যায় না।
- গ) ফল বাছাই না করলে ভালো ফলও রোগাক্রান্ত হয়।
- ঘ) ফল পারার আগেই বাছাই করতে হবে।

শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক) যে লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরূপণ করা হয় তাকে ..... লক্ষণ বলা হয়।

খ) পরিপক্কতার পর ফলের গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ফল যখন ভক্ষণযোগ্য হয় তাকে ফল ..... বলে।

গ) ..... ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা উচিত।

ঘ) বাছাইয়ের পর ..... ও ..... অনুযায়ী ফলে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।

পাঠ ৫.৪ সংগ্রহোত্তর ফলের শারীরবৃত্তীয় ও সংরক্ষণের নীতিমালা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সংগ্রহোত্তর ফলের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় দিকসমুহ আলোচনা করতে পারবেন।
- ফল সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

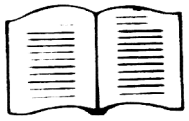

সংগ্রহোত্তর ফলের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় দিক (Post harvest physiology of fruit) ঃ

ফল পরিপক্কতার পর তা গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক ফল সংগ্রহের পর ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের সাথে সাথে ফল খাবার উপযোগী হয়। গাছের সংগ্রহোত্তর শারীরবৃত্তীয় দিকের মধ্যে অন্যতম হলো শ্বসন। শ্বসনের মাধ্যমে ফলের সরল সুগার জারিত হয়ে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড এবং তাপের সৃষ্টি করে। প্রায় সব ফল পাকার সাথে সাথে শ্বসন বাড়ে। পাকার সময় শ্বসনের হার অনুযায়ী ফলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো-

(ক) ক্লাইমেকটারিক ফল- এ সব ফল পাকার সময় হঠাৎ শ্বসনের হার বেড়ে যায় এবং ফল বার্ধক্যে উপনীত ও নষ্ট হয়ে পড়ে। কলা, পেঁপে, আম, পেয়ারা, কাঠাল, ডুমুর, সফেদা ইত্যাদি ক্লাইমেকটারিক ফলের উদাহরণ।

(খ) নন-ক্লাইমেকটারিক ফল- পাকার সাথে সাথে শ্বসনের হার আস্তে আস্তে কমে। লিচু, আনারস, আঙ্গুর, ডালিম, এলাচী, লেবু, পাতি লেবু, কমলা লেবু ইত্যাদি নন ক্লাইমেকটারিক ফলের উদাহরণ। শ্বসনের হার কোনো ফলের সংগ্রহোত্তর আয়ুষ্কাল নির্ণয়ের একটি অন্যতম পরিমাপক। সংগ্রহোত্তর ফলের আয়ুষ্কাল বাড়ানোর জন্য অবশ্যই শ্বসনের হার কমাতে হবে।

ফল পাকা (Fruit ripening) ঃ

ফল পাকার সাথে সাথে এর গুণগত পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ, পেক-টিনস, কার্বোহাইড্রেটস, এসিডস এবং ফেনোলিকস পরিবর্তিত হয়।

গাছে থাকা অবস্থায় অথবা সংগ্রহের পর ফল পাকতে পারে। ফল পাকা শুরুর সাথে সাথে ফলের গুণগত পরিবর্তন যেমন রং, গন্ধ এবং বুনট পরিবর্তিত হয়ে তা ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। এ সব গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ফলের গঠনের পরিবর্তন ঘটে। যেমন রঞ্জক পদার্থ, পেকটিনস, কার্বোহাইড্রেটস, এসিডস, ফেনোলিকস প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়। পরিপক্ক ফল স্বাদে এবং গন্ধে ভালো হয়। এ জন্য পরিপক্ক ফল গাছ থেকে পাড়া উচিত। পাকার পর ফল তার নিজস্ব রং ধারণ করে। অদ্রবণীয় প্রো-প্রেকটিন দ্রবণীয় পেকটিনে রূপান্তরিত হয়ে ফল নরম হয়। ফল পাকার সময় ষ্টার্চ ভেঙ্গে সরল চিনি যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, সুক্রোজ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হওয়ার দরুন ফল মিষ্টি হয় এবং একই সাথে ফলে জৈব এসিড ও ফেনোলিক্সের পরিমাণ কমে। যার দরুন ফলের ম্লত্ব ও কসলাভাব (Astringency) কমে এবং ফল ভোক্তার নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ফল পাকার সময় কিছু সুগন্ধযুক্ত উদ্বায়ু পদার্থ তৈরি হয় যা ফলকে তার নিজস্ব গন্ধ দেয়।

ইথিলিন

ইথিলিন ফল পাকানোর হরমোন হিসেবে পরিচিত। ফল পরি-পক্কতার সাথে সাথে প্রচুর পরিমান ইথিলিন তৈরি হয় এবং ফল পাকা ত্বরান্বিত করে।

ইথিলিন ফল পাকানোর হরমোন হিসেবে পরিচিত। এটি একটি সরল জৈব পদার্থ যা গাছের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এক বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং গাছের প্রায় সব টিস্যুতে এটি উৎপাদিত হয়। ইথিলিন প্রয়োগের মাধ্যেমে ফল পাকানো একটি পুরাতন পদ্ধতি। পরিপক্কতার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ ইথিলিন উৎপাদিত হয় যা ফলের স্বসন ও পাকানোকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ থেকে ইথিলিন উৎপাদিত হয় যেগুলো ব্যবহার করে ফল- পাকানা ত্বরান্বিত করা যায়। ইথরেল, ইথিফন ইত্যাদি ইথিলিন উৎপাদনক্ষম রাসায়নিক যৌগ ছিটিয়ে ফল পাকানো যায়।

ফল সংরক্ষণের নীতিমালা

ফলকে সাধারণত দুই ভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা (১) অস্থায়ী সংরক্ষণ এবং (২) স্থায়ী সংরক্ষণ।

১। অস্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ নিচে বিস্তারিতভাবে দেয়া হলোঃ

ক) নিম্ন তাপমাত্রা ঃ নিম্ন বা কম তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করলে ফলের ভিতর শ্বসন, প্রশ্বেদন ও এনজাইমিক কার্যক্রম কম হয়। সাথে সাথে রোগজীবাণু তথা বিভিন্ন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি কমে যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রায় ফল ১-২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রার সাথে সাথে আর্দ্রতা বাড়ালে ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

ফলকে অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। নিম্ন তাপমাত্রা, জীবাণুনাশক ব্যবহার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পাস্তুরাইজেশন ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে ফল অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

খ) জীবাণুনাশক ব্যবহার ঃ চিনি, লবণ এবং ভিনেগারের হালকা দ্রবণ ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

গ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ ফল ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখলে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কমে এবং ফল অধিক সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায়।

ঘ) পাস্তুরাইজেশন বা পাস্তুরিকরণ (Pasteurization)t ফলের রস এবং পানীয় ৮০° সে. তাপমাত্রায় পাস্তুরীকরণ করে ৩-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

২। স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নীতিমালাসমূহ নিচে দেয়া হলো ঃ

ফলজাত বিভিন্ন দ্রব্য ১-৩ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। স্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের নীতিমালা ও পদ্ধতি নিচে দেয়া হলোঃ

ক) চিনি, লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার ঃ বিভিন্ন পরিমাণে চিনি, লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার করে ফল সংরক্ষণ করা যায়। যে কোনো ধরনের ফলজাত দ্রব্য যাতে ৬৫% এর উপরে চিনি থাকে তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। জ্যাম, জেলী ইত্যাদি এ পদ্ধতি ও নীতি ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয়।

র) লবণ ঃ শতকরা ১৫-২০% ভাগ লবণের দ্রবণ ব্যবহার করে ফলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। লেবু, আম ইত্যাদির আচার এ নীতি অবলম্বন করে সংরক্ষণ করা হয়।

রর) ভিনেগার ঃ শতকরা ১-৪ ভাগ এসিটিক এসিডের দ্রবণ ব্যবহার করে ফলজাত দ্রব্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

খ) বিভিন্ন সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার (Use of preservatives) ঃ পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট, সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট এবং সোডিয়াম বেনজয়েট ইত্যাদি সংরক্ষণ-কারী দ্রব্য ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে ফলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়।

বিভিন্ন ফলজাত দ্রব্য ১-৩ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। চিনি, লবণ, ভিনেগার, বিভিন্ন সংরক্ষণকারী দ্রব্য, পানির পরিমান হ্রাস, গাজানো, টিনজাতকরণ, ডীপ ফ্রিজিং ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে ফল স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

গ) শুকিয়ে বা পানির পরিমাণ কমিয়ে সংরক্ষণ ঃ বিভিন্ন ফল বা ফলজাত দ্রব্যকে একেবারে শুকিয়ে বা পানির পরিমাণ কমিয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন কিসমিস, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম ইত্যাদি শুকিয়ে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

ঘ) গাজানো (Fermentation) ঃ বিভিন্ন ধরনের উপকারী ইষ্ট (yeast) ব্যবহার করে ফলের রসকে গাজিয়ে মদ অথবা ভিনেগার তৈরি করা হয় যা অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ঙ) টিনজাত করা (Canning) ঃ ভালোভাবে টিনজাত করলে ফলকে ১-৩ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে টাটকা ফলকে চিনির দ্রবণে টিনজাত করা হয়। আম, আনারস, লিচু, পীচ, নাশপাতি ইত্যাদি ফল টিনজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত টিনজাত করার পর জীবাণুমুক্ত করার জন্য তা পাস্তুরাইজেশন করা হয়।

চ) **ডীপ ফ্রিজিং ঃ** ফল বা ফলজাত দ্রব্যকে অত্যন্ত ঠান্ডা তাপমাত্রায় অর্থাৎ ২০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

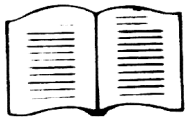

সারমর্মঃ সংগ্রহোত্তর ফলে বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। সংগ্রহোত্তর ফলে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে শ্বসন অন্যতম। শ্বসনের ওপর নির্ভর করে ফলসম হকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো ক্লাইমেকটারিক ফল ও নন-ক্লাইমেকটারিক ফল। পরিপক্ক ফল সংগ্রহের পর পাকতে শুরু করে। ফল পাকার সাথে সাথে এর গুণগত পরিবর্তন যেমন রং, গন্ধ ও বুনট পরিবর্তিত হয়। ইথিলিন ফল পাকার হরমোন হিসেবে পরিচিত। ফল পরিপক্কতার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন উৎপাদিত হয় যা ফলের শ্বসন ও পাকানোকে ত্বরান্বিত করে। ফল সাধারণত অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অস্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের নীতিমালা হলো নিম্ন তাপমাত্রা, জীবাণুনাশক ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পাস্তুরাইজেশন। স্থায়ীভাবে ফল সংরক্ষণের পদ্ধতি হলো- চিনি, লবণ ও ভিনেগার ব্যবহার, বিভিন্ন সংরক্ষণকারী দ্রব্যের ব্যবহার, পানির পরিমাণ কমানো, গাজানো, টিনজাত করা ও ডীপ ফ্রিজিং বা অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকার সময় শ্বসনের হার অনুযায়ী ফলকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
- ক) চার ভাগে
- খ) দুই ভাগে
- গ) তিন ভাগে
- ঘ) ছয় ভাগে

২। ফল পাকার সময় ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে নিচের কোন্‌টি সঠিক?
- ক) ফেনোলিকসের পরিমাণ কমে ও শুক্রোজের পরিমাণ বাড়ে।
- খ) ফেনোলিকসের পরিমাণ বাড়ে ও গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে।
- গ) জৈব ফেনোলিকসের পরিমাণ বাড়ে ও জৈব এসিডের পরিমাণ বাড়ে।
- ঘ) ফেনোলিকস, গ্লুকোজ ও জৈব এসিডের পরিমাণ বাড়ে

৩। টিনজাত ফল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সঠিক?
- ক) ১-২ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়
- খ) ১-৩ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়
- গ) ১-৪ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়
- ঘ) ১-৫ বৎসর পর্যন্ত রাখা যায়

৪। ফলের রস এবং পানি পাস্তুরাইজেশনের তাপমাত্রা কোন্‌টি?
- ক) ৮০° সেলসিয়াস
- খ) ৯০° ”
- গ) ১০০° ”
- ঘ) ১২০° ”

৫। ফল পাকানোর হরমোন কোন্‌টি?
- ক) ইনডোল এসিটিক এসিড
- খ) নেপথোলিন এসিটিক এসিড
- গ) জিবারাইলিক এসিড
- ঘ) ইথিলিন

পাঠ ৫.৫ তাজা ফল সংরক্ষণ পরিবেশ ও পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- তাজা ফল সংরক্ষণের পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- তাজা ফল সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

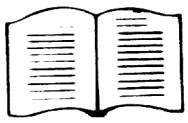

তাজা ফল সংরক্ষণ পরিবেশ

তাজা ফল গুদামজাতকরণের জন্য গুদামে বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হয়। তাজা ফল গুদামজাতকরণের পরিবেশগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাজা ফল গুদামজাতকরণের জন্য তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলোঃ

তাপমাত্রা ঃ তাজা ফল সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণে তাপমাত্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাপমাত্রা নির্ভর করে জাত, ফল সংগ্রহের সময়, পরিপক্কতা, ফল সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়, ক্লাইমেকটারিক, মৌসুমীয় পরিবর্তন ইত্যাদির ওপর । সাবধানে ফল সংগ্রহ, শক্ত কিন্তু যথাযথ বাতাস চলাচল সম্পন্ন প্যাকিং ইত্যাদি তাজা ফল গুদামজাতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফল সাধারণত কম তাপমাত্রায় গুদামজাত করা হয়। কারণ কম তাপমাত্রার ফলে প্রশ্বেদন, শ্বসন, বাস্পীভবন এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী কম হয়। অন্য দিকে নিু তাপমাত্রায় বিভিন্ন ক্ষতিকর ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার কার্যাবলী কমে যায়। যার দরুন ফলের সংরক্ষণ সময় বাড়ে।

তাজা ফল সংরক্ষণে আর্দ্রতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তাজা ফল সংরক্ষণ করা হয়।

আর্দ্রতাঃ তাজা ফল সংরক্ষণে আর্দ্রতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তাজা ফল সংরক্ষণ করা হয়। অধিক আর্দ্রতায় তাজা ফলে প্রশ্বেদন ও বাস্পীভবন কম হয়। অন্যদিকে আর্দ্রতা কমার সাথে অধিক প্রশ্বেদন ও বাস্পীভবনের জন্য ফলের ওজন কমে যায় এবং চামড়া কুচকে যায়। এজন্য ফল ভোক্তার আকর্ষণ হারায়।

মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাঃ গুদামে কার্বন-ডাই-আক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ফলের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে পড়ে। সাধারণত শ্বসনের জন্য গুদামে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে। অধিকাংশ ফলের ক্ষেত্রে গুদামে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ১% এর নিচে হওয়া উচিত। এ জন্য গুদামে যেন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ না বাড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং গুদামে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফল সংগ্রহের পর থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অন্যতম করণীয় কাজ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাঃ ফল সংগ্রহের পর থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অন্যতম করণীয় কাজ। গুদাম অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যেন রোগজীবাণু গুদামে বাসা বাধতে না পারে। এজন্য গুদামে ফল সংরক্ষণের পূর্বে ফল এবং গুদাম উভয়ই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে অথবা গরম পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া ভালো। যেমন আম ৫৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২ মিনিট রাখলে সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

তাজাফল সংরক্ষণের পদ্ধতি

বাংলাদেশে ফলের মৌসুমে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর পরিমাণ ফল নষ্ট হয়। অপর দিকে মৌসুম শেষে ফলের প্রাপ্যতা কমে যায় এবং অনেক সময় ফল দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। এ জন্য ফল যেন সব সময় পাওয়া যায় এবং সহজে নষ্ট না হয় সেজন্য ফল গুদামজাত করা হয়। গুদামজাতকরণের প্রাথমিক সুবিধা হলো ফলের শ্বসন, প্রশ্বেদন, ফল পাকা এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ও বিভিন্ন রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণ করে ফল অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। যার দরুন ফল ভোক্তার নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

রেফ্রিজারেটর ও ডীপ ফ্রীজ (Refrigerator and Deep freeze) ঃ অল্প পরিমাণ ফল সংরক্ষণে এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। এ পদ্ধতিতে সাধারণ ফ্রীজে অথবা ডীপ ফ্রীজের ঠান্ডা তাপমাত্রায় অনেক দিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রার ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী কমে যায়। সাথে সাথে রোগ জীবাণুর আক্রমণ কম হওয়ার ফলে পচন ধরেনা। বাড়ীতে খাওয়ার জন্য ফল সংরক্ষণে এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের জন্য তা পরিপক্ক, রোগ জীবাণু মুক্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

হিমাগারে কম তাপমাত্রায় ও বেশি আর্দ্রতায় ফল সংরক্ষন করা হয়।

হিমাগার (Cold storage) ঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে গুদামের তাপমাত্রা কমিয়ে একটি আকাংখিত লেভেলে আনা হয়। সাথে সাথে ফল থেকে যেন প্রশ্বেদনের মাধ্যমে পানি হ্রাস না পায় সেজন্য গুদামে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ানো হয়। যার দরুন হিমাগারে অনেকদিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। তবে গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ওপর ফলের স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে। গুদামের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নির্ভর করে বিভিন্ন ফলের ওপর। সারণি ২-এ কয়েকটি উষ্ণমন্ডলীয় ফলের গুদামজাতকরণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও স্থায়িত্বকাল দেয়া হলোঃ

সারণি ২ঃ কয়েকটি উষ্ণমন্ডলীয় ফলের গুদামজাতকরণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও স্থায়িত্বকাল

ফল	তাপমাত্রা (° সে.)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	গুদামে স্থায়িত্বকাল (সপ্তাহ)
আম	৮-১০	৮৫-৯০	৪
আনারস	৮-১০	৮৫-৯০	১-২
কলা	১৩	৮৫-৯০	১-৫
কাঁঠাল	১১-১৩	৮৫-৯০	৬
লিচু	২	৮৫-৯০	৮-১২
লেবু (কাগজী)	১১-১৩	৮৫-৯০	৮
লেবু (এলাচী)	৫-৭	৮৫-৯০	৬
বেল	৯	৮৫-৯০	১০-১২
পেঁপে	৮	৮৫-৯০	২-৩

আইস ব্যাংক কুলার (Ice Bank Cooler) ঃ এটি রেফ্রিজারেশনের উন্নত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খুব ঠান্ডা বাতাস ফলের বক্সের ওপর প্রবাহিত করা হয়। যার দরুন খুব তাড়াতাড়ি অধিক পরিমাণ তাপ কমানো যায়। তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার পর গুদামে ০.৫-০.৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৯৮% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ফল সংরক্ষণ করা হয়।

শৈত্যাঘাত (Chilling injury)

হিমাগারে সংরক্ষণের সময়ে অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় ফলের গঠনের পরিবর্তন হয় এবং অনেক সময় সংরক্ষিত ফলের মান কমে যায়। একে শৈত্যাঘাত বা Chilling injury বলা হয়। শৈত্যাঘাত গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফলে বেশি দেখা যায়। শৈত্যাঘাতের জন্য ফল সংরক্ষণে অথবা দূরবর্তী স্থানে প্রেরনের সময় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফলের চারদিকের আবহা-ওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রিত/রূপান্তরিত আবহাওয়া মন্ডল (Controlled/Modified Atomosphere)ঃ এ পদ্ধতিতে গুদামের বায়ুমন্ডল নিয়ন্ত্রণ করে ফল গুদামজাত করা হয়। এ জন্য ফলের চারিদিকে গ্যাস নিরোধক

আচ্ছাদন বা মোড়ক ব্যবহার করা হয। সাথে সাথে গুদামে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করা হয। রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহারে এ পদ্ধতি ফলের আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল, আমের জন্য এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের পরিবেশ হলো ৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৫% অক্সিজেন এবং ১৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। এ ছাড়াও পেঁপে, আনারস, কলা ইত্যাদি ফল গুদামজাতকরণে এ পদ্ধতি ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছে।

হাইপোবেরিক (Hypobaric) বা সাব এটমোসফেরিক (Sub atmospheric) সংরক্ষন পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে ফলকে সাধারণত বায়ুরোধী রেফ্রিজারেটেড পাত্রে রেখে পাত্রটি ভ্যাকুম-পাম্পের মাধ্যমে আকাংখিত বায়ু চাপে আনা হয়। শ্বসন হ্রাস ও ইথিলিন গ্যাস কম থাকার জন্য ফলের পাকা ও বার্ধক্য প্রাপ্তি হ্রাস পায়। যার দরুণ ফলের আয়ুষ্কাল বাড়ে। কিন্তু এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল ও জটিল হওয়ার দরুন খুব কম ব্যবহৃত হয়।

মোম আবৃতকরণ (Waxing)

প্রাকৃতিকভাবে ফল মোমজাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। যার দরুন ফল রোগজীবাণু দ্বারা পচন থেকে রক্ষা পায়। সাথে সাথে ফলে শ্বসন ও প্রস্বেদনও কম হয়। কিন্তু ফল সংগ্রহ, স্থানান্তর ও ধোয়ার সময় প্রাকৃতিক মোমের স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার দরুন ফল বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পচে যায়। এ জন্য যেখানে রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের সুবিধা নাই সেখানে ফলকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মোম দ্বারা আবৃত করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। আম মোমাবৃতকরণ করে সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

পলিথিন আবরণ (Polythene film)

পলিথিন আবরণ শ্বসন ও প্রস্বেদন হ্রাস করে। যার দরুন আঙুর, আম ও অন্যান্য ফল তাজা অবস্থায় পলিথিন ব্যাগে

বিভিন্ন ধরনের সেমিপার্মিয়েবল (Semipermeable) আবরন (film) মোড়ক হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফল গুদামজাতকরণে মোড়ক হিসেবে পলিথিনের ব্যবহার বেড়েছে। পলিথিন ব্যাগ শ্বসন ও প্রশ্বেদন হ্রাস করে। যার দরুন আঙুর, আম ও অন্যান্য ফল সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে পলিথিন ব্যাগের আবরণ বা মোড়ক ভালো বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার (Use of different chemicals) ঃ ছত্রাকনাশক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যেমন জিবারেলিক এসিড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ভার্মিকুলাইট, ম্যালিক হাইড্রাজাইড, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি ফল সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন ফল সংগ্রহের আগে ০.৬% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ১% ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ছিটানোর দরুন পেয়ারার সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সংগ্রহের পর ১০০০-২০০০ পিপিএম ম্যালিক হাইড্রাজাইডের দ্রবণে চুবালে আম দেরীতে পাকে।

বিকিরণ পদ্ধতির ব্যবহার (Use of radiation)

বিকিরণের মাধ্যমে রোগ জীবাণু ও পোকা মাকড় মারা যায় এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের জন্য ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

বিকিরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করা যায়। বিকিরণের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগজীবাণু ও পোকা মাকড় মারা যায়। সাথে সাথে ফলের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের জন্য তাজা ফলের সংরক্ষণকাল বাড়ে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বিকিরণ ব্যবহারে আম পাকানো হ্রাস করা যায়। ২৫-৩০ কিলোর‍্যাড বিকিরণ ব্যবহার করে কলার মান নষ্ট না করেও প্রাকৃতিকভাবে পাকার সময় বাড়ানো যায়। তবে এ পদ্ধতি আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় না। কারণ এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল এবং জটিল

বাষ্পীভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি (Evaporative Cooling-Cool Chambers)ঃ কোন তল (Surface) থেকে পানি বাষ্পীভবনের সাথে সাথে প্রচুর তাপ আর্দ্রতার সাথে চলে যায়। যার দরুন তলের তাপমাত্রা কমে। এ নীতিমালা ব্যবহার করে বাষ্পীভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি

বাষ্পীভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি ব্যবহারে প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা কমে এবং আর্দ্রতা বাড়ে। যার দরুন অস্থায়ীভাবে এ প্রকোষ্ঠে বেশ কিছু দিন ফল সংরক্ষণ করা যায়।

উদ্ভাবন করা হয়েছে। আসলে এ পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাচীন। খুব কম খরচে এবং দেশী সামগ্রী ব্যবহার করে বাষ্পীকরণ-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রকোষ্ঠের মেঝে এক সারি ইট দ্বারা তৈরি করা হয়। দেয়াল তৈরি করা হয় দুটো সারি ইট দ্বারা এবং দুই সারি ইটের মাঝে ৭.৫ সেঃমিঃ ফাঁকা জায়গা রাখা হয় যা বালি দ্বারা পূরণ করা হয়। প্রকোষ্ঠের উপরের ঢাকনা বাঁশের ফ্রেম দ্বারা তৈরি করা হয় এবং তা পাটের চট দ্বারা আবৃত করা হয়। ঠান্ডা প্রকোষ্ঠটি একবার পরিপ র্ণভাবে আর্দ্র হয়ে পড়লে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে দেয়ালের চার পাশে এবং উপরে পানি ছিটিয়ে দিলে প্রকোষ্ঠটি ঠান্ডা ও আর্দ্র থাকে। গ্রীষ্মকালে এ প্রকোষ্ঠে ১৭-১৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৯৫% আর্দ্রতা রক্ষা করা যায়। স্বল্প সময়ের জন্য ফল গুদামজাত করার জন্য এ প্রকোষ্ঠ খুব ভালো। ঠান্ডা প্রকোষ্ঠে ফল সমভাবে পাকে এবং উপযুক্ত অবস্থায় থাকে।

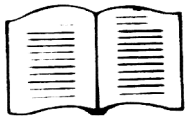

সারমর্মঃ তাজা ফল পাকার দরুন বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যেমন পানি কমে যাওয়া, শর্করার পরিবর্তন, গন্ধ, নরম হওয়া, রংয়ের পরিবর্তন, ভিটামিনস নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং পচে যাওয়া। পরিবর্তনগুলো ক্ষতিকর অথবা উপকারী উভয়ই হতে পারে। তবে ক্ষতিকর পরিবর্তনেই বেশি সংঘটিত হয়। তাজা ফল সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাজা ফল সংরক্ষণে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা তাজা ফল সংরক্ষণ করতে পারি। এগুলোর মধ্যে রেফ্রিজারেটর ও ডীপ ফ্রীজ, হিমাগার, আইস ব্যাংক কুলার, নিয়ন্ত্রিত/রূপান্তরিত আবহাওয়া মন্ডল, হাইপোবেরিক সংরক্ষণ, মোম আবৃতকরণ, পলিথিন, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, বিকিরণ পদ্ধতি বাষ্পী ভবন-ঠান্ডাকরণ-ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি অন্যতম। রেফ্রিজারেটর, ডীপ ফ্রিজ, হিমাগার, আইস ব্যাংক কুলার ইত্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতিতে ঠান্ডা তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করলে ফলে শৈত্যাঘাত বা চিলিং ইনজুরি দেখা যায়। এ জন্য ফল উপযোগী নিম্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করা উচিত। যেখানে হিমাগার নাই সেখানে অন্যান্য সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিচের কোন্‌টি তাজা ফল সংরক্ষণের পরিবেশ নয়?
- (ক) নিম্ন তাপমাত্রা
- (খ) অধিক আর্দ্রতা
- (গ) উচ্চ তাপমাত্রা
- (ঘ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

২। ফলের গুদামে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কত হওয়া উচিত?
- (ক) ৪% এর নিচে
- (খ) ১% এর নিচে
- (গ) ১০% এর নিচে
- (ঘ) ২% এর নিচে

৩। হিমাগারে আম সংরক্ষণের তাপমাত্রা কোনটি?
- (ক) ৮-১০$^{\circ}$ সে.
- (খ) ০-১$^{\circ}$ সে.
- (গ) ২০-২৫$^{\circ}$ সে.
- (ঘ) ২৫-৩০$^{\circ}$ সে.

৪। বিকিরণ পদ্ধতিতে কলা সংরক্ষণের জন্য বিকিরনের পরিমাণ কোনটি?
- (ক) ৫০-৩০ কিলোর‍্যাড
- (খ) ০-১০ কিলোর‍্যাড
- (গ) ১০০-২০০ কিলোর‍্যাড
- (ঘ) ২৫-৩০ কিলোর‍্যাড

৫। সাধারণত কত আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তাজা ফল সংরক্ষণ করা হয়?
- ক) ৯০ - ৯৫%
- খ) ৮৫ - ৯০%
- গ) ৮৫ - ৯৫%
- ঘ) ৮০ - ৮৫%

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনা মূলক প্রশ্নাবলী

১। আন্ত পরিচর্যা কী? ফল বাগানে করণীয় আন্ত পরিচর্যা সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২। অফলন্ত ও ফলন্ত গাছ কাকে বলে? গাছ অফলন্ত হওয়ার কারণসমূহ তালিকা বদ্ধ করুন।

৩। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণ পদ্ধতিসম হ আলোচনা করুন।

৪। ফসল পর্যায় কী? জমিতে ফসল পর্যায় কেন ব্যবহার করা হয়? ফসল পর্যায়ের মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। একটি জমিতে ৬ বছরের জন্য একটি ফসল পর্যায় তৈরি করুন।

৫। সাথী ফসল কী? জমিতে সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

৬। ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ কাকে বলে? ফলের পরিপক্কতা ও পাকার মধ্যে পার্থক্য কী? ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭। শ্বসনের হার অনুযায়ী ফলসম হের শ্রেণিবিন্যাস করুন। ফল পাকানোয় ইথিলিনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৮। তাজাফল গুদামজাতকরণে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৯। তাজাফলসমূহ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ বর্ণনা করুন।

১০। ফল সংরক্ষণের নীতিমালা বর্ণনা করুন।

উত্তর মালা – ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। গ ২। খ ৩। গ

পাঠ ৫.২

১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। খ

পাঠ ৫.৩

১। ঘ ২। ঘ ৩। গ

ক) <u>পরিপক্কতার</u> খ) <u>পাকা</u> গ) <u>পরিপক্ক</u> ঘ) <u>আকার</u> <u>মান</u>

পাঠ ৫.৪

১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

পাঠ ৫.৫

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ

ইউনিট ৬
স্বল্পমেয়াদী ফলগাছের চাষ

ইউনিট ৬ স্বল্পমেয়াদী ফলগাছের চাষ

বাংলাদেশে অনেক রকমের ফলগাছ জন্মে। তবে যেসব ফলের ব্যাপক চাষ হয় বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে- আনারস, কলা, পেঁপে, আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু জাতীয় ফল ও নারিকেল। এগুলোর মধ্যে আনারস, কলা ও পেঁপে স্বল্পমেয়াদী ফল গাছ হিসেবে পরিচিত। কারণ খুব অল্প সময়েই অর্থাৎ এক বা দুই বছরের মধ্যেই এগুলো ফল দিয়ে থাকে এবং খুব দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘজীবী নয়। এদেশের মোট ফল উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি ফল স্বল্পমেয়াদী গাছ থেকে উৎপন্ন হয়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আনারস, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের চাষ, আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারার শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন, স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন ধরনের ফলের জাত শনাক্তকরণ এবং স্বল্পমেয়াদী ফলের আয়-ব্যয়ের হিসেব পদ্ধতি অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ আনারস

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আনারসের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশে সম্ভবত এর উৎপত্তি (Centre of origin)। আবার উক্ত অঞ্চলের প্যারাগুয়ে দেশটিকেও কেহ কেহ এর উৎপত্তিস্থল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কলম্বাস ১৪৯৩ সালে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ পৌঁছিলে তিনি ও তার নাবিকগণ সেখানকার আদিবাসীদের গ্রামে এ ফলের চাষ দেখতে পান।

উৎপাদন

বর্তমানে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, হাওয়াই (যুক্তরাষ্ট্র) ও কুইন্সল্যান্ডে (অষ্ট্রেলিয়া) এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে। পর্তুগীজরা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে প্রথম আনারস প্রবর্তন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৪০০০ হেক্টর জমিতে এক লক্ষ তেশট্টি হাজার টন আনারস উৎপাদিত হয়।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

আনারস ফল খাদ্যপ্রাণ এ ও বি সমৃদ্ধ এবং এতে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে। এফলে শতকরা ৮৫ ভাগ পানি, ১৩ ভাগ চিনি, ০.৬ ভাগ আমিষ, ০.৩ ভাগ আঁশ, ০.০২ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০.০১ ভাগ ফসফরাস, ০.৯ ভাগ লৌহ এবং ০.৬ ভাগম্ল থাকে। তাছাড়া ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৬০ আই, ইউ খাদ্যপ্রাণ এ, ১২০ মি. গ্রা. রিবোফ্লাভিন এবং ৬৩ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে।

ব্যবহার

আনারস টক মিষ্টি এবং রসালো একটি সুস্বাদু ফল। সাধারণভাবে তাজা পাকা ফলই আমাদের দেশের লোক খেয়ে থাকে। যদিও আনারস এবং এর রস বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়া হচ্ছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আনারসের উচ্ছিষ্ট অংশ গরুর খাবার হিসেবে উৎকৃষ্ট। আনারসের পাতা থেকে শতকরা ২-৩ ভাগ ৩৮ থেকে ৯০ সে. মি. লম্বা খুব শক্ত সাদা রেশমী স তা পাওয়া যায়। ফিলিপাইন ও তাইওয়ানে এ স তা দিয়ে 'পাইনা' নামে অতি মূল্যবান কাপড় তৈরি করা হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

আনারস গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একরার মাত্র ফল দিয়ে থাকে।

আনারস উদ্ভিদ বিজ্ঞানে Bromelliaceae পরিবারের *Ananas comosus* (L.) Merr- গোত্রের অন্ ভূর্ক্ত। আনারস গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র ফল দিয়ে থাকে। এটি দেড় থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ উচু হতে পারে। প্রতি গাছে ৪০-৬৫ টি পাতা হয়। পাতা তলোয়ার আকৃতি, এক মিটার বা আরও বেশি লম্বা, ৫ থেকে ৮ সে. মি. প্রশস্ত , কিনারা সমান বা কাঁটাযুক্ত এবং পাতার শেষ প্রান্ত স ঁচালো। পুষ্পমঞ্জরী প্রায় ১৫০-২০০ বোঁটাহীন লালচে ফুল দ্বারা ঠাসা থাকে। আনারস একটি যৌগিক ফল (Multiple fruit) যা সরোসিস (Sorosis) নামে পরিচিত। ফল সাধারণত ১.০ থেকে ২.৫ কেজি হয়ে থাকে।

আনারস একটি যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত।

চিত্র ৬.১.১ঃ জায়েন্ট কিউজাতের আনারস

জাতসমূহ

আনারসের জাতসম হকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- (১) কুইন (২) কায়েন এবং (৩)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে আনারসের অগনিত জাত রয়েছে। এগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে (Group) ভাগ করা হয়েছে- (১) কুইন (Queen) , (২) কায়েন (Cayenne), এবং (৩) রেড স্প্যানিশ (Red Spanish)। বাংলাদেশে এ তিনটি শ্রেণির তিনটি জাত যথাক্রমে হানি কুইন (Honey Queen), জায়ান্ট কিউ Giant কব ও ঘোড়াশাল (Ghorasal) নামে চাষ হয়ে থাকে। এ তিনটি জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

হানিকুইন ঃ হানিকুইন জাতটি কুইন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি আগাম জাত। এর ফল মে-জুন মাসে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আহরণ করার উপযোগী হয়। ফল সমানভাবে পাকে এবং সম্পূর্ণ পাকা ফল উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এর চোখগুলো সামান্য গভীরে বসানো। ফলের ওজন এক থেকে দু'কেজি হয়ে থাকে। ফলগুলো অত্যন্ত সুবাসযুক্ত, রসালো এবং খুবই মিষ্ট। গাছ প্রতি ২ থেকে ৪টি সাকার এবং ৪ থেকে ৮টি পিপ হয়ে থাকে। এজাতটি পাতার কিনারা কাঁটাযুক্ত সর€ তরোয়ালের মত এবং সবুজাভ-তামাটে রংয়ের।

জায়ান্ট কিউ ঃ এ জাতটি কায়েন গ্রুপে এর অন্তর্ভুক্ত এবং নাবী জাত। এ গাছগুলো অনেক বড় হয়ে থাকে। পাতার কিনারা মসৃণ, কোনো কাঁটা নাই। পাতার ওপরভাগ সবুজ এবং নিচের অংশ ধূসর বর্ণের। ফল সবুজ তবে পাকা অবস্থায় হলুদ দেখায়। এর ফল জুন-জুলাই মাসে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আহরণের উপযোগী হয়। ফলের ওজন ১.৫ থেকে ৩.০ কেজি হয়। ফলের চোখগুলো ভাসা ভাসা সুতরাং ছিলতে খুব সুবিধা। ফলে আঁশ নাই বললেই চলে, মিষ্টি এবং রসালো। এ জাতে চারা খুব কম হয়। গাছপ্রতি একটি-দু'টি সাকার এবং দু' থেকে পাঁচটি পিপ হয়ে থাকে।

ঘোড়াশাল ঃ এ জাতটি রেড স্প্যানিশ গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত এবং মধ্যম মৌসুমী জাত। এটি প্রথম দিকে শুধু ঘোড়াশাল এলাকায় হতো বলে ঘোড়াশাল নামে পরিচিত। পরবর্তীতে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া অঞ্চলে এর চাষ শুরু হয় এবং উক্ত অঞ্চলে ৬০-৭০ বছরের পুরানো আনারস বাগান রয়েছে। এ জাতের গাছ মধ্যম আকৃতির, পাতা কাঁটাযুক্ত, ফল পাকলে ইট বর্ণের দেখায়। অন্য দু'টি জাতের তুলনায় চোখ গভীরে বসানো এবং টক। ফল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আহরণের উপযোগী হয়। গাছে ২-৪ টি সাকার এবং ৩-৫ টি পিপ হয়ে থাকে।

বংশ বিস্তার

অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের জন্য গাছ থেকে পাঁচ রকমের চারা পাওয়া যায়।

সাধারনত অযৌন পদ্ধতিতে আনারস গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য নিু বর্ণিত পাঁচ রকমের চারা পাওয়া যায়।

(১) সাকার বা কান্ডের চারা (Stem sucker) ঃ পত্রাক্ষ থেকে বের হয় বলে একে কান্ডচারা বলে। তবে এটি সাকার নামেই বহুল পরিচিত। বংশবৃদ্ধির জন্য এ চারা উত্তম।

(২) সাকার বা গোড়ার চারা (Ground sucker)ঃ এ প্রকারের চারা গাছের ভূমি সংলগ্ন অংশ থেকে বের হয়। সেখানেই এ চারার শিকড় গজায়। সাকার নামে বহুল পরিচিত এবং রোপণের জন্য উত্তম তবে বাগান থেকে এ চারা কেহ বিক্রয় করে না। এটি মুড়ি (Ratoon) শস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) পিপ (Slip) ঃ এ জাতীয় চারা ফলের বোঁটা থেকে বের হয়।

(৪) ক্রাউন (Crown) ঃ ফলের উপরে ছোট ছোট অনেক পাতার সমন্বয়ে ক্রাউন চারা গঠিত হয়।

(৫) ষ্টাম্প (Stump) ঃ যে গাছ ফল দিয়েছে তার কান্ড নালা (Furrow) করে তার মধ্যে ফেলে এটিকে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে অনেক চারা পাওয়া যায়।

চিত্র ৬.১.২ঃ আনারসের বিভিন্ন চারা

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে থেকে ১৫০০ মি. উঁচতায় আনারস জন্মে থাকে। যেখানে ৫১ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয় এমন শুষ্ক অঞ্চল থেকে ৫৫৪ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয় তেমন অঞ্চলেও আনারসের চাষ হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই আনারসের চাষ হতে পারে। তবে আনারস গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেজন্যই সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তাপমাত্রা ১৫$^{\circ}$ থেকে ৩০$^{\circ}$ সেলসিয়াস পর্যন্ত আনারস ভালো জন্মে থাকে।

মাটি

দেখা গেছে জৈবসার সমৃদ্ধ খিলক্ষেতে আনারস ভালো জন্মে।

সব ধরনের মাটিতেই আনারসের চাষ হতে পারে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উচ্চভূমি হওয়া চাই যেখানে বন্যা বা বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না। দেখা গেছে জৈবসার সমৃদ্ধ মাটিতে আনারস ভালো জন্মে। মাটির pH ৪.৫ থেকে ৬.৫ হলে আনারস গাছ বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি আনারস চাষের উপযোগী।

বন্যা ও বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না, পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি আনারস চাষের উপযোগী। সমতল ভূমিতে চাষ দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। পাহাড়ের ঢালে চাষের প্রয়োজন হয় না। দু'সারিতে রোপণের এক মিটার বেডটি চারা রোপণের জন্য মোটামুটি আগাছামুক্ত করতে হয়। সমতল ভূমিতে সমতলে বা উঁচু বেড তৈরি করে চারা রোপণ করা হয়। তবে সমতল ভূমিতে বেড তৈরি করে

চারা রোপণ করাই উত্তম। পাহাড়ের ঢালে বেড উঁচু করার প্রয়োজন নাই। তবে চারা রোপণের বেড কনটুর (Contour) বরাবর করতে হবে।

চারা রোপণ

এক সারি পদ্ধতিতে ৫০ সে. মি. দ রে দ রে সারিতে ৪০-৫০ সে. মি. দূরত্বে চারা রোপণ করা হয়।

চারা এক সারি পদ্ধতিতে (চিত্রঃ ৬.১.৩ দেখুন) বা দুই সারি পদ্ধতিতে (চিত্রঃ ৬.১.৪ দেখুন) রোপণ করা যেতে পারে। এক সারি পদ্ধতিতে ৫০ সে. মি. দ রে দ রে সারিতে ৪০-৫০ সে. মি. দ রত্বে চারা রোপণ করা হয়। দু'সারি পদ্ধতিতে এক মিটার প্রতি বেডে ৫০ বা ৬০ সে. মি. দূরত্বে সারিতে ৪০-৪৫ সে. মি. দ রত্বে চারা রোপণ করা হয়। দুই বেডের মাঝখানে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা হিসেবে বা চলাচলের সুবিধার জন্য ৫০ সে. মি. জায়গা রাখা হয়। দু'সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা শ্রেয়। কারণ এতে দু'সারির পাশাপাশি গাছ পারস্পরিক ঠেকনার কাজ করে। এজন্য ফলসহ হেলে পড়ে না। হেক্টর প্রতি ৪৪,৪৪৪ টি চারার প্রয়োজন হয়।

চিত্র ৬.১.৩ঃ একসারি পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণ

চিত্র ৬.১.৪ঃ দুইসারি পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণ

রোপণের জন্য চারা সংগ্রহ এবং চারা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্তিকের প্রথমভাগে মৌসুমী বৃষ্টির শেষে চারা সংগ্রহ করা হয়। গাছ থেকে চারা সংগ্রহের পর ৩-৪ সপ্তাহ ছায়ায় রেখে দেয়া ভালো। এরপর রোপণের পূর্বে ৩০ সে. মি. রেখে চারার বাকী মাথা কেটে ফেলা হয় যাতে রোপণের পর চারা

পাতার ভারে নুয়ে না পড়ে। এরপর গোড়ার ৫ সে. মি. পর্যন্ত শুকনো শিকড় ও পাতা ছেটে ফেলে ডাইথেন এম- ৪৫ (০.২%) সলিউশনে ডুবিয়ে নেয়া হয়। ডাইথেন সলিউশনে না চুবালে পাতা ও শিকড় ছাটায়ের পর ছাটায়ের জায়গা শুকাবার জন্য চারাগুলো আরও এক সপ্তাহ ছায়ায় রাখতে হবে।

চারা রোপণের জন্য ৫ থেকে ১০ সে. মি. গভীর করে গর্ত করতে হবে। এ সব গর্তে চারা রোপণ করে চারার গোড়ার চারদিকে শক্ত করে চেপে দিতে হয়। বছরের যে কোনো সময় চারা রোপণ করা যেতে পারে। যেহেতু বেশির ভাগ চারা আশ্বিন-কার্তিকে পাওয়া যায় সুতরাং চারাগুলো পৌষ-মাঘে রোপণ করতে হয় রোপণের পর সেচ দেয়াই উত্তম।

সার প্রয়োগ

গাছ প্রতি সারের পরিমাণ (গ্রাম/গাছ/বছর)

পচাঁ আবর্জনা বা গোবর সার	-	২০০	এমপি	-	১৫
ইউরিয়া	-	১৫	জিপসাম	-	১
টি এস পি	-	৫			

প্রতি বেডে বা লাইনে যতগাছ আছে তত গাছের জন্য মোট সার হিসাব করে, সেগুলো একসাথে মিশিয়ে বেডের মাটিতে ছিটিয়ে মিশে দিতে হবে। মোট জৈব সার, টিএসপি ও জিপসাম রোপণের

প র্বেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমপি সার রোপণের দু'মাস পর থেকে শুরু করে দু'মাস পর পর সমান পাঁচ কিস্তিতে গাছের গোড়ার চারদিকে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া উত্তম।

পরিচর্যা

সেচঃ আনারস গাছের খুব অল্প পানির প্রয়োজন হয়। তাই সেচের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। তবে শুকনো মৌসুমে ২০-২৫ দিন পর পর সেচ দেয়া ফসলের জন্য ভালো। শুকনো মৌসুমে কচুরিপানা, খড়, আনারসের পাতা বা শুকনা ঘাস দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ঢেকে দিলে ঘাস কম হয় এবং মাটিতে রস সংরক্ষণ হয়। একারনে ফল বড় হয়।

আগাছা দমনঃ ভালো ফসল পেতে হলে আনারসের বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আনারসের শিকড় মাটির গভীরে যায় না (Shallow rooted)। সুতরাং আগাছা সময়মত পরিষ্কার না করলে ফসল দুর্বল হয়ে পড়ে। মৌসুমী বৃষ্টির শুরুর সাথে সাথে জ্যৈষ্ঠে (মে-জুন) একবার, এবং বর্ষা শেষে কার্তিকে (অক্টোবর-নভেম্বর) আর একবার বাগানে আগাছা পরিস্কার, আনারসের মরা ও শুকনো পাতা বেছে

ফেলা এবং একই সাথে সার প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম ফসলের ফল আহরণের পর মুড়ি (Ratoon) ফসলের জন্য অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চারা ভাঙ্গা, আগাছা পরিষ্কার, আনারস গাছের শুকনো ও মরা পাতা বাছাই এবং সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

রোপণের পর ১৪ থেকে ১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। এবং মোটামুটি শতকরা ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে।

ফুল ও ফলের যত্নঃ গাছে ৪০-৫০ টি পাতা হলে সাধারণভাবে রোপণের পর ১৪ থেকে ১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। তবে পরিবেশ ও পরিচর্যা যতই ভালো হোক এ সময় মোটামুটি শতকরা ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে। অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ গাছের সবগুলোতে অথবা কিছু সংখ্যক গাছে শ্রাবণ (জুলাই-আগষ্ট) মাসে ফুল আসে এবং অমৌসুমে অগ্রহায়ন (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে ফল আহরণ করা

যায়। তবে ১৫-১৬ মাস বয়সের আনারস গাছে ইথ্রেল (২- ক্লোরোইথাইল ফসফোনিক এসিড) ৫০০ পিপিএম এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপিএম প্রয়োগে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গাছে ফল আসে এবং এটি লাভজনক। শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ফল সূর্যতাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ফল যদি হেলে পড়ে তবে সূর্যতাপ এর কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ফল খাড়া রাখার জন্য প্রতিটির গোড়ায় কাঠি পুঁতে বেঁধে দিতে হয়। তাছাড়া আনারস গাছের পাতাগুলো ফলের চারদিক দিয়ে ওপর দিকে উঠিয়ে বেঁধে দেয়া অথবা শুকনো আগাছা দিয়ে ফল ঢেকে দিলে স র্যতাপে ফলের ক্ষতি হয় না।

রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ সাধারণতঃ আনারস ফসলের তেমন পোকামাকড় রোগবালাই নাই। মিলিবাগ জায়ান্ট কিউ আনারসের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং নিঃসৃত বিষাক্ত রসে শিকড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে পচন ধরে এবং গাছ ঢলে পড়ে। অল্প স্বল্প হলে গাছ উঠিয়ে দ রে নিয়ে পুড়ে বা পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রমণ ব্যাপক হলে ২ মি. লি. ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা ৫ মি. লি ডুরসবান বা পাইরিফ্স ২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে মিলিবাগ দমন হয়। তাছাড়া পঁচা রোগের কারণে (Heart rot) প্রথমে ভিতরের পাতায় পঁচন ধরে এবং পরবর্তীতে এ রোগ পার্শ্ববর্তী পাতাসম হে বিস্ ার লাভ করে। এক্ষেত্রে ০.২% রিডোমিল সলিউশন দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি সমানভাবে ভিজিয়ে দিলে এ রোগ দমন হয়।

ফল আহরণ ও ফলন

ফল পরিপক্ক হলে সবুজ রং কমে যায় এবং পাকা শুরু করলে চোখের মধ্যবর্তী স্থানে সোনালী হলুদ রং ধারণ করে।

আনারস ফসল ভালো হলে হেক্টর প্রতি ৩০ থেকে ৫০ টন ফল প্রতি বছর আহরণ করা যেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে ফলের বোঁটার দিক থেকে চার ভাগের এক ভাগ পাকলেই ফল আহরণ (Harvest) করা উচিত। ফল পরিপক্ক হলে সবুজ রং কমে যায় এবং পাকা শুর€ করলে চোখের মধ্যবর্তী স্থানে সোনালী হলুদ (Golden yellow) রং ধারণ করে। আনারস ফল আহরণের সময় ধারালো চাকু দিয়ে ৫ সে. মি. বোঁটা রেখে কাটতে হয়।

মুড়ি ফসল (Ratoon crop)

যথাযথ পরিচর্যা করলে পর পর দু'টি মুড়ি ফসল নেয়া যায়।

২০-২২ মাস পর প্রথম ফসল আহরণের পর প্রতি গাছে মাত্র একটি সাকার রেখে বাকী অন্যান্য চারা ফেলে দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই দু'টি চারার বেশি রাখা ঠিক না। এরপর আনারস বাগানটি আগাছামুক্ত করতে হবে এবং আনারসে পঁচা ও শুকনো পাতা বেছে ফেলতে হবে। তারপর প্রথম ফসল রোপণের আগে যে সব সার দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ জৈবসার, টিএসপি এবং জিপসাম একই পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে একই নিয়মে ইউরিয়া ও এমপি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। যথাযথ পরিচর্যা করলে পর পর দু'টি মুড়ি ফসল নেয়া যায় যা অধিকতর লাভজনক। তবে কাপাসিয়া অঞ্চলে ঘোড়াশাল জাতের ৬০-৭০ বছরের বাগান রয়েছে। এসব বাগানে গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত চমৎকার এবং ফলনও ভালো।

অনুশীলন (Activity) *ঃ আনারসের বংশবৃদ্ধির জন্য কত রকমের চারা পাওয়া যায় এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন ।*

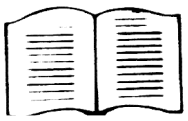

সারমর্ম ঃ আনারস টক-মিষ্টি রসালো যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বা প্যারাগুয়ে অঞ্চলে। বাংলাদেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে । আনারসের তিনটি জাত হানিকুইন, জায়ান্ট কিউ ও ঘোড়াশাল বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র একটি ফল দিয়ে থাকে। পাঁচ রকমের সাকার দিয়ে অঙ্গজ পদ্ধতিতে এর বংশ বিস্ ার করা হয়। যেহেতু বেশির ভাগ চারা

আশ্বিন-কার্তিকে পাওয়া যায় সুতরাং চারাগুলো পৌষ-মাঘে রোপণ করতে হয়। আনারসের শিকড় মাটির গভীরে যায় না। সুতরাং বাগানে আগাছা পরিষ্কার জরুরী। রোপণের পর ১৪-১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। কিন্তু শতকরা ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে। তবে ইথরেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপিএম প্রয়োগে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গাছে ফল আসে। হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন ফলন হয়। যথাযথ পরিচর্যা করলে দু'টি মুড়ি ফসল পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৬.১

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) আনারসের চাষ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ৩৪° অক্ষাংশের মধ্যে সীমিত।
খ) হানিকুইন জাতটি কায়েন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।
গ) আনারসের গাছ দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র ফল দিয়ে থাকে।
ঘ) ফলের ওপর ছোট ছোট অনেক পাতার সমন্বয়ে ক্রাউন চারা গঠিত হয়।
ঙ) মৌসুমী বৃষ্টি শুরুর সাথে সাথে এবং বর্ষা শেষে আর একবার বাগানে আগাছা পরিষ্কার করা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) জৈবসার সমৃদ্ধ ..... আনারস ভালো জন্মে।
খ) আনারস একটি যৌগিক ফল যা ..... নামে পরিচিত।
গ) ফলের বোঁটা থেকে ..... চারা বের হয়।
ঘ) স্বীয় ..... কারণে অপরাগায়িত ফলের সৃষ্টি হয়।
ঙ) গাছে ..... টি পাতা হলে সাধারণভাবে রোপণের পর ১৪-১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) আনারসের জাতসম হকে কতটি শ্রেণিতে বাগ করা হয়েছে?
ক) ২ টি
খ) ৩ টি
গ) ৪ টি
ঘ) ৫ টি

ii) রেপণের পর কত মাসের বয়সের আনারস গাছে ফুল আসে?
ক) ১০ - ১২ মাস
খ) ১২ - ১৪ মাস
গ) ১৪ - ১৬ মাস
ঘ) ১৬ - ১৮ মাস

পাঠ ৬.২ কলা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কলার উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কলার উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কলার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কলার চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

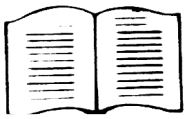

উৎপত্তিস্থল

পৃথিবীতে প্রথম যে ক'টি ফসল আবাদ শুরু করা হয় কলা তার মধ্যে অন্যতম। মহামতি আলেকজান্ডার খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে সিন্ধু নদের উপত্যকায় কলার চাষ দেখতে পান। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ফসল হচ্ছে কলা। এশিয়ার উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-প র্ব অঞ্চলেই কলার উৎপত্তিস্থল (Centre of origin) বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের মতে আসাম-মিয়ানমার-ইন্দোচীন অঞ্চলেই কলার উৎপত্তিস্থল।

উৎপাদন

বিষুবরেখার ৩০° উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষাংশের উষ্ণ ও আর্দ্র দেশসমূহে কলা চাষ হয়।

বর্তমানে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ৩০° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত সব উষ্ণ ও আর্দ্র দেশসম হে কলা চাষ হচ্ছে । সবচেয়ে বেশি যে দেশসম হে কলার চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে - এশিয়া মহাদেশের ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, আফ্রিকা মাহাদেশের উগান্ডা, কঙ্গো, তানজেনিয়া, আইভারকোষ্ট, বুরুন্ডি, কেনিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার- কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও ভেনিজুয়েলা। অন্যান্য যে দেশসমূহে কলার আবাদ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে - বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, দক্ষিণ চায়না, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ফিজি, ইসরাইল, মিশর, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, হাওয়াই, ফ্লোরিডা, কুইন্সল্যান্ড, ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস ও ক্যানারি আইল্যান্ডস। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৯,০০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং ৬২৫,০০০ টন কলা উৎপাদিত হয়। ফলের মোট জমির ১৯.৩ ভাগ জমিতে কলার চাষ হচ্ছে এবং উৎপাদিত মোট ফলের শতকরা ৩৮.৮ ভাগই হচ্ছে কলা।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি যেমন- খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ কলাতে রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য (পাকা কলার) অংশে আনুমানিক পানি- ৭০ গ্রা. , আমিষ- ১.২ গ্রা., চর্বি- ০.৩ গ্রা., শর্করা-২৭ গ্রা., আঁশ- ০.৫ গ্রা. এবং পটাশিয়াম ৪০০ মি. গ্রা. রয়েছে। কলা খাদ্যপ্রাণ সি ও বি-৬ সমৃদ্ধ। তাছাড়া এতে সামান্য পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ-এ, থিয়ামিন, রিবোফ্লেবিন ও নিয়ানিন আছে।

ব্যবহার

উগান্ডা এবং তানজানিয়ার অনেক উপজাতির প্রধান খাদ্য কলা।

কলা সাধারণত পাকা ফল হিসেবেই খাওয়া হয়। তবে প্রক্রিয়াজাত করে কলা থেকে বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি করা যায়। কলার অনেক জাত আছে যেগুলো সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। উগান্ডা এবং তানজানিয়ার অনেক উপজাতি কলা প্রধান খাদ্যরূপে (staple food) গ্রহণ করে থাকে। কলাগাছের কোনো অংশই ফেলনা নয়। পাতা ও কান্ড গর€র খাবার, এর থোর ও মোচা সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

মাটির উপরে গাছটি চোঙ্গাকৃতির এবং ডেগা একটার পর একটা জড়িয়ে ধরে কৃত্রিম কান্ড তৈরি করে।

সাধারণতঃ কলাগাছে ৩০টি পাতা হয়।

কলাগাছ একটি বীরুৎ শ্রেণির (herb) , একবীজ পত্রী এবং ঔষধি উদ্ভিদ। এর মাটির নিচে কান্ড যথা কন্দ (corm) রয়েছে। কন্দ থেকে সাকার (Sucker) বা চারা বের হয়। মাটির ওপরে গাছটি চোঙ্গাকৃতির এবং ডেগা (sheath) একটার পর একটা জড়িয়ে ধরে পোশাকিকান্ড (pseudostem) তৈরি করে। এই কান্ডের মাঝে দিয়ে নতুন পত্রফলক শক্তভাবে পেঁচানো অবস্থায় উপরে বের হয়। সাধারণত কলাগাছে ৩০টি পাতা হয়। শীর্ষপাতা (Flag leaf) না আসা পর্যন্ত পাতার আকার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। একটি সুস্থ গাছে ১০-১৫ টি তাজা পাতা থাকে। কান্ডের মাঝদিয়ে উপরে বের হয়ে ঝুলে পড়ো পুষ্পমঞ্জরী স্পেডিস্ক (spadix) ধরনের এবং নৌকার মত ডেগা (sheath) দ্বারা আবৃত থাকে। পুষ্পমঞ্জরীর গোড়ার দিকে স্ত্রী ও উভয়লিঙ্গী এবং ডগার দিকে পুরুষ ও অপুষ্ট ফুল থাকে।

কলা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে Musaceae পরিবারের এবহঁং (MY) *Musa* এর অন্ত র্ভুক্ত। সাধারণভাবে বীজহীন পাকা অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য জাতগুলো *M. sapientum*, বামন জাতগুলো *M. cavendiংযরর* এবং আনাজী কলার জাতগুলো *M. Paradisiaca* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

চিত্র ৬.২.১ঃ চাম্পা জাতের কলা

জাতসমূহ

বাংলাদেশে অনেক কলার জাত রয়েছে। এগুলো তিনটি শ্রেণিতে বিভক্তঃ (১) পাকা অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য বীজহীন জাতসম হ (২) বীচি কলা বা আইটা কলার জাতসম হ এবং (৩) আনাজী বা

সবজি হিসেবে ব্যবহৃত কলার জাতসমূহ। পাকা অবস্থায় ভক্ষণযোগ্য বীজহীন অনেক কলার জাত রয়েছে। তবে সব জাত বহুল প্রচলিত নয় বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ হয় না। এগুলোর বেশ কিছু জাত অনেক আগে বিদেশ থেকে প্রবর্তন করা হয় যেমন জাহাজী বা কাবুলী, বসরাই ও লাকাটান। বহুল প্রচলিত এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আবাদ হয় এমন ক'টি জাত হচ্ছে অমৃত সাগর, সবরি (রাজশাহীতে অনুপম এবং রংপুরে বর্তমান নামে পরিচিত), কবরী, (বাংলা কলা নামেও বহুল পরিচিত) ও চাম্পা। একমাত্র কবরীতে দু'একটি বীজ পাওয়া যায়।

অমৃতসাগর বা সাগর কলা ঃ এজাতটি বহুল পরিচিত। পঞ্চাশের দশকে এজাতটির আবাদ মুন্সিগঞ্জের রামপাল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে নংসিংদী অঞ্চলে এর চাষ প্রসার লাভ করে। বর্তমানে বগুড়া, নাটোর, যশোর এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে। গাছ ২.০ থেকে ২.৫ মি. উঁচু হয়। পাতার বোঁটা ও মধ্যশিরা বেগুনি রংয়ের। ১০-১৫ টি সাকার দেয়। তবে গাছ খুব নরম। অল্প বাতাসেই ভেঙ্গে পড়ে। পাকা কলা খুব উজ্জল হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। খেতে খুবই সুস্বাদু। প্রতি কাঁদিতে ৫-৭ টি ছড়া হয় এবং প্রত্যেক ছড়ায় ১২-১৩ টি করে কলা থাকে। কাঁদির গড় ওজন ১২ কেজি।

সবরি ঃ সবরি একটি উৎকৃষ্ট জাতের কলা। উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতেই এর সর্বাধিক চাষ হয়ে থাকে। হলুদাভ সবুজ কান্ড, পাতার কোঁটা ও ডেগার (leaf sheath) কিনারা লাল। গাছ ২.৪ থোকে ৩.০ মি. লম্বা হয়ে থাকে। ৫ থেকে ৮ টি সাকার উৎপন্ন করে। কাঁদির ওজন ১০ কেজি। এক কাঁদিতে ৮৫ থেকে ১২০ টি কলা থাকে। পাকা কলার রং সোনালী হলুদ, সুবাসযুক্ত ও সুস্বাদু। কলার কিছু কিছু অংশে কখনও কখনও দলাদলা (Clod) থাকে।

কবরী ঃ সাধারনের কাছে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে কবরী একটি জনপ্রিয় কলা। এর গাছ সহজে ভাঙ্গে না এবং অল্প যত্নে হয়। গাছ ২.৬ মি. থেকে ৩.০ মি. উঁচু হয় এবং গাছ প্রতি ছয় থেকে আটটি সাকার উৎপন্ন হয়। প্রতি কাঁদিতে ৮০ থেকে ১৬০ টি কলা ধরে। পাকা কলার রং ধুসর বর্ণের হয়ে থাকে। এর শাঁস মিষ্টি তবে দু'একটি বীজ আছে। কাঁদির গড় ওজন ১৪ কেজি।

চাম্পা ঃ গাছ খুব শক্ত এবং চার মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও বরিশালে এর ব্যাপক চাষ হয়। এটি বাংলা কলা নামেও পরিচিত। প্রতি কাঁদিতে ১৫০ থেকে ২৫০ টি কলা হয়। কাঁদির গড় ওজন ১৬ কেজি। এজাতটি বানচিটপ (Bunchy top) ও পানামা রোগ (Panama wilt) এর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। স্বাদে টক টক মনে হয়। তবে খুবই সুস্বাদু। পাকা কলার রং সোনালী হলুদ।

মেহেরসাগর ঃ এটি ঈধাবহফরংযরর প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম বাংলায় এটি জায়ান্ট গভর্ণর (Giant Governor) নামে পরিচিত। মেহেরপুর জেলায় প্রথম এর আবাদ শুরু হয়। তাই কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এর নাম দিয়েছে মেহেরসাগর। কাঁদির ওজন ১৫ কেজি। এটি বানচিটপ ও সিগাটেকা রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। পাকা কলার রং সবুজাভ হলুদ।

বংশ বিস্তার ঃ

কলার বংশবৃদ্ধি সাধারণত মাটির নিচের কন্দ থেকে অযৌনভাবে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে।

কলার বংশবৃদ্ধি সাধারণত মাটির নিচের কন্দ থেকে অযৌনভাবে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। মূল কন্দ (Mother Corm) থেকে সোর্ড সাকার (Sword sucker) বের হয়। এ প্রকারের সাকারের গোড়া মোটা ও মজবুত হয় এবং পত্রফলক সরু বা গাছ আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত হলে অথবা ফল আহরণের পর ওয়াটার সাকার (Water sucker) নামে আর এক প্রকারের সাকার বের হয়।

এর কান্ড নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সমান, পত্রফলক প্রশস্ত তবে পাশে ছড়ানো এবং কান্ড দুর্বল। কলাগাছের বংশবৃদ্ধির জন্য সোর্ড সাকার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু ঃ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কলা ভালো জন্মে। ১৫° থেকে ৩৫° সেঃ তাপমাত্রা এর বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। প্রতিমাসে ২০ সে. মি. বৃষ্টি কলাগাছের বৃদ্ধির অনুকূল। মাসে ১০ সে. মি. এর নিচে বৃষ্টি হলে কলাগাছে সেচ দেয়া প্রয়োজন। নচেৎ গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। কলাগাছ ঝড়োবাতাস সহ্য করতে পারে না।

মাটি ঃ যদিও কলার ফসল আবাদের জন্য অনেক পানির প্রয়োজন হয় কিন্তু কলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। কলার শিকড় যেহেতু মাটির ভিতর ৯০ সে. মি. পর্যন্ত প্রবেশ করে কিন্তু বেশির ভাগ শিকড় মাটির ৪৫ সে. মি. মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই জৈবসার সমৃদ্ধ এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি যেখানে বন্যার পানি আসে না এবং বৃষ্টির পানি জমেনা কলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। ব্যবস্থাপনা ভালো হলে কলা চাষের জন্য মাটি কোনো সমস্যা নয়। তবে মাটির pH ৪.৫ থেকে ৭.৫ হওয়া চাই।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

বন্যার পানি ঢোকেনা এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না এমনি পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি কলা চাষের জন্য নির্বাচন করা উত্তম।

বারবার চাষ দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয়। এরপর ২ × ২ মিটার দ রত্বে কাঠি পুঁতে সাকার রোপণের জায়গা চিহ্নিত করা হয়। কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে. মি. ব্যাসার্ধের ৫০ সে. মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হয়। এসময় গর্তের উপরের মাটি (Top soil) আলাদা রাখতে হবে। ১০-১৫ দিন গর্তটি উন্মুক্ত ফেলে বাখাই ভালো। প্রথমে জৈবসার আলাদা বাখা উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরে ফেলতে হবে।

সার

সারের হিসাব গাছ প্রতি করাই ভালো। প্রতি বছর গাছ প্রতি জৈব বা গোবর সার ১২ কেজি, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ গ্রাম, এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাম দেয়ার সুপারিশ করা হয়। জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে গাছ প্রতি হিসাব করে অর্দ্ধেক গোবরসার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ২ ×২ মি. দ রত্বে সাকার রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য হেক্টরে ৩০ টন গোবরসার প্রয়োজন। এর অর্ধেক জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার এবং সম্পর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে মিশাতে হবে। চারা রোপণের দু'মাস পর থেকে শুর€ করে ইউরিয়া ও এমপি সার সমান ছয় কিস্ি তে দুমাস পরপর উপরি প্রয়োগ (Top dressing) করতে হয়। এগুলো কলা বাগানে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিমাতে হয়। মাটিতে 'যো' থাকলেই সার ছিটাতে ও মিশাতে হয়। নচেৎ সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণ ঃ গর্তে সার প্রয়োগের পর চারা রোপন করতে হয়। সোর্ড সাকার রোপণ করাই উত্তম। রোপণের সময় চারার উচ্চতা কতটুকু তার চাইতে কন্দের ওজন কত বেশি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কন্দের ওজন যত বেশি হবে তত কম সময়ে গাছ ফল ও ফুল দেবে। ৩.০ থেকে ৫.০ কেজি ওজনের কন্দ রোপণ করাই শ্রেয়। মাতৃগাছ থেকে কন্দসহ সাকার আলাদা করার পর তা সরাসরি রোপণ করা যায়। কিন্তু দূরবর্তী স্থানে নিতে হলে কন্দের ৫ সে. মি. উপরে চারা কেটে ফেলে শুধু কন্দ নেয়াই ভালো। রোপণের পূর্বে কন্দের শিকড় ছাটাই করে ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) সলিউশনে ডুবিয়ে ছায়ায়

শুকিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। এরপর কন্দগুলো গর্তের মাটির ২০-২৫ সে. মি. গভীরে রোপণ করতে হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি কন্দ বা সাকার বোপণের জন্য উত্তম সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে, একেবারে বৃষ্টি নির্ভর হলে মৌসুমী বৃষ্টি শুরুর পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (April-May) মাসে কলার সাকার বা কন্দ রোপণ করা ভালো। শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে রোপণের পরপরই একটি সেচ খুব উপকারী।

পরিচর্যা

সেচ ঃ কলা গাছের জমি একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়া উচিত নয়। তাই শুকনো মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচের প্রয়োজন হয়। গাছ বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় বিশেষ করে রোপণের প্রথম চারমাস কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখা খুব জরুরী। যেহেতু কলাগাছের শিকড় মাটির অল্প নিচেই থাকে তহি আগাছা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে। আবার কলা বাগানের পানি না জমে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রয়োজন হলে পানি নিষ্কাশনের নালা কেটে দিতে হবে।

সারের উপরি প্রয়োগ (Top dressing) ঃ যথাক্রমে আগাছা পরিষ্কারের পরপরই দিতে হবে এবং সার দেয়ার পর মাটিতে তেমন রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। সার গাছের চারদিকে না ছিটিয়ে বরং দুই সারির মাঝখান দিয়ে ছিটিয়ে টিলার দিয়ে চাষ করাই ভালো। কদাল দিয়ে কুপিয়ে সার মিশানো যায় অথবা ডিবলিং (Dibling method) পদ্ধতিতে সার দেয়া যেতে পারে।

আন্তঃফসল ঃ সাকার রোপনের প্রথম ৪-৫ মাস বলতে গেলে জমি ফাঁকাই থাকে। যদি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে চারা রোপণ করা হয় তবে কলা বাগানের মধ্যে আন্তঃফসল (Intercropping) অনায়াসে রবি মৌসুমের সবজি চাষ করা যেতে পারে। তবে এসব আন্তঃফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সার দিতে হবে। মাঘ মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) সাকার রোপণ করলেও আন্তঃফসল হিসেবে কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, শশা ইত্যাদি ফসল করে বাড়তি আয় করা যায়।

মুড়ি ফসল ঃ সাকার রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে সাকার বের হওয়া শুরু করে। কলাগাছে থোর বের হওয়ার প র্ব পর্যন্ত ১৫ দিন পরপর মাটির ৫ সে. মি. উপরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে সাকারগুলো কেটে বাগান থেকে দুরে কোথাও ফেলে দিতে হবে। থোর বা ফুল বের হবার পর পছন্দমত জায়গায় কোনো একটি সাকারকে বাড়তে দেয়া হয় যেটি মুড়ি ফসল (Ratoon crop) হিসেবে ফল দিবে। অন্য সব সাকার ফল আহরণের পূর্ব পর্যন্ত ১৫ দিন পরপর আগের মত কেটে ফেলা হয়। ফল আহরণের পর সর সাকার বাড়তে দেয়া যেতে পারে। এ সাকারগুলো যথাসময়ে অন্যত্র রোপণ করা যাবে না বিক্রি করা যাবে।

থোর বা ফুল বের হবার পর কোনো একটি সাকারকে বাড়তে দেয়া হয় যেটি মুড়ি ফসল হিসেবে ফল দিবে।

ফলের যত্ন ঃ গাছে থোর আসার পরপরই গাছ যাতে বাতাসে ভেঙ্গে না যায়। সেজন্য বাশের খুঁটি দিয়ে বাতাসের বিপরীত দিক থেকে গাছে ঠেস দেয়া খুবই জরুরী। এ সময় গাছের মরা এবং শুকনো পাতা বাছাই করে দেয়া ভালো। থোর থেকে কলা বের হওয়ার আগেই গোটা থোর স্বᅟ্ছ বা সবুজ পলি ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দেয়া দরকার। এক্ষেত্রে পলিব্যাগের ওপর দিকে কাঁদির ডাঁটির সাথে বাঁধা থাকবে। নিচের দিকে ঢিলা করে বাঁধালেই চলবে। দু'চার দিন পরপরই নিচের বাঁধন খুলে পানি নিঙরে দেয়া এবং ফলের ডেগা ফেলে দিতে হয়। তাহলে Banana Leaf and Fruit Beetle কলার ক্ষতি করতে পারে না। পলিব্যাগ দিয়ে ঢাকার ফলে কোনো দাগ পড়ে না এবং কলা খুর আকর্ষণীয় হয়। Banana Leaf and Fruit Beetle Ges Banana Stem Weevil কলার দু'টি মারাক্তক ক্ষতিকর পোকা। বাগান সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকলে, মাটি কুপিয়ে দিলে এবং শুকনো মৌসুমে জমি ভরাট করে সেচ দিলে এগুলো ক্ষতির পর্যায়ে যেতে পারে না।

Banana Leaf and Fruit Beetle Ges Banana Steam Weevil দু'টি মারাত্তক ক্ষতিকর পোকা।

পোকামাকড় দমন ঃ Banana Leaf and Fruit Beetle এর পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের কচিপাতা ও কচি ফলের উপরের টিস্যু (Tissue) খেয়ে ফেলে। ফল ডেগার মধ্যে আংশিক থাকা অবস্থায় এরা খাওয়া শুরু করে। ডেগা পড়ে গেলে এরা আর ফলের ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং কাঁদি বের হওয়ার সাথে সাথে পলিব্যাগ (সাধারণত ১৫ মি. লম্বা) দিয়ে এটি ঢেকে দিতে হবে। অধিকন্তু বাগানের মাটিতেই এ বাচ্চা (Grub) এবং পিউপা (Pupae) থাকে। সুতরাং শুস্ক মৌসুমে কলা বাগানে চাষ দিয়ে জমি ভরে সেচ দিলে এ বিটলের আক্রমণ কম হয়। Banana Steam Weevil এর বচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা উভয়েই গাছের কান্ডে অসংখ্য গর্ত করে ফেলে। ফলে গাছ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। বাগানের পরিচর্যা যথাযথ হলে এর আক্রমণ হয় না। আক্রমণ বেশি হলে সে বাগান ভেঙ্গে ফেলাই ভালো। আবার অল্প আক্রমণ দেখার সাথে সাথে গাছ প্রতি ১০ গ্রাম কারবোফুরান (Carbofuran 5G) গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। এরপর সেচ দিতে হবে যাতে গাছ কারবোফুরান নিতে পারে। এর কার্যকারিতা একমাস স্থায়ী হয়।

কলার পানামা রোগ একটি মারাত্তক রোগ।

রোগ দমন ঃ কলার পানামা রোগ (Fusarium Wilt) একটি মারাত্তক রোগ। অমৃতসাগর ও সকরি এ দুটি উন্নত জাতেই এর অক্রমণ বেশি হয়ে থাকে (*Fusarium oxysporum* f.sp.cubense) নামক ছত্রাকের (Fungus) আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ ছত্রাক মাটিতেই থাকে। সুতরাং স্প্রে করে এ রোগ দমন করা অত্যন্ত কঠিন। এ রোগের আক্রমণে গাছের নিচের পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। দু'একদিনের মধ্যে পাতার বোঁটা ভেঙ্গে পড়ে। খুব দ্রুত এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছ মরে যায়।

আক্রান্ত গাছ চিহ্নিত হওয়া মাত্র মাটিসহ উঠিয়ে দ রে ফেলতে হবে। গর্তের মাটি আবর্জনা জমিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে ঐ জমিতে ৩-৪ বছর কলা চাষ না করাই ভালো। নতুন বাগান করতে চাইলে যে কলা বাগানে পানামা রোগ হয় নাই সে বাগান থেকে সুস্থ সবল সাকার সংগ্রহ করে রোপণ করতে হবে।

আহরণ ও সংরক্ষণ

ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ১০০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে।

ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ১০০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে। কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। কলা পাকার অপেক্ষা না করে এসময় কাঁদি কেটে নামানো হয় এবং কলাগাছ কেটে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলা হয়। এরপর ফানাগুলো এক এক করে পৃথক করে ঘরে খড়ের ওপর এক বা দু'সারি করে সাজিয়ে আবার খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এতে কলা সমানভাবে পাকে এবং চমৎকার রং হয়। হেক্টর প্রতি সাধারণভাবে ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

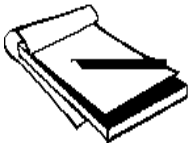

অনুশীলন (Activity)ঃ *কলার জাতসম হকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, তা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।*

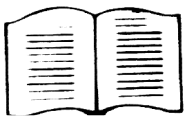

সারমর্ম ঃ কলা উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ফল। কলা সাধারণত পাকা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। কলার অনেক জাত আছে যেগুলো সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির প্রধান খাদ্য কলা। কলাচাষের অনুকূল তাপমাত্রা ১৫-৩৫° সেলসিয়াস। প্রতিমাসে ২০ সে. মি. বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধির জন্য উত্তম। কলাগাছ ঝড়োবাতাস সহ্য করতে পারে না। কলার সাধারণত অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। কলার জাতসমূহ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। সেচের ব্যবস্থা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সাকার রোপণের উত্তম সময়। মুড়িফসল কলাচাষের একটি বাড়তি সুবিধা। হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন ৬.২

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) একটি সুস্থ গাছে ১০-১৫ টি তাজা পাতা থাকে।

খ) কলাগাছ ঝড়ো বাতাস সহ্য করতে পারে।

গ) গুড়িকন্দ থেকে ফুল সৃষ্টির শুরু না হওয়া পর্যন্ত সাকার বের হয় না।

ঘ) সাধারণভাবে বীজহীন আবাদী কলার জাতগুলোর প্রায় সবই ট্রিপ-য়িড।

ঙ) রোপণের সময় চারার ওজনের চাইতে উচ্চতার গুরুত্ব অনেক বেশি।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ..... এবং ..... অনেক উপজাতি কলা প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

খ) বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট ফলের শতকরা ..... ভাগই হচ্ছে কলা।

গ) কান্ডের মাঝ দিয়ে উপরে বের হয়ে ঝুলে পড়া পুষ্পমঞ্জরী .....ধরনের।

ঘ) ফল আহরণের পর ..... নামে এক প্রকার সাকার বের হয়।

ঙ) ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ..... থেকে ..... দিন সময় লাগে।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) অমৃতসাগর কলার প্রত্যেক ছড়ায় কয়টি কলা হয়?

ক) ৫-৭ টি

খ) ১০ -১২ টি

গ) ১২ - ১৩ টি

ঘ) ১৩ -১৫ টি

ii) চাম্পা কলার কাঁদির গড় ওজন কত?

ক) ১০ কেজি

খ) ১২ কেজি

গ) ১৪ কেজি

ঘ) ১৬ কেজি

iii) কোন্ কলা পানামা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন?

ক) অমৃতসাগর

খ) সবরি

গ) চাম্পা

গ) মেহের সাগর

পাঠ ৬.৩ পেঁপে

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পেঁপের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেঁপের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেঁপের চাষের জন্য জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পেঁপের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

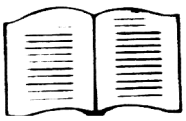

উৎপত্তিস্থল

পেঁপে উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলের ফল। সম্ভবত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ মেক্সিকো এবং কোষ্টারিকায় এর উৎপত্তিস্থল। সেখান থেকে এফলটি পাশ্ববর্তী দেশসম হে দ্র€ত বিস্ৃতি লাভ করে উক্ত সময়ে পেঁপে ইন্ডিয়াতে আসে। অনুমান করা যায় জলবায়ু অনুকূল হওয়ার জন্য একই সময়ে পেঁপে বাংলাদেশে প্রবর্তন হয়।

উৎপাদন

বর্তমানে সকল উষ্ণ মন্ডলীয় দেশসম হে যেমন- অষ্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, কালিফোর্নিয়ায়; বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, চীনদেশ, পুয়ের্টোরিকো, পেরু এবং মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশসম হে পেঁপের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে পেঁপের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও মাত্র ৪,০০০ হেক্টর জমিতে এর চাষ হয় এবং ২৭,০০০ টন পেঁপে উৎপন্ন হয়। দেশের সর্বত্র পারিবারিক বাগানে পেঁপে দু'একটি গাছ রয়েছে। কেবল রাজশাহী এবং যশোহর জেলাতেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেঁপের ব্যাপক চাষ হয়।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

পাকা পেঁপের শতকরা ৬০ ভাগ ভক্ষণযোগ্য। ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পাকা পেঁপেতে আনুমানিক ৮৬.৬ গ্রা. পানি, ০.৫ গ্রা. আমিষ, ০.৩ গ্রা. চর্বি ১২.১ গ্রা. শর্করা, ০.৭ গ্রা. আঁশ, ২০৪ মি. গ্রা. পটাশিয়াম, ৩৪ মি. গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১১ মি. গ্রা. ফসফোরাস, ১ মি. গ্রা. লৌহ, ৩ মি. গ্রা. সোডিয়াম, ৪৫০ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ এ, ৭৪ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি, ০.০৩ মি. গ্রা. থিয়ামিন, ০.৫ মি. গ্রা. নিয়ামিন এবং ০.০৪ মি. গ্রা. রিবোফ্লাবিন আছে।

ব্যবহার

> পাকা ফল হিসেবে এটি সর্বত্র আদৃত এবং বাংলাদেশ সহ অনেক দেশেই পেঁপে সবজি হিসেবে জনপ্রিয়।

পেঁপে অত্যন্ত উপাদেয় ফল যা সারা বছরেই পাওয়া যায়। পাকা ফল হিসেবে এটি সর্বত্র আদৃত এবং বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই পেঁপে সবজি হিসেবে জনপ্রিয়। পেঁপের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী যেমন- জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, হালুয়া, পায়েস, আইসক্রীম, শরবত ইত্যাদি সবার প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া কাঁচা পেঁপে থেকে দুগ্ধবৎ যে কষ (Latex) পাওয়া যায় তা থেকে পেপাইন (Papain) উৎপন্ন হয়, যা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে এবং টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্পে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। ঔষধ শিল্পেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। গোশত সিদ্ধ করতে সহায়তা করার জন্যও পেপাইন ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

ফুল সাধারণত একলিঙ্গী ও ভিন্নবাসী অর্থাৎ পুর€ষ ও

পেঁপে গাছ Caricaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এর বৈজ্ঞানিক নাম *Carica papaya* L. পেঁপে চিরহরিৎ, দ্বিবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবী বীরুৎ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ফসল। এর কান্ড শাখা বিহীন, ফাঁকা ও নরম। তবে বিশেষ অবস্থায় যেমন- গাছ ভেঙ্গে গেলে বা আঘাত প্রাপ্ত হলে এর কান্ড থেকে শাখা বের হয়। এটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং দুই থেকে দশ মিটার উঁচু হতে পারে। গাছের কান্ড, পাতা, পাতার বোঁটা এবং ফল থেকে যে সাদা কষ বের হয় তাকে Latex বলে। কান্ড ফাঁকা এবং কান্ডে পাতার চিহ্ন স্পষ্ট। পাতা

কান্ডের চারদিকে একান্ দরভাবে সজ্জিত। কান্ডের মাথায় অনেক পাতা এক সংগে জট বেঁধে থাকে। পত্রফলক ২৫ থেকে ৭৫ পাতার শিরাগুলো খুব স্পষ্ট। ফুল সাধারণত একলিঙ্গী ও ভিন্নবাসী (Dioecious) অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে থাকে। তবে উভলিঙ্গী (Hermaphrodite) ফুলও দেখা যায়। পত্রাক্ষে একক বা গু ফুল ধরে। স্ত্রীফুল ও উভলিঙ্গী সাধারণত বোঁটাহীন হয়। পুরুষফুল

লম্বা পুষ্পমঞ্জরী দন্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। পেঁপে একক সরস বেরী জাতীয় ফল।

পেঁপে পরপরাগায়িত এবং বাংলাদেশে পেঁপে জাত সংরক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রিত পরাগায়নের সাহায্যে বীজ উৎপাদনের কোনো সংস্থা নাই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শাহী পেঁপে নামে একটি মাত্র পেঁপের জাত ১৯৯২ সালে মুক্তায়িত করেছে। এর গাছ মধ্যম আকৃতির। রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। যথাযথ পরিচর্যায় গাছ প্রতি ৪০ থেকে ৬০ টি ফল ধরে। ফলের গড় ওজন ৬৪০ গ্রাম। গাছ প্রতি ৩৮ কেজি ফল উৎপন্ন হয়। শাঁস কমলা রংয়ের, রসালো এবং সুমিষ্ট। এটি একটি একলিঙ্গী ভিন্নবাসী জাত।

চিত্র ৬.৩.১ ঃ ফলসহ পেঁপে গাছ

হাওয়াই এ প্রজননের মাধ্যমে যে জাতগুলো বের করেছে তন্মধ্যে সলো সানরাইজ ও সলো ওয়াইমিনাল বিখ্যাত। মালয়েশিয়া একটি মাত্র জাত উদ্ভাবন করেছে যেটি হচ্ছে 'ইকজোটিকা'। কুড়ি বছর গবেষণার ফসল হিসেবে ইন্ডিয়ার পুসা থেকে 'পুসা ডেলিসাস', পুসা ম্যাজেষ্টি, পুসা জায়ান্ট, পুসা ডোয়ার্ফ ও পুসা নানহা জাত বের করেছে। তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েমবাটোর থেকে CO-1, CO-2, CO-3 এবং CO-4 চারটি পেঁপে জাত বের করেছে এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হর্টিকালচার রিসার্চ থেকে 'কুর্গ হানি' নামে একটি পেঁপে জাত বের করেছে।

বংশ বিস্তার

সারা বিশ্বে পেঁপের বংশবিস্তার বীজ দ্বারাই হয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে এর বংশ বৃদ্ধি বাণিজ্যিকভাবে কোথাও চালু হয়েছে বলে জানা নাই। তবে বিশেষ কোনো জাত সংরক্ষণ ও আবাদ করতে চাইলে

বিশেষ কোনো জাত সংরক্ষণ ও আবাদ করতে চাইলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎ - পাদন করা উচিত।

নিয়ন্ি ত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত। বীজের গায়ে যে পিচ্ছিল পদার্থ (Aril) থাকে তা অঙ্কুরোদগম রোধ করে। সুতরাং পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পর ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে পাটের বস্তার ওপর ঘষে পানিতে ধুলে পিচ্ছিল পদার্থ চলে যায়। এর পরপরই বীজ রোপণ করলে দু সপ্তাহের মধ্যে চারা বের হয়। অথবা বীজ পরিষ্কার করার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নিছিদ্র আধারে (যাতে বাতাস ঢুকতে পারে না) সংরক্ষণ করলে অনেক বছর বীজ নষ্ট হয় না। তবে এমনিভাবে সংরক্ষণ করা বীজ গজাইতে দু' থেকে তিন এমনকি চার সপ্তাহ সময় নেয়। আজকাল বীজতলায় বীজ না ফেলে বীজ সরাসরি ছোট ছোট পলিব্যাগে রোপণ করা হয়। প্রতি পলিব্যাগে ৫/৬ টি বীজ ফেলা হয় এবং বীজ গজানোর পর তিনটি চারাকে বাড়তে দেয়া হয়। যেহেতু এদেশের সব পেঁপে জাতই একলিঙ্গী ভিন্নবাসী এবং চারা অবস্থায় কোনটা স্ত্রী গাছ বা কোনটা পুরুষ গাছ চেনা যায় না সুতরাং প্রতি গর্তে ১৫ সে. মি. দূরত্বে ত্রিভুজাকারে তিনটি চারা রোপণের পরামর্শ দেয়া হয়। তাহলে প্রতি গর্তে অন্তত একটি স্ত্রী গাছ পাওয়া যায়। কারণ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ গাছ স্ত্রী গাছ হয়ে থাকে।

প্রতি গর্তে তিনটি চারা রোপন করলে অন্তত একটি স্ত্রী গাছ পাওয়া যায়।

প্রথা অনুযায়ী (Traditionaষ) ১০-১৫ সে. মি. উঁচু ১ থ ৩ মি. সাইজের বীজতলায় চারা উৎপাদন করা হয়। ১০-১৫ সে. মি. উঁচু জায়গার মিশ্রণ হবে এক-তৃতীয়াংশ জৈব সার, এক-তৃতীয়াংশ বালি এবং এক-তৃতীয়াংশ মাটি। এর সাথে অর্ধেক কেজি টিএসপি সার মিশালে ভালো। এরকম বীজতলায় ১০

সে. মি. দ রত্বের সারিতে ২.৫ সে. মি. দ রে দ রে বীজ ফেলতে হয়। বীজ ১.০ সে. মি. মাটির গভীরে দিয়ে ঝরণা দিয়ে সেচ দিলে মাটি চেপে যায়। প্রতিদিনই পানি দিতে হয়। চারা না গজানো

পর্যন্ত বীজতলা ১৫ সে. মি. উঁচু করে খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া ভালো। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারা বের হয়। বীজ বপনের পর ৫০-৬০ দিনের বয়সের চারা জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। এক হেক্টর জমির জন্য চারা তৈরি করতে প্রায় ৫০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে প্রতি গর্তে তিনটি করে চারা রোপণ করতে হয়।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পেঁপে ভালো জন্মে।

উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পেঁপে ভালো জন্মে, ২১° থেকে ৩০° সেঃ তাপমাত্রা পেঁপের বৃদ্ধির জন্য উত্তম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মি. উচ্চ ভূমিতেও এর আবাদ হতে পারে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পেঁপে সর্বত্রই লাভজনক ভাবে চাষ করা যেতে পারে।

মাটি

পেঁপে চিরহরিৎ শ্রেণির গাছ এবং সারা বছরেই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। তাই সঙ্গত কারণেই খুবই উর্বর জমির প্রয়োজন এবং মাটি পানি নিষ্কাশনের জন্য অনুকূল হওয়া চাই। পেঁপের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পানি এবং মাটির ঢ়ঐ ৬.০ থেকে ৬.৫ হলেই পেঁপের সফল চাষ।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

পেঁপে গাছ দু'এক ঘন্টার জন্যেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

পেঁপের জন্য প্রচুর সূর্যের আলো প্রয়োজন। জমি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। এরপর ২ থ ২ মি. দ রত্বে কাঠি পুঁতে রোপণের জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতি গর্তে তিনটি করে চারা রোপণ করতে হলে প্রতি হেক্টরে ৭৫০০ টি চারার প্রয়োজন হবে। তারপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজে ৫০ সে. মি. গভীর করে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পেঁপে আবাদের জন্য গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈব সার, ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৪৫০ গ্রাম এমপি, ২৪০ গ্রাম জিপসাম, ৬ গ্রাম জিংক অক্সাইড এবং বরিক এসিড ২৫ গ্রাম দেয়া প্রয়োজন। জমি তৈরির শেষ চাষের সময় গাছ প্রতি ৫ কেজি জৈব সার হিসাব করে সম্পর্ণ জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি গোবর সার অর্থাৎ ৫ কেজি গোবরসার, এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম, জিংক অক্সাইড ও বরিক এসিড ভিত্তিসার হিসেবে (Basal dose) চারা রোপণের পূর্বে গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে কোদাল দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং এমপি চারা রোপণের দুমাস পর শুরু করে ৪৫ দিন পরপর প্রথম তিন কিস্ি গাছ প্রতি প্রত্যেকটির ৫০ গ্রাম করে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপর গাছে ফুল আসলে একই বিরতিতে ৫০ গ্রামের জায়গায় ইউরিয়া ও এমপি সার গাছপ্রতি ১০০ গ্রাম হিসেবে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ

চারা রোপণের জন্য সেচের সুবিধা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (আশ্বিন) এবং জানুয়ারি-ফেব্র€য়ারি (মাঘ) মাস উপযুক্ত সময়। নচেৎ মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস উত্তম। প্রতিটি গর্তে তিনটি করে চারা ২০ সে. মি. দ রত্বে ত্রিভুজাকারে রোপণ করতে হবে। চারা বিকালে রোপণ করাই ভালো। রোপণের পরপরই সেচ দেয়া ভালো। এরপর যতদিন না চারা লেগে উঠে (Establish) ততদিন সেচ দেয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচের প্রয়োজন হতে পারে।

পরিচর্যা

ফুল আসার পর প্রতি গর্তে একটি স্ত্রীগাছ রেখে অন্যান্য গাছ তুলে ফেলতে হয়।

পেঁপে বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিতে হয়। মাটি মাঝে মাঝে হালকা কুপিয়ে দেয়া ভালো। রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকেই ফুল আসা শুরু করে। ফুল দেখে কোনটি স্ত্রী গাছ কোনটি পুরুষ গাছ চেনা যায়। সুতরাং এসময় প্রতি গর্তে একটি করে স্ত্রী গাছ রেখে আর সব গাছ সে স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক উপড়ে তুলে ফেলতে হবে। তবে প্রতি ২০টি গাছের জন্য একটি করে পুর€ষ গাছ রাখতে হয় যাতে পরাগায়ণে সুবিধা হয়। পরাগায়ণ ছাড়া সব স্ত্রী ফুল ঝরে পড়ে যাবে, ফল ধরবে না।

ফলের যত্ন ঃ পেঁপে গাছের প্রতি পর্বে (Node) ফল আসে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপর্বে একটির পরিবর্তে এক সাথে বেশ ক'টি ফল আসে এবং এগুলো যথাযথ বাড়তে পারে না। এসব ক্ষেত্রে ছোট অবস্থাতেই প্রতিপর্বে দু একটি ফল রেখে আর সব ফল ভেঙ্গে ফেলতে হয়।

রোগ ঃ Phytophthora Root Rot পেঁপে গাছের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগে কান্ডের গোড়া পঁচে যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ দু'একটি হলে যতশীঘ্র সম্ভব পেঁপে বাগান থেকে সরে ফেলা উচিত। পেঁপের ভাইরাস রোগ হতে পারে। তাছাড়া পেঁপে গাছে অন্য কোনো মারাত্মক রোগ বা পোকামাকড় নাই।

পাকা খাওয়ার জন্য যখনই পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দেয় তখনই আহরণ করা উচিত।

ফল আহরণ ঃ ফল ধরার দু'মাস পরেই সবজি হিসেবে এগুলো বাজারজাতকরণের জন্য আহরণ করা যেতে পারে। পাকা খাওয়ার জন্য যখনই পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দেয় তখনই আহরণ করা উচিত। গাছের সব পেঁপে একসাথে আহরণ করা যায় না। যখন যে ফলের রং হলুদ হবে তখনই সেটি আহরণ করতে হয়। এ অবস্থায় আহরণ করলে পেঁপে সম্পূর্ণ পাকতে ৫ থেকে ৭ দিন সময় নিয়ে থাকে। আহরণের সময় পেঁপে আঘাত না পায় সেদিকে যত্নবান হতে হবে। আহরণের পর ফলগুলো একসারিতে খড়ের ওপর রেখে খড় দিয়ে ঢেকে রাখলে সমানভাবে পাকে। ফল ধরার ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে ফল আহরণের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

যদিও ২-৩ বছর পর্যন্ত পেঁপে গাছ ভালোভাবেই ফল দিতে পারে কিন্তু গাছ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

যদিও ২-৩ বছর পর্যন্ত গাছ ভালোভাবেই ফল দিতে পারে কিন্তু গাছ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফল ছোট হয় এবং পেঁপে বাগানে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য গাছে ৩০-৪০ টি ফল আসার পর আর ফল ধরতে না দেয়ায় ভালো। পরবর্তী ফুলগুলো ভেঙ্গে দেয়া যায়। তাহলে শেষ ফলটি ধরার ৬০ দিন পর যদি গাছ থেকে সব ফল আহরণ করা হয় তবে এগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ পাকা ফল হিসেবে বাজারজাত করা যেতে পারে। এভাবে ১৪-১৫ মাস পরেই পেঁপে বাগান ভেঙ্গে ফেলা যেতে পারে। পেঁপের ফলন গাছ প্রতি ১৫-২০ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন হতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *স্ত্রী এবং পুরুষ গাছ কীভাবে চিহ্নিত করা যাবে তা বর্ণনা করুন। প্রতি গর্তে কয়টি চারা কীভাবে রোপিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কয়টি চারা ফল ধারণের জন্য রাখতে হবে তা আলোচনা করুন।*

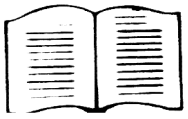

সারমর্ম ঃ পেঁপে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। গাছ সারা বছরই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও জলাবদ্ধতা গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা গাছে থাকে। পেঁপে পরপরাগায়িত এবং বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার হয়ে থাকে বলে অসংখ্য প্রকারের পেঁপে দেখা যায়। বিশেষ কোনোজাত আবাদ ও সংরক্ষণ করতে হলে নিয়ন্ি ত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত। প্রতি গর্তে তিনটি পেঁপে চারা রোপণ করা হয়। তাহলে প্রতি গর্তে অন্তত একটি স্ত্রীগাছ পাওয়া যায়। বাগানের শতকরা ন্যূনতম ৫ ভাগ পুর€ষগাছ পরাগায়ণের সুবিধার্থে থাকা প্রয়োজন। সেচের ব্যবস্থা থাকলে আশ্বিন/মাঘ মাস চারা রোপণের উত্তম সময়। তাছাড়া মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস ভালো সময়। রোপণের ৪/৫ মাস পরে ফুল দেখে স্ত্রী বা পুরুষগাছ চেনা যায়। তখন গর্তে একটি স্ত্রী গাছ রেখে বাকীগুলো উপড়ে ফেলতে হয়। ফল ধরার দু'মাস পরেই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। পাকা খাওয়ার জন্য গাছে পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দিলেই আহরণ করা উচিত। পেঁপের ফলন গাছ প্রতি ১৫-২৫ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) পেঁপে একক সরস বেরী জাতীয় ফল।

খ) গোশত সিদ্ধ করতে পেপাইন কোনো কাজে লাগে না।

গ) পুরুষফুল লম্বা পুষ্পমঞ্জরী দন্ডে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। স্ত্রীফুল সাধারণত বোঁটাহীন হয়।

ঘ) বীজ পরিষ্কার করার পর ভালোভাবে শুকিয়ে নিছিদ্র আধারে (যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে) সংরক্ষণ করলে অনেক বছর বীজ নষ্ট হয় না।

ঙ) ফল হিসেবে খাওয়ার জন্য পেঁপে গাছে ভালোভাবে পাকানো উচিত।

২। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মাটির পিএইচ .....থেকে .....হলেই পেঁপের সফল চাষ বা চমৎকার বৃদ্ধি হতে পারে।

খ) গাছের কান্ড, পাতা, পাতার বোঁটা এবং ফল থেকে যে সাদা কষ বের হয় তাকে ..... বলে।

গ) পেঁপের ফুল সাধারণত .....ও .....।

ঘ) পেঁপের বীজের গায়ে যে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে তা ..... রোধ করে।

ঙ) প্রতি গর্তে .....চারা রোপণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

র) প্রতি হেক্টরে কতটি পেপের চারার প্রয়োজন?

- ক) ৫৫০০ টি
- খ) ৬৫০০ টি
- গ) ৭৫০০ টি
- ঘ) ৮৫০০ টি

রর) পেঁপের মারাত্তক রোগ কোন্‌টি?

- ক) ফাইটপথোরা রুট রট
- খ) মোজাইক
- গ) ব্রাইট
- ঘ) বালি টপ

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৪ আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারার শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- আনারসের মাঠে কী কী পদ্ধতিতে চারা রোপণ করতে হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আনারসের হেক্টর প্রতি কী পরিমাণ চারা রোপণের প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় করতে পারবেন।

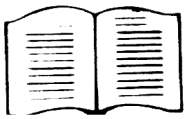

আনারসের বংশ বিস্তার অঙ্গজ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে আনারসের বংশ রক্ষার জন্য চার শ্রেণির সাকার (Sucker) উৎপন্ন হয়। এগুলো হচ্ছে (১) ক্রাউন (Crown) (২) পিপ (Slips) (৩) সাকার (Sucker or Stem sucker or Shoot sucker) ও (৪) গ্রাউন্ড সাকার (Ground sucker) । তাছাড়া যে গাছ ফল দিয়েছে তার কান্ড (Stump) থেকেও চারা উৎপন্ন করে আনারসের বংশ বিস্তার করা যায়। (চিত্র-৬.১.২ দেখুন) এ চার প্রকারের চারা দেখান হলো। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

ক্রাউন (মুকুট)

আনারস গাছের ফুল বের হওয়ার সাথে সাথে ফুলের মাথায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পাতা সম্বলিত ক্রাউন বা মুকুট বের হয়।

আনারস গাছের ফুল বের হওয়ার সাথে সাথে ফুলের মাথায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পাতা সম্বলিত ক্রাউন বের হয় (চিত্র-৬.১.২ দেখুন)। জায়ান্ট কিউ এবং হানিকুইন জাতের ফল বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রাউনও বৃদ্ধি পায়। ফল যখন পাকতে শুরু করে তখন ক্রাউনসহ ফল আহরণ করা হয়। ফলের সাথে ক্রাউন থাকলে ফল বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

সাকার (Sucker or Stem sucker or Shoot sucker)

গাছে ফল আসার কিছু-দিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে 'সাকার' বের হয়।

গাছে ফল আসার কিছুদিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে 'সাকার' বের হয়। সাধারণত এগুলো সাকার বা কান্ডের চারা নামেই পরিচিত (চিত্র- ৬.১.২ দেখুন)। ফল আহরণের প্রায় দু'মাস পর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আনারস বাগানে যথেষ্ট রস থাকা অবস্থায় এ সাকারগুলো ভাঙ্গা হয়। সাকারগুলো ভাঙ্গার পর ছায়াতে রাখা হয়। তবে ভাঙ্গার দুসপ্তাহের মধ্যে রোপণ করা ভালো। যদিও যে কোনো ওজনের সাকার রোপণ করা যেতে পারে। কিন্তু ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের সাকার রোপণের জন্য শ্রেয় মনে করা হয়।

পিপ (Slips) বা বোঁটার চারা

ফলের নিচে বোঁটা থেকে পিপ বের হয়।

সাকার বা কান্ডের চারা বের হওয়ার পর এজাতীয় চারা অর্থাৎ পিপ ফলের নিচেই বোঁটা থেকে বের হয় (চিত্র-৬.১.২ দেখুন)। পিপ অনেকগুলো বের হয়। কোনো কোনো জাতের ৭-৮ টি পর্যন্ত বের হয়। এগুলো বিভিন্ন বয়স ও সাইজের হতে পারে অর্থাৎ একই সাথে অথবা বিভিন্ন সময়ে এগুলো বের হয়। অনেক বিজ্ঞানী পিপকে সবচেয়ে ভালো চারা বলে উল্লেখ করেছেন। ফলের সাথেই পিপগুলো কাটা পড়ে। যেগুলো ২০ থেকে ৩০ সে. মি. লম্বা এবং ৩৫০ থেকে ৪৫০ গ্রাম ওজনের সেগুলো সরাসরি জমিতে রোপণের উপযুক্ত। ছোটগুলো বড় করে রোপণের জন্য নার্সারিতে রোপণ করা হয়।

গ্রাউন্ড সাকার (Ground Sucker) বা গোড়ার চারা

গ্রাউন্ড সাকার কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি অথবা নিচে সে অংশ থেকে বের হয়।

এ জাতের সাকার সব গাছে আসে না। এ সাকারগুলো কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি অথবা নিচে, সে অংশ থেকে বের হয় (চিত্র- ৬.১.২ দেখুন)। গ্রাউন্ড সাকারের শিকড় গজায় এবং তা মাটিতে প্রোথিত হয়ে পুষ্টি ও পানি সংগ্রহ করে। অন্যান্য জাতে প্রতি গাছে গ্রাউন্ড সাকার উৎপন্ন হয় না।

জমিতে চারা রোপণ পদ্ধতি

আনারসের চারা এক বা দুই সারি পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে।

আনারসের চারা এক সারি পদ্ধতি অথবা দুই সারি পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে। এক সারি পদ্ধতিতে ২০-২৫ সে. মি. উঁচু করে ৫০ সে. মি. প্রশস্ত সুবিধা অনুযায়ী লম্বা মিড়ি তৈরি করুন। দুই মিড়ির মাঝখানে ৫০ সে. মি.। প্রশস্ত একটি নালা রাখুন। মিড়িতে চারা রোপণের আগেই মিড়ির মাটির সাথে ১০০০ গাছের জন্য ২০ কেজি গোবর, ১০ কেজি টিএসপি ও এক কেজি জিপসাম মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর মিড়ির মাঝখান দিয়ে রশি ধরে বা লাইন টেনে লাইনে ৪০ সে. মি. দূরে দূরে চারা রোপণের কাঁচি দিয়ে দাগ কেটে নিন। এরপর শাবল দিয়ে রোপণের জায়গা ৫ সে. মি. পরিমাণ গর্ত করে গর্তের মধ্যে চারা গোড়ার বসিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে চারার চারপাশের মাটি শক্ত করুন। এক সারি পদ্ধতিতে ৪০ সে. মি. দূরত্বে চারা রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ২৫,০০০ চারার প্রয়োজন হয়।

দুই সারি পদ্ধতিতে আনারসের চারা রোপণ করা যেতে পারে। তবে দু'সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণের সুপারিশ করা হয়। (চিত্র- ৬.১.৩ দেখুন) এ দু'সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণ দেখান হলো। রোপণের পূর্বে দেয় সারের পরিমাণ একসারি ও দু'সারি পদ্ধতির জন্য একই। দু'সারি পদ্ধতিতে জমিতে রোপণের জন্য কত চারা প্রয়োজন তা নিম্নে বর্ণিত ফর্মুলা অনুযায়ী বের করা যায়।

হেক্টর প্রতি চারা রোপণের সংখ্য নির্ণয়

$$\text{জমিতে রোপণের চারার সংখ্যা} = \frac{২ \times ক}{খ \times (গ + ঘ)}$$

এখানে ক = জমির পরিমাণ (বর্গমিটারে)
খ = এক মিড়ি থেকে পাশ্ববর্তীর মিড়ির দূরত্ব (মিটারে)
গ = গাছ থেকে গাছের দূরত্ব (মিটারে)
ঘ = সারি থেকে সারির দূরত্ব (মিটারে)

ধরি এক্ষেত্রে ঃ ক = ১০,০০০ বর্গমিটার অর্থাৎ এক হেক্টর
খ = ০.৫ মিটার
গ = ০.৪ মিটার
ঘ = ০.৫ মিটার

$$\text{অতএব এক হেক্টরে চারার প্রয়োজন (সংখ্যা)} = \frac{২ \times ১০,০০০}{০.৫ \times (০.৪ + ০.৫)} = ৪৪৪৪৪ \text{ টি}$$

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৪

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) আনারস গাছের ফুল বের হওয়ার সাথে সাথে ফুলের মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা সম্বলিত ক্রাউন বের হয়।

খ) গাছে ফল আসার বহুদিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে সাকার বের হয়।

গ) যে পিপগুলো ২০-৩০ সে. মি. লম্বা এবং ৩৫০-৪৫০ গ্রাম ওজনের সেগুলো সরাসরি জমিতে রোপণ করতে হয় না।

ঘ) গোড়ার চারা কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি অথচ নিচে, সে অংশ থেকে বের হয়।

ঙ) এক সারি পদ্ধতিতে চারা রোপণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

চ) সংগ্রহের পর ৫-১০ দিন পর চারার গোড়ার শুকনো ও মরা পাতা ফেলে দিতে হবে।

২। শূণ্যস্থান পুরণ করুন।

ক) গাছে ফল আসার কিছুদিন পরেই পত্রাক্ষ থেকে ..... বেড় হয়।

খ) কান্ডের যে অংশ মাটির কাছাকাছি বা নিচে যে অংশ থেকে ..... বের হয়।

গ) পিপ চারা ফলের নিচে ..... থেকে বের হয়।

ঘ) গ্রাউন্ড সাকারের ..... গজায় এবং তা মাটিতে প্রোথিত হয়।

ঙ) এক হেক্টরের চারার সংখ্যা ..... টি।

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৫ কলার বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণ ও মাঠে রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কলার বিভিন্ন ধরনের চারা শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- কলার মাঠে চারা রোপণের সময়, রোপণ দূরত্ব ও রোপণ পদ্ধতি সম্র্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

চারা শনাক্তকরণ

কলাগাছ সাধারণত সাকারের (Sucker) এর সাহায্যেই বংশ বিস্তার করে। সাকার দু'প্রকারের যেমন- (১) সোর্ড সাকার (Sword Sucker) ও (২) ওয়াটার সাকার (Water sucker)| সোর্ড সাকারের পোশাকীকান্ডের (Pseudostem) গোড়া বেশ মোটা ও মজবুত। এটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে ওপর দিকে বাড়তে থাকে। এর প্রথমে দু'টি এবং পরবর্তীতে আরও দু'টি মোট চারটি সরু পাতা সোজা উপরের দিকে বের হয়। সোর্ড সাকার সতেজ বাড়ন্ত গাছের কন্দের (Corm) নিচের অংশ থেকে জন্মে। অন্যদিকে যদি কন্দ আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা নেমাটোড বা অন্য কোনো রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা কলা আহরণের পর বা অন্য কোনো কারণে (ঝড়ে বা অন্য কোনো কারণে গাছ ভেঙ্গে গেলে) গাছের পোষাকীকান্ড কেটে ফেলা হয় সেক্ষেত্রে ওয়াটার সাকার গুড়িকন্দের উপরিস্তরের চোখ থেকে বের হয়। এগুলোর পোশাকীকান্ড গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত একই সমান হয়ে থাকে অর্থাৎ সোর্ড সাকারের মত গোড়া মোটা এবং ক্রমান্বয়ে আগা সরু হয় না। পাতাগুলোর ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও প্রশস্ত হয় এবং পাশে ঢালানো থাকে। এগুলোর কান্ড সোর্ড সাকারের কান্ডের চাইতে দুর্বল হয়। (চিত্র- ৬.৫.১ এবং চিত্র- ৬.৫.২ দেখুন)।

চিত্র ৬.৫.১ ঃ কলার সোর্ড সাকার

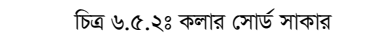

চিত্র ৬.৫.২ঃ কলার সোর্ড সাকার

মাঠ রোপণ পদ্ধতি

সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর হলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার রোপণের উত্তম সময়।

চারা রোপণের সময় ঃ কলার সাকার বছরের যে কোনো সময় রোপণ করা যেতে পারে। তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অতিরিক্ত বর্ষার জন্য জমি তৈরি এবং গর্ত করা ও ভরাট করা অসুবিধা। তাই এ দু'মাসে সাকার রোপণ না করাই ভালো। সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর হলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার রোপণের উত্তম সময়। সেচ সুবিধা থাকলে ভাদ্র-আশ্বিন এবং মাঘ-ফাল্গুনে রোপণের সুপারিশ করা হয়।

বাণিজ্যিক জাতসম হের সাকার ২ থ ২ মি. দূরত্বে বর্গাকারে রোপণের সুপারিশ করা হয়।

রোপণের দ রত্ব ঃ বাংলাদেশে যে ক'টি জাত চাষাবাদ হয় এগুলোর বৃদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন জাতের সাকার রোপণের দূরত্ব বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। যাহোক বর্তমানে বাণিজ্যিক জাতসম হের সাকার ২ থ ২ মি. দূরত্বে বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণের সুপারিশ করা হয়। ২ থ ২ মিটার দূরত্বে সাকার রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ২,৫০০ সাকার প্রয়োজন হয়।

রোপণ পদ্ধতি ঃ কলা চাষের জন্য কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি ও সমান করে নিতে হবে। তৈরি জমিতে জমির চারদিকে এক মিটার বা কিছু কম/বেশি বাদ দিয়ে বাকী জায়গায় দুই মিটার দূরে দূরে রশি দিয়ে সারি টেনে নিতে হবে। সারিতে দু'মিটার দূরে দূরে খুঁটি পুঁতে সাকার রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। এই খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজের ৫০ সে. মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হবে। খোঁড়ার সময় গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. পর্যন্ত মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। সাকার রোপণের ১০-১৫ দিন আগে গর্তের উপরের আলাদা করে রাখা মাটির সাথে ৫-৬ কেজি গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্তের উপরের ২০-২৫ সে. মি. মাটির সাথে কোদালের হালকা কোপ দিয়ে সম্পূর্ণ টিএসপি (২৫০ গ্রাম), জিপসাম (১১০ গ্রাম) এবং জিংক সালফেট (২৫ গ্রাম) মিশাতে হবে। এরপর সেচ দিয়ে গর্তের মাটি ভিজে রাখলে ভালো হয়। এভাবে গর্তে সার মেশানোর ১০-১৫ দিন পর সাকার নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করতে হবে।

সাকার কত উঁচু তা গুরুত্বপ র্ণ নয় বরং এর ওজনই বেশি

৩-৪ মাস বয়সের সোর্ড সাকার রোপণ করা ভালো। সাকার কত উঁচু তা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সাকারের ওজনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রোপণের সময় গুড়িকন্দের ওজন ১.০ থেকে ১.৫ কেজি হওয়াই উত্তম। রোপণের সময় সাকার এমনভাবে রোপণ করতে হবে যে গুড়িকন্দ ৩০ সে. মি. মাটির নিচে চাপা পড়ে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৫

১। নিচের বাক্যগুলো সম্পর্কে সত্য/মিথ্যা লিখুন।

ক) সোর্ড সাকারের পোশাকীকান্ডের গোড়া বেশ মোটা ও মজবুত। এটি ক্রমান্বয়ে সর€ হয়ে উপড় দিকে বাড়তে থাকে।

খ) কলা গাছের সাকার তিন প্রকার।

গ) সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর হলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার রোপণের উত্তম সময়।

ঘ) বাণিজ্যিক জাতসমূহের সাকার ২ থ ২ মি. দ রত্বে বর্গাকার পদ্ধতিতে রোপণের সুপারিশ করা হয়।

ঙ) সাকার কত উঁচু তা গুরুত্বপ র্ণ নয় বরং এর ওজনই বেশি গুরুত্বপ র্ণ।

২। শূন্যস্থান পুরণ করুন।

ক) কলাগাছের সাকার দুই প্রকারের যেমন (১) ..... ও (২) .....

খ) ২×২ মিটার দূরত্বে সাকার রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ..... সাকার প্রয়োজন।

গ) ..... বয়সের সোর্ড সাকার রোপণ করা ভালো।

ঘ) গর্তে সার মেশানোর ..... দিন পর সাকার নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করতে হবে।

পাঠ ৬.৬ স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন ধরনের ফলের জাত শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আনারসের বিভিন্ন জাতসমূহ শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- কলার বিভিন্ন জাতসমূহ শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।
- পেঁপের একটি জাত শনাক্তকরণে সক্ষম হবেন।

আনারস

আনারসের বাণিজ্যিক জাতসমূহ বাহ্যিক অঙ্গসংস্থানের (Morphology) ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ বাহ্যিক গঠন ও বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে - (১) কায়েন (Cayenee) (২) কুইন (Queen) ও (৩) রেড স্প্যানিশ (Red spanish)। বাংলাদেশে কায়েন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত জাতটি 'জায়ান্ট কিউ' নামে পরিচিত। কুইন শ্রেণির জাতটি হানিকুইন এবং রেড স্প্যানিশ শ্রেণির জাতটি ঘোড়াশাল নামে পরিচিত।

জায়ান্ট কিউ জাতের ফল অন্যান্য জাতের ফলের চাইতে অনেক বড় হয়।

জায়ান্ট কিউ ঃ জায়ান্ট কিউ জাতটি চিত্র- ৬.১.১ এ দেখানো হলো। ফল তুলনাম লক ভাবে অন্যান্য জাতের ফলের চাইতে অনেক বড় হয়। ফলের ওজন গড়ে প্রায় ২.৫ কেজি হয়। ফল প্রায়ই চোঙ্গাকৃতি তবে উপরের দিকটা ক্রমান্বয়ে সরু। কাঁচা অবস্থায় ফলের রং গাঢ় সমুজ হয়। যাহোক পাকা ফলগুলো হলুদাভ হয়। ফলের চোখগুলো বড় এবং ভাসা অবস্থায় থাকে। পাকা ফলের শাঁস সাদাটে।

হানিকুইন সবচেয়ে আগাম জাত।

হানিকুইন জাত ঃ হানিকুইন জাতের ফল ছোট সাইজের হয়। এর গড় ওজন প্রায় ১.২৫ কেজি। তবে এক থেকে দু' কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফল প্রায়ই চোঙ্গাকৃতির। এর চোখগুলো ছোট এবং কিছু গভীরে প্রোথিত। কাঁচা অবস্থায় ত্বকের রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। পাকা অবস্থা সম্পূর্ণ ফল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পাকা ফলের শাঁস সোনালী রং ধারণ করে। ফল খুবই মিষ্টি এবং সুঘ্রাণযুক্ত।

ঘোড়াশাল জাত ঃ ফলের গড় ওজন এক থেকে দুই কেজি হয়। কাঁচা অবস্থায় ফল লালচে দেখায়। পাকা ফলের রং গাঢ় লাল। শাঁস সাদাটে এবং আঁশযুক্ত। চোখ ছোট তবে গভীরে প্রোথিত। তাই এর ফল ছেলা খুব কঠিন। স্বাদে কিছুটা টক।

কলার জাত

অমৃতসাগর, সবরি, চাম্পা ও কবরি- এ চারটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কলার জাত।

অমৃতসাগর কলা ঃ এজাতের কাঁদির (Bunch) ওজন গড়ে প্রায় ১০-১২ কেজি হয়। গড়ে ৬-৭ টি ফানা (Hands) হয় এবং প্রতি ফানায় ১২-১৪ টি ফল হয়। একটি কাঁদিতে ৬০ থেকে ৭৫ টি ফল (Finger) হতে পারে। প্রতিটি কলার ওজন গড়ে প্রায় ৯০ গ্রাম হয়। পাকা কলার ত্বকের রং উজ্জল হলুদ এবং শাঁসের রং মাখনের (Cream colour) মত।

সবরি কলা ঃ এজাতের কাঁদির ওজন প্রায় ৮-১০ কেজি হয়। গড়ে ৫-৭ টি ফানা হয়। প্রতিটি ফানায় ১২-১৪ টি ফল হয় এবং প্রতি কাঁদিতে গড়ে ৬০-৭০ টি ফল হতে পারে। ফলের গড় ওজন প্রায় ৮৫ গ্রাম হয়। পাকা কলার ত্বকের রং সমান হলুদ এবং শাঁস মাখনের মত রং হয়।

কবরি কলা ঃ এর কাঁদির ওজন গড়ে ১২-১৪ কেজি হয়। গড়ে ৭-৮ টি ফানা থাকে এবং কাঁদি প্রতি ৯০-১০০ টি ফল থাকে। ফলের গড় ওজন ৮৫ গ্রাম হয়ে থাকে। পাকা অবস্থায় এর ত্বকের রং সবুজাভ হলুদ হয় এবং শাঁসের রং মাখনের মত হয়। এতে দু'একটি বীজ পাওয়া যায়। কবরি কলা স্বাদে একটু টক লাগে।

চাম্পা কলা ঃ চাম্পা কলা চিত্র- ৬.২.১ এ দেখানো হলো। এর কাঁদির ওজন গড়ে ১২-১৫ কেজি হয়। গড়ে ১০-১২ টি বা আরও বেশি ফানা থাকে। কাঁদি প্রতি ফলের সংখ্যা ১২০-১৪০ হতে পারে। ফলের গড় ওজন ৬০ গ্রাম হয়ে থাকে। পাকা কলার ত্বক সর্বত্র সমান উজ্জ্বল হলুদ হয় এবং শাঁসের রং মাখনের মত হয়। চাম্পা কলা স্বাদে টকটক লাগে।

শাহী জাতের পেঁপের পাকা ফলের শাঁসের রং গাঢ় কমলা রংয়ের।

পেঁপের জাত ঃ পেঁপে পরপরাগায়িত ফল। বাংলাদেশে সাধারণত পরপরাগায়িত বীজ দ্বারাই এর বংশ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বলতে গেলে এদেশে পেঁপের কোনো নিদিষ্ট জাত নাই। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সালে শাহী নামে একটি পেঁপে জাত মুক্তায়িত করেছে। এই ফল খেতে সুস্বাদু। নিম্নে শাহী জাতের বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

গাছের উচ্চতা- ১৮০ সে. মি., পাতার সংখ্যা- ১৯, পাতার বোঁটার দৈর্ঘ্য- ২৫.৮৪ সে. মি., পাতার দৈর্ঘ্য- ২৫.৫০ সে. মি., পাতার প্রস্থ- ২৫.৩৯ সে. মি., প্রতি বোঁটায় ফুলের সংখ্যা- ৩, ফলের আকার- ডিম্বাকৃতি, ফলের ওজন- ৭০০-১০০০ গ্রাম, শাঁসের রং- গাঢ় কমলা, গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা- ৪৫-৬০ টি, ফলন- গাছ প্রতি ৩৫-৫০ কেজি।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৬

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) হানিকুইন জাতের ফলের চোখগুলো ছোট এবং কিছু গভীরে প্রোথিত।

খ) কাঁচা অবস্থায় ঘোড়াশাল জাতের ফল সবুজাভ দেখায়। পাকা ফলের রং গাঢ় সবুজ।

গ) অমৃতসাগর জাতের কাঁদির ওজন প্রায় ১০-১২ কেজি হয়। পাকা কলার ত্বকের রং উজ্জ্বল হলুদ।

ঘ) সবরি জাতের কাঁদির ওজন প্রায় ৮-১০ কেজি হয়। পাকা কলার ত্বকের রং সমান হলুদ হয়।

ঙ) কবরী জাতের পাকা কলার ত্বকের রং সবুজাভ হলুদ হয় না। কলায় কখনও বীজ থাকে না। কবরী কলা স্বাদে খুবই মিষ্টি।

চ) চাম্পা জাতের পাকা কলার ত্বক সর্বত্র সমান উজ্জ্বল হলুদ হয়। চাম্পা কলা স্বাদে টকটক লাগে।

২। শূন্যস্থান পুরণ করুন।

ক) আনারসের জাতসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১)..... (২) ..... ও (৩) .....।

খ) কায়েন শ্রেণির জাতটি ..... রেড স্প্যানিশ শ্রেণির জাতটি ..... নামে পরিচিত।

গ) অমৃতসাগর জাতের কাঁদিতে গড়ে .....টি ফানা হয় এবং প্রতি ফানায় ..... টি ফল হয়।

ঘ) চাম্পা কলা স্বাদে ..... লাগে।

ঙ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সালে ..... নামে একটি পেঁপের জাত মুক্তায়িত করেছে।

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৭ স্বল্পমেয়াদী ফলের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আনারসের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন।
- পেঁপের আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন।
- কলার আয়-ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবেন।

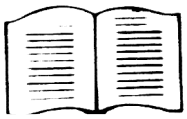

ফল উৎপাদনে খরচের হিসাব সংরক্ষণ করা এবং আয় লিপিবদ্ধ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লাভ-ক্ষতি অবশ্য নির্ভর করে উৎপাদন খরচ, ফলন ও ফসলের দামের ওপর। উৎপাদন খরচ দু'ধরণের হয়ে থাকে- স্থায়ী খরচ ও পরিবর্তনশীল খরচ। স্থায়ী খরচ বলতে জমির ম ল্যের ওপর সুদ, ভাড়া, কর ইত্যাদি বুঝায়। অন্যদিকে পরিবর্তনশীল খরচ বলতে শ্রমিক মজুরী এবং চাষাবাদের গরু, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক প্রভৃতির মূল্য/ভাড়া বুঝায়। বিভিন্ন খরচের ওপর সুদও এর অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ী খরচ ও পরিবর্তনশীল খরচ-এ এ দুটো মিলেই হচ্ছে মোট খরচ।

মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে প্রকৃত আয় পাওয়া যাবে।

মোট আয় থেকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বাদ দিলে মোটামুটি আয়ের (Gross return) হিসাব পাওয়া যায়। Gross return হচ্ছে মোট আয় (আনারস ও চারা বিক্রয়লব্ধ টাকা)। তবে মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে প্রকৃত আয় পাওয়া (Net return) যাবে। এদেশে আনারস, পেঁপে ও কলা উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসেবের নমুনা নিচে দেয়া হলো।

সারণি ১ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে আনারসের আয়-ব্যয়ের হিসাব

খরচের খাত	পরিমাণ	ম ল্য (টাকা)	মন্ ব্য
শ্রম-দিবস (প্রতিদিন ৮ ঘন্টা হিসেবে)			
পারিবারিক শ্রম	৬০ দিন	৩০০০.০০	প্রতিদিন ৫০/-
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক	৫০ দিন	২৫০০.০০	”
মোট	১১০ দিন	৫৫০০.০০	”
সাকার			
নিজস্ব	২০,০০০	২০,০০০.০০	প্রতি সাকার ১/-
অন্যের থেকে ক্রয় করা	২০,০০০	২০,০০০.০০	”
মোট	৪০,০০০	৪০,০০০.০০	”
গোবর সার			
নিজস্ব	৫০০০.০০ কেজি	১২৫০.০০	প্রতি কেজি ০.২৫/-
ক্রয়কৃত	৫০০০.০০ কেজি	১২৫০.০০	”
মোট	১০,০০০.০০ কেজি	২৫০০.০০	”
রাসায়নিক সার			
টিএসপি	৪০০ কেজি	২৮০০.০০	প্রতি কেজি ৭/-
ইউরিয়া	৬০০ কেজি	৩৬০০.০০	প্রতি কেজি ৬/-
এমপি	৬০০ কেজি	৩৬০০.০০	”
জমির ওপর ১২%	-	২৪০০০.০০	প্রতি হেক্টর এক লক্ষ

দু'বছরের সুদ			টাকা
নগদ টাকার ওপর দু'বছরের জন্য ১২% হারে সুদ	-	৮১০০.০০	
মোট পরিবর্তনশীল খরচ			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে	-	৬৫৮৫০.০০	
মোট খরচের ভিত্তিতে	-	৯০১০০.০০	
মোট আয়			
আনারস ফল (দুই বছরে ৮০% গাছের ফল হিসেবে)	৩২০০০ টি ফল	১৬০,০০০.০০	প্রতি আনারসের ম ল্য ৫/-
সাকার বিক্রি	৪০,০০০ টি	৪০,০০০.০০	প্রতি সাকার ১/-
মোট	-	২০০,০০০.০০	
নীট মুনাফা			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে	-	১৩৪,১৫০.০০	
মোট খরচের ভিত্তিতে	-	১০৯,৯০০.০০	
আয়-ব্যয়ের অনুপাত			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে	-	৩.০৩	
মোট খরচের ভিত্তিতে	-	২.২২	

সারণি ২ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে পেঁপে উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব (দু'বছরের ভিত্তিতে)

খরচের খাত	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
জমি তৈরি ও গর্ত খনন			
টিলারের সাহায্যে চাষ	তিনবার	৭৫০/-	প্রতি চাষ ২৫০/-
মাপ দিয়ে চারা রোপণের নির্দিষ্ট	পারিবারিক শ্রম-১	৫০/-	শ্রম মজুরী ৫০/-
স্থান চিহ্নিতকরণ	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৪	২০০/-	
গর্ত খনন ২৫০০ টি	পারিবারিক শ্রম-	১২৫০/-	
	২৫ চুক্তিবদ্ধ শ্রম-	৩৭৫০/-	
	৭৫		
সারের ম ল্য ও প্রয়োগ			
গোবর বা কম্পোস্ট সার গাছ প্রতি ১০ কেজি হিসেবে (মোট ২৫ টন)	পারিবারিক -১০ টন	১০০০/-	প্রতি টন ১০০/-
		১৫০০/-	
	কেনা- ১৫ টন		
ইউরিয়া (গাছপ্রতি দুছরে ৮ কিস্তিতে ১৪০০ গ্রাম	৩৫০০ কেজি	২১০০০/-	প্রতি কেজি ৬/-
টিএসপি (গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম)	৬২৫ কেজি	৪৩৭৫/-	প্রতি কেজি ৭/-
এমপি (দু'বছরে ৮ কিস্তিতে গাছ প্রতি ৮০০ গ্রাম)	২০০০ কেজি	১২০০০/-	প্রতি কেজি ৬/-
সার সার প্রয়োগ ৮ কিস্তিতে	পারিবারিক শ্রম-	৬০০/-	
	১২ চুক্তিবদ্ধ শ্রম-	১৯০০/-	
	৩৮		
পরিচর্যা			
আগাছা দমন ইত্যাদি কারণে দু'বছরে টিলারের চাষ	চার বার	১০০০/-	
গাছের গোড়া পরিষ্কার ও সার প্রয়োগ (৮ বার)	পারিবারিক শ্রম-	১২৫০/-	
	২৫ চুক্তিবদ্ধ শ্রম	৩৭৫০/-	

	৭৫		
সেচ নালা তৈরি	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫	১২৫০/-	
সেচ দুই খরা মৌসুমে	আট বার	২০০০/-	
গাছের খুঁটির মূল্য	২৫০০ টি	২৫০০০/-	প্রতি খুঁটি ১০/-
খুঁটির সাহায্যে গাছে ঠেকনা দেয়া	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫	১২৫০/-	
সুদ			
নগদ টাকার ওপর ১২% দু'বছরের সুদ	-	৯৯৬/-	
জমির মূল্যের ওপর ১২% হারে দু'বছরের সুদ	-	২৪০০০/-	প্রতি হেক্টরের দাম এক লক্ষ টাকা হিসেবে
মোট পরিবর্তনশীল খরচ			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে		৭৯৭২৫/-	
মোট খরচের ভিত্তিতে		১০৮৮৭১/-	
মোট আয় (দুই বছরে)			
২২৫০ টি গাছের (১০% পুরুষগাছ বাদ দিয়ে পাকা ফল	৪৫০০০ কেজি	৪৫০০০০/-	১০/- কেজি
কাঁচা ফল	২২৫০০ কেজি	৬৭৫০০/-	৩/- কেজি
মোট	৬৭৫০০ কেজি	৫১৭৫০০/-	
নীট মুনাফা			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে		৪৩৭৭৭৫/-	
মোট খরচের ভিত্তিতে		৪০৮৬২৯/-	
আয়-ব্যয়ের অনুপাত			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে		৬.৪৯	
মোট খরচের ভিত্তিতে		৪.৭৫	

সারণি ৩ ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে কলা উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব (দেড় বছরের ভিত্তিতে)

খরচের খাত	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	মন্ ব্য
জমি তৈরী ও গর্ত খনন			
টিলারের সাহায্যে চাষ	তিনবার	৭৫০/-	প্রতি চাষ ২৫০/-
মাপ দিয়ে চারা রোপণের	পারিবারিক শ্রম-১	৫০/-	শ্রম মজুরী ৫০/-
নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিতকরণ	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৪	২০০/-	
গর্ত খনন ২৫০০ টি	পারিবারিক শ্রম-২৫	১২৫০/-	
	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৭৫	৩৭৫০/-	
সারের মূল্য ও প্রয়োগ			
গোবর বা কম্পোষ্ট সার গাছ	পারিবারিক -১০ টন	১০০০/-	প্রতি টন ১০০/-
প্রতি ১০ কেজি হিসেবে	কেনা- ১৫ টন	১৫০০/-	
ইউরিয়া (৫ কিস্তিতে গাছ প্রতি ৯৫০ গ্রাম হিসেবে)	২৩৭৫ কেজি	১৪২৫০/-	প্রতি কেজি ৬/-
টিএসপি (গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম হিসেবে)	৬২৫ কেজি	৪৩৭৫/-	প্রতি কেজি ৭/-
এমপি (৫ কিস্তিতে গাছ প্রতি ৯৫০ গ্রাম হিসেবে)	২৩৭৫ কেজি	১৪২৫০/-	প্রতি কেজি ৬/-
সার সার প্রয়োগ ৫ কিস্তিতে	পারিবারিক শ্রম-১০	৫০০/-	
	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২০	১০০০/-	

সাকার	২৫০০ টি	২৫০০/-	প্রতি সাকার ১/-
রোপণ	পারিবারিক শ্রম-২০	১০০০/-	
	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২০	১০০০/-	
পরিচর্যা			
আগাছা দমন	টিলার চাষ ২ বার	৫০০/-	
গাছের গোড়া পরিস্কার ও	পারিবারিক শ্রম-২০	১০০০/-	
সার প্রয়োগ (৫ বার)	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-৪০	২০০০/-	
সেচ নালা তৈরী	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২০	১০০০/-	
সেচ	৪ বার	১০০০/-	
গাছে ঠেকনা দেয়া খুঁটি	২৫০০ টি	২৫০০০/-	প্রতি খুঁটি ১০/-
গাছে ঠেকনা দেয়া	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫	১২৫০/-	
১৫ দিন পর সাকার ছাঁটাই	পারিবারিক শ্রম-২৫	১২৫০/-	
	চুক্তিবদ্ধ শ্রম-২৫	১২৫০/-	
সুদ			
নগদ টাকা খরচের ওপর	৭৫৫৭৫/-	১৩৬০৪/-	১২%
জমির মূল্যের ওপর	১০০০০০/-	১৮০০০/-	১২%
মোট পরিবর্তনশীল খরচ			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে		৭৫৫৭৫/-	
মোট খরচের ভিত্তিতে		৮১৬২৫/-	
আয়			
কাঁদি	২৫০০ টি	২৫০০০০/-	কাঁদি প্রতি ১০০/-
সাকার	৫০০০ টি	৫০০০/-	সাকার প্রতি ১/-
মোট আয়		২৫৫০০০/-	
নীট মুনাফা			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে		১৭৯৪২৫/-	
মোট খরচের ভিত্তিতে		১৭৩৩৭৫/-	
আয়-ব্যয়ের অনুপাত			
নগদ অর্থ খরচের ভিত্তিতে		৩.৩৭	
মোট খরচের ভিত্তিতে		৩.১২	

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৬.৭

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে উৎপাদন খরচ, ফলন ও ফসলের দামের ওপর।

খ) পরিবর্তনশীল খরচ বলতে শ্রমিক মজুরী এবং চাষাবাদের গরু, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক প্রভৃতির মূল্য/ভাড়া বুঝায় না।

গ) প্রতি হেক্টর জমিতে পেঁপে উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের অনুপাত মোট খরচের ভিত্তিতে ১০.০০।

ঘ) প্রতি হেক্টর জমির মূল্য এক লক্ষ টাকা ধরে ১২% সুদে বছরে মোট সুদ হয় ২০,০০০ টাকা।

২। শূন্যস্থান পুরণ করুন।

ক) উৎপাদন খরচ দু'ধরনের হয়ে থাকে- ..... খরচ ও ..... খরচ।

খ) ..... বলতে জমির মূল্যের ওপর সুদ, ভাড়া, কর ইত্যাদি বুঝায়।

গ) মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে ..... পাওয়া যায়।

ঘ) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের দিনমজুরী ধরা হয়েছে ..... টাকা।

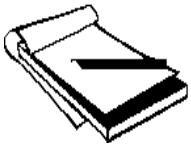

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্নাবলী

১। আনারসের উৎপত্তিস্থল ও এর জাতসমূহের বর্ণনা লিখুন।

২। আনারসের বংশ বিস্তারকারী চারাগুলোর বৈশিষ্ট্য সহ নাম লিখুন।

৩। একসারি পদ্ধতিতে কিভাবে আনারস চাষ করবে তা বর্ণনা করুন।

৪। কলার পুষ্টিমান, ব্যবহার এবং জাতসমূহের বর্ণনা দিন।

৫। কলার চারা রোপণ পদ্ধতি লিখুন।

৬। কলার চারা শনাক্তকরণের পদ্ধতি লিখুন।

৭। পেপের চাষ প্রণালি বর্ণনা করুন।

৮। আনারস, কলা ও পেঁপের জন্য জলবায় বর্ণনা করুন।

৯। আনারস, কলা ও পেঁপের ফল আহরণ পদ্ধতি ও ফলণ লিখুন।

১০। আপনার বাড়ীর এক হেক্টর জমিতে কলা উৎপাদণের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরূপণ করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) মিথ্যা

২। ক) মাটিতে খ) সরোসিস গ) পিপ ঘ) বন্ধাত্বের ঙ) ৪০-৫০

৩। র) খ রর) গ

পাঠ ৬.২

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা ঙ) মিথ্যা

২। ক) উগান্ডা, তাঞ্জানিয়ার খ) ৩৮.৮ গ) স্পেডিক্স ঘ) ওয়াটার সাকার
ঙ) ১০০, ১৩০

৩। i) গ ii) ঘ iii) গ

পাঠ ৬.৩

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) মিথ্যা

২। ক) ৬.০, ৬.৫ খ) লেটেক্স (Latex) গ) একলিঙ্গী, ভিন্নবাসী ঘ) অঙ্কুরোদগম
ঙ) তিনটি

৩। i) গ ii) ক

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৪

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) মিথ্যা ঘ) সত্য ঙ) মিথ্যা
চ) সত্য

২। ক) সাকার খ) গ্রাউন্ড সাকার গ) বোটা ঘ) শিকড় ঙ) ৪৪৪৪৪

পাঠ ৬.৫

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) সত্য

২। ক) সোর্ড সাকার, ওয়াটার সাকার খ) ২,৫০০ গ) ৩ - ৪ মাস ঘ) ১০ - ১৫

পাঠ ৬.৬

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) মিথ্যা
চ) সত্য

২। ক) (১) কায়েন(২) কুইন (৩) রেড স্প্যানিশ
খ) জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল গ) ৬ - ৭, ১২ - ১৪ ঘ) টক টক ঙ) শাহী

পাঠ ৬.৭

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা

২। ক) স্থায়ী, পরিবর্তনশীল খ) স্থায়ী খরচ গ) প্রকৃত আয় ঘ) ৫০

ইউনিট ৭ দীর্ঘমেয়াদী ফলগাছের চাষ

যেসব ফলগাছ দীর্ঘজীবী এবং একবার ফল দেয়া শুরু করে বহু বছর ফল দিয়ে থাকে সেগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী ফলগাছ বলা হয়। যেমন- আম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি। এসব ফলগাছের ফল ছাড়াও এগুলোর কাঠ আসবাবপত্র তৈরির জন্য যথেষ্ট মূল্যবান। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এগুলোর অবদানও যথেষ্ট। তাই দীর্ঘমেয়াদী ফলগাছগুলোর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আম, লিচু, কাঠাল, পেয়ারা, লেবুজাতীয় ফল, নারিকেল ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের চাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১ আম

এ পাঠ শেষে আপনি –

- আমের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমের জলবায়ু ও মাটির বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আমের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

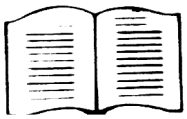

উৎপত্তিস্থল

আম ৪ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ভারত উপমহাদেশে চাষ হয়ে আসছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী

উলে-খ করেছেন যে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জ আমের উৎপত্তিস্থল (Centre of origin)। কিন্তু বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর মতে আসাম-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড ও ইন্দোচায়না অঞ্চলেই আমের আদি উৎপত্তিস্থল। তবে খাওয়ার উপযোগী (Edible) আমের উৎপত্তিস্থল আসাম-মিয়ানমার অঞ্চলেই। লক্ষ্য করার বিষয় বাংলাদেশ এ অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদন

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমের চাষ হচ্ছে। আম উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বে অন্যতম দেশগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, চীনদেশ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, হাইতি, কিউবা, ইজিপ্ট ও সুদান। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪৯,০০০ হেক্টর জমিতে আম গাছ রয়েছে এবং বছরে ১৮০,০০০ টন আম উৎপাদন হয়ে থাকে।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

পাকা আম খাদ্যপ্রাণ এ তে অত্যন্ সমৃদ্ধ। কাঁচা আমে পাকা আমের দ্বিগুণ খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে। বিভিন্ন জাতের আমের ভক্ষণযোগ্য অংশ এবং পুষ্টিমান বিভিন্ন হয়ে থাকে। পাকা আমের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ১২১.৯ থেকে ৪২২.৬ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ এ এবং ১৩.২ থেকে ৮০.৩ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি রয়েছে (Singh, ১৯৫৯)। তাছাড়া খাদ্যপ্রাণ বি, বি-১ ও বি-২ রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস ও লৌহ আছে।

ব্যবহার

আমকে প্রাচ্যের ফলের রাজা বলা হয়।

কবি আমীর খসরু চর্তুদশ শতাব্দীতে আমকে হিন্দুস্থানের সেরা ফলরূপে উল্লেখ করেন। বিখ্যাত উদ্যানতত্ত্ববিদ পোপেনো আমকে 'প্রাচ্যের ফলের রাজা' বলেছেন। এদেশের সব শ্রেণির, সব পেশার অতি প্রিয় ফল আম। আম কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই সরাসরি খাওয়া যায় বা প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে খাওয়া যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্ তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

জংলী আম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়।

আম Anacardiaceae পবিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Mangifera indica* এবং বাংলাদেশের আমের সব জাত এর অন্ ভুর্ক্ত। তবে *Mangifera sylvatica* প্রজাতির এক জংলী আম বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়।

সাধারণতঃ আমগাছ মাঝারি থেকে বৃহদাকার বৃক্ষ। বামন জাতের আমগাছ অবশ্য এর ব্যতিক্রম। আমগাছ ৭.৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে এবং ৬ থেকে ১৮ মিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আমগাছের প্রধান কান্ডটি সরল এবং প্রকান্ড এর ওপরই শাখা-প্রশাখা জন্মে। আম চিরহরিৎ বৃক্ষ। পাতা বর্শাকৃতি ও মসৃণ। বছরে ৩-৪ বার নতুন পাতা গজায়। আমগাছের প্রধান ম ল ৪.৫ থেকে ৬.০ মি. মাটির গভীরে যেতে পারে।

মাঘ-ফাল্গুন () মাসেই আমের মুকুল বের হয়। অবশ্য দেশের প র্বাঞ্চলে এর প্রায় একমাস আগেই মুকুল আসে। গুটি আমের গাছেও আগে মুকুল আসে। পম্পমঞ্জরী বহু শাখা-প্রশাখায় ডোম বা পিরামিড আকৃতির হতে পারে। এগুলো দৈর্ঘে ১০-৬০ সে. মি. হয়। এক একটি পুষ্পমঞ্জরীতে ১০০০ পর্যন্ত ফুল থাকতে পারে। একই পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ফুল, পুরুষ ফুল ও উভয়লিংগ ফুল থাকে। সাধারণত শতকরা ৯০ ভাগই থাকে পুরুষ ফুল। স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফুল বের হওয়ার পর থেকে ফোটা পর্যন্ত চার সপ্তাহ সময় লাগে এবং ফুল ফোটা থেকে ফল ধারণে দু'সপ্তাহ সময় লাগে। আম উদ্ভিদতত্ত্বে ড্রুপ (Drupe) নামে পরিচিত। আম বিভিন্ন আকৃতির ও সাইজের হয়ে থাকে।

একই পুষ্পগঞ্জরীতে স্ত্রী ফুল, পুরুষফুল ও উভয়লিঙ্গ ফুল থাকে।

চিত্র ৭.১.১ঃ গোপালভোগ, হিমসাগর ও খিরসাপাত জাতের আম

জাতসমূহ

বাংলাদেশের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছ গুটি আমগাছ।

যেহেতু আম পরপরাগায়িত ফল সুতরাং যৌন পদ্ধতিতে অর্থাৎ আঁটি বা বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি হওয়ায় আমের অসংখ্য জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে সাধারণভাবে গুটি আম বলা হয়। গুটি আমগাছগুলো প্রত্যেকটি ভিন্ন জাত। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রায় ২৫০ টি সুনির্দিষ্ট জাত রয়েছে। নিম্নে বহুল প্রচলিত কয়েকটি জাতের বিবরণ দেয়া হলো।

গোপালভোগ ঃ বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে এ আমটি সবচেয়ে আগাম। এটি একটি মাঝারি আকৃতির আম। ফল কিঞ্চিত লম্বা কিন্তু অনেকটা গোলাকার। ফলের বুক মাঝারী, কাঁধ উঁচু ও নিচের অংশ প্রায় গোলাকার। পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে কিঞ্চিত হলুদাভ থেকে গাঢ় হলুদ। এ ফল সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, রসাল, আঁশবিহীন ও বেশ মিষ্টি। খোসা সামান্য মোটা ও আঁটি পাতলা। এটা একটি আশু জাত। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময় ফল পাকতে আরম্ভ করে এবং আষাঢ় মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে পাকা শেষ হয়। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৮ দিন সময় লাগে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে। ফলের বোঁটা বেশ শক্ত। তাই ঝড়ো হাওয়ায় তেমন ঝরে পড়ে না।

খিরসাপাত ঃ খিরসাপাত উৎকৃষ্ট জাতসম হের মধ্যে একটি আগাম জাত। ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। পাকা ফলের ত্বকের রং সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং হলুদাভ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। ফলের খোসা সামান্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুর€ করে। ফল পাকার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভালো তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে।

মহানন্দা ঃ এ জাতটি অতি সম্প্রতি ১৯৯৫ সালে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মুক্তায়িত হয়েছে। ফল কিছুটা ডিম্বাকার, গোলাকৃতি এবং ছোট আকৃতির। পাকা ফলের ত্বকের রং হলুদ। শাঁস গাঢ় হলুদ, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসাল, আঁশবিহীন ও বেশ মিষ্টি। খোসা পাতলা ও মসৃণ। আঁটি ছোট ও পাতলা, জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুর€ হয়। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে চার মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৬ দিন সময় লাগে। গাছে প্রচুর ফল ধরে এবং নিয়মিত ফলন দেয়। এ আমের বোঁটা শক্ত হওয়ায় সামান্য ঝড়ো হাওয়া তেমন ক্ষতি করতে পারে না। আমের সংরক্ষণশীলতাও উত্তম।

উৎকৃষ্ট জাতের আমের মধ্যে ল্যাংড়া সর্বাধিক জনপ্রিয়।

ল্যাংড়া ঃ উৎকৃষ্ট জাতের আমের মধ্যে ল্যাংড়া সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই ডিম্বাকার গোলাকৃতি আমের পাকা অবস্থায় ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ হয়ে থাকে। শাঁস হলুদাভ, সুগন্ধী, সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও আঁশবিহীন। খোসা পাতলা ও আঁটি ছোট। এটি একটি মধ্য মৌসুমী জাত। এ জাতের আম জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে পাকতে শুরু করে ও আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ বাজারে পাওয়া যায়। ফলন ভালো তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে চার মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৪ থেকে ৬ দিন সময় লাগে।

হিমসাগর ঃ এটি একটি উৎকৃষ্ট জাতের আম। এ জাতের আম ডিম্বাকার ও মাঝারি আকৃতির। ফলের ত্বকের রং সবুজাভ হলুদ ও মসৃণ। শাঁস গাঢ় হলুদ, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, রসাল, আঁশহীন ও মিষ্টি। খোসা মাঝারি ধরনের পুরু ও আঁটি মাঝারি এ ফল আষাঢ় মাসে পাকে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। গাছে প্রচুর ফল ধরে। ফলের বোঁটা বেশ শক্ত বলে ঝড়ো হাওয়া সহ্য করতে পারে।

সূর্যপুরী ঃ এটি প্রধানত বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার একটি উৎকৃষ্ট জাতের আম। এ জাতের আমের আকার ছোট এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতি। পাকা ফলের ত্বকের রং হলুদ। শাঁসের বর্ণ গাঢ় হলুদ। আঁশ মধ্যম রসাল ও মিষ্টি। খোসা পাতলা ও মসৃণ। আঁটি ছোট ও পাতলা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে আম পাকতে শুর€ করে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৩-৪ দিন সময় লাগে। পাকা আমের সংরক্ষণশীলতা ভালো। গাছে প্রচুর ফল ধরে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে চার মাস সময় লাগে।

ফজলী ঃ ফজলী বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও সমাদৃত আম। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ জেলায় উৎকৃষ্ট ফজলী আম উৎপন্ন হয়। এ ফল বৃহদাকৃতির। আমটি দীর্ঘ ও কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের। পাকা আমের ত্বকের বর্ণ প্রায় সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ। শাঁস হলুদ, আঁশবিহীন, রসাল, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু ও মিষ্টি। খোসা পাতলা, আঁটি/বীজ লম্বা, চ্যাপ্টা ও পাতলা। এটি একটি নাবী জাত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফল পাকে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে। এ জাতের ফলন মাঝারি তবে ফল ধারণ মোটামুটি নিয়মিত। ফজলী আমের গাছ বৃহদাকারের হয় এবং পাতাও বড় আকারের হয়ে থাকে।

আশ্বিনা ঃ যদিও অন্যান্য উৎকৃষ্ট জাতসম হের তুলনায় নিম্মানের তথাপি নাবী জাত হিসেবে আশ্বিনা আম বাণিজ্যিক দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আকার-আকৃতি ও বর্ণে এর ফল ফজলীর কাছাকাছি তবে গুণে ফজলী অপেক্ষা অনেক নিম্মানের। ফল কিছুটা তির্যকভাবে ডিম্বাকৃতি ও কিছুটা চ্যাপ্টা। আকার মাঝারি থেকে বড়। ফলের ত্বক সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ। শাঁস হলুদ থেকে হলুদাভ কমলা বর্ণের এবং কখনও কখনও কমলাভ লাল, মোলায়েম, রসাল, প্রায় আঁশবিহীন ও মিষ্টি। খোসা মোটা ও আঁটি ছোট। শ্রাবণ মাসে আম পাকতে শুরু করে। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৯ দিন সময় লাগে। ফলের সংরক্ষণশীলতা উত্তম। গাছ মধ্যম থেকে দীর্ঘ ও ছড়ানো প্রকৃতির।

বংশ বিস্তার

আম যেহেতু পরপরাগায়িত এর কোনো নির্দিষ্ট জাতের মাতৃগুণাগুণ বংশ পরম্পরায় ধরে রাখতে হলে অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতিতে অর্থাৎ কলমের সাহায্যে এর বংশ বাড়াতে হবে।

আঁটি থেকে চারার গাছ মাতৃগুণাগুণ ধরে রাখতে পারে না। তাই কলমের সাহায্যে আমের বংশ বৃদ্ধি করার গুর€ত্ব অপরিসীম।

অঙ্গজ বংশ বৃদ্ধির উপকারিতা ঃ কলমের গাছে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে; গুটির গাছের চেয়ে অনেক আগেই ফুল ও ফল দেয়া শুরু করে; কলমের মাধ্যমে আদিজোড়/বহু আদিজোড়ের সুবিধা যেমন- গাছের সাইজ ছোট করা, ক্ষতিকর পোকা ও রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশ সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। তাই অঙ্গজ পদ্ধতিতে বা কলমের সাহায্যে আমের বংশ বৃদ্ধি করার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে আমের কলম করতে হলেও আম আঁটি থেকে গজানো চারার প্রয়োজন হয় যা বীজতলায় বা পলিব্যাগে বা টবে উৎপাদন করা হয়।

বীজতলা তৈরি ঃ আমের আঁটি থেকে চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলা দু'ধরণের হয়ে থাকে। প্রথম বীজতলা আঁটি অংকুরোদগমের জন্য ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় বীজতলা অংকুরিত চারা দুই বা চার সারিতে নির্দিষ্ট দ রত্বে (৫০ থ ২৫ সে. মি.) রোপণ করা হয়। বীজতলার

জন্য উঁচু পর্যাপ্ত আলোবাতাস পায়, বর্ষার পানি দাঁড়ায় না এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত। বীজতলার মাটি চাষ দিয়ে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। এরপর এক মিটার চওড়া, ১৫ সে. মি. উঁচু এবং প্রয়োজন মত বা পাঁচ মিটার লম্বা বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলার মাটিতে পর্যাপ্ত পঁচা গোবর সার বা আবর্জনা পঁচা সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। প্রথম বীজতলায় মাটি ও পচা গোবর সারের অনুপাত ১ঃ১ হলে ভালো হয়। তবে দ্বিতীয় বীজতলায় এ অনুপাত ২ঃ১ হলেও চলবে। দুইটি বীজতলার মধ্যে ৫০ সে. মি. জায়গা পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া পলি ব্যাগে (৩০ থ ২০ সে. মি.) আমের চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।

চারা উৎপাদন ঃ আমের আঁটি ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে অংকুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই রোগমুক্ত ও পাকা আম থেকে আঁটি সংগ্রহ করে সাত দিনের মধ্যে প্রথম বীজতলায় ঘন করে বিছিয়ে পাঁচ সে. মি. মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজতলায় যেন প্রয়োজনীয় রস থাকে এবং কখনও পানি না দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং যত্নবান হতে হবে। যে সব আঁটি পানিতে ডুবে যায় শুধুমাত্র সেসব আঁটি চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা উচিত। অংকুরোদগমের পরপরই চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করতে হবে। চারা বেডে/পলিব্যাগে রোপণের পর ঘন ঘন পানি সেচ দিতে হবে এবং আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যে সব চারার গঠন বিকৃত হয়ে থাকে বা পাতা সবুজ রংয়ের পরিবর্তে সাদা রংয়ের হয় সেগুলো সরিয়ে পুড়ে ফলতে হবে। প্রথম তামাটে রংয়ের পাতা বের হবার পর থেকে এক বছর বয়সের চারা কলম করার জন্য খুব উপযোগী।

অঙ্গজ পদ্ধতিসম হের বিবরণ ঃ আমগাছের অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আমগাছের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি বেশ ক'টি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। যে সব পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত এবং সুপারিশ করা হয় সেগুলোর চিত্র ও বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো।

ভিনিয়ার কলম (Veneer method) ঃ আমের অঙ্গজ বংশ বিস্তারের জন্য ভিনিয়ার কলম একটি সহজ ও সফল পদ্ধতি। এক্ষেত্রে এক থেকে দু'বছর বয়সের চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভিনিয়ার কলম করা হয়ে থাকে।

সফল কলমের গাছ যদি বীজতলায় জন্মানো হয়ে থাকে এবং কলম করার আগে টবে বা পলিব্যাগে উঠানো না হয়ে তবে পরবর্তী বছর মৌসুমী বৃষ্টি শুর€ হলে এগুলো প্রথমে 'খাসি' করে নিতে হবে।

ফাটল কলম (Cleft method) ঃ আমের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির মধ্যে এটি অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতি। ফিলিপাইনে আমের কলম তৈরিতে ফাটল কলম পদ্ধতি ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রথমে আমের চারা যেগুলো আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার হবে সেগুলো ৮ থেকে ১২ মাস বয়সের এবং সতেজ ও সবল হওয়া চাই।

ষ্টোন গ্রাফটিং (Stone grafting) ঃ অল্প সময়ে অধিক কলম উৎপাদনে ষ্টোন গ্রাফটিং একটি সফল পদ্ধতি। এটি ফাটল কলমের মত। এক্ষেত্রে চারার বয়স ১০-১২ মাস না হয়ে ১০-১৫ দিন হয়ে থাকে।

'টপ ওয়ার্কিং পদ্ধতির মাধ্যমে আঁটি গাছকে কাংখিত কলমের গাছে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

টপ ওয়ার্কিং বা বয়স্ক আঁটির গাছ কলমের গাছে রূপান্তরকরণ ঃ ১০-১৫ বছরের বা আরও অধিক বয়সের আঁটির গাছের আম যদি গুণে-মানে ভালো না হয় তবে এক্ষেত্রে 'টপ ওয়ার্কিং' পদ্ধতির মাধ্যমে আঁটির গাছটি কাংখিত কলমের গাছে রূপান্তরিত করা সম্ভব। প্রথমে যে কোনো একটি প্রধান শাখা-প্রশাখা ছেঁটে ফেলতে হয়। কাটা জায়গায় আবার নতুন শাখা বের হবে। এগুলোর বয়স যখন ৩-৪ মাস এবং বৃদ্ধি বেশ সতেজ ও সবল তখন সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্বাচিত গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করে আঁটির গাছের নতুন শাখায় ১০-১৫ টি ভিনিয়ার কলম করা হয়। ভিনিয়ার কলম সফল

হওয়ার আগে এবং পরে কলমের ডালে যদি মূল গাছের শাখা প্রশাখা বের হয় সেগুলো খেয়াল করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এভাবে এক এক বছর এক একটি প্রধান শাখা রূপান্তরিত করে গাছটিকে কাংখিত কলমের গাছে পরিণত করা যাবে।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায় ও মাটি আম উৎপাদনের খুবই উপ-যোগী।

আম প্রধানতঃ উষ্ণমন্ডলের ফল। তবে এর বিস্তৃতি অব উষ্ণমন্ডল পর্যন্ত । সর্বপ্রধান আম উৎপাদনকারী দেশ ইন্ডিয়ার প্রধান আম উৎপাদন অঞ্চলগুলো ৮ থেকে ৩০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ বিস্তুত। পাকিস্তানের আম উৎপাদন এলাকাগুলো ২৪ থেকে ৩২ ডিগ্রী এবং মেক্সিকোর অবস্থান ১৫ থেকে ৩১ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে। বাংলাদেশের অবস্থান ২০ থেকে ২৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।

সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশ অক্ষাংশের দিক থেকে আম উৎপাদনের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। অধিকন্ত

আম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে জন্মে। বাংলাদেশ কোনো স্থানেই এর উর্দ্ধে নয়। বাংলাদেশের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ১৮-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আম উৎপাদনের জন্য ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রী সেঃ সবচেয়ে উপযোগী সুতরাং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের তাপমাত্রা আম উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

বৃষ্টিপাত ঃ আম উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ খুবই গুর€ত্বপ র্ণ। সেচ সুবিধা থাকলে বছরে ২৫০ মি. মি. বৃষ্টিপাত আম উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। আম ২৫০০ মি. মি. বা তার অধিক

বৃষ্টিপাত হলেও উৎপাদন হতে পারে। যদি ফুল আসা থেকে ফল ধারণ পর্যন্ বৃষ্টিপাত না হয় তবে আমের ফলন ব্যহত হয়না। আমের ফুল আসা এবং ফল ধারণ জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই শেষ হয়। সে সময় দেশের কোথাও তেমন বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

মাটি

আমগাছ যে কোনো মাটিতেই জন্মিতে পারে। মাটি পাললিক, বেলে, দোঁআশ বা এঁটেল হোক তাতে

আম গাছের বৃদ্ধিতে তেমন কিছু অসুবিধা হয় না। তবে মাটি ২.০ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ গভীর হওয়া চাই। আমের জন্য মাটি পি,এইচ ৫.৫ থেকে ৭.০ সবচেয়ে ভালো। পৃথিবীর আম উৎপাদনকারী

দেশসম হের মাটির পি,এইচ ৪.৫ থেকে ৭.০ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মাটির

পিএইচ ৫.০ থেকে ৮.০ এবং প র্বাঞ্চলে ৪.৫ থেকে ৬.০।

সুতরাং বাংলাদেশের জলবায়ু এবং মাটি আম উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী।

চাষাবাদ প্রণালি ঃ উঁচু এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমি আম বাগানের জন্য উত্তম। একটি আমগাছ ৭০-৮০ বছর ধরে ফল দেবে। সুতরাং রোপণের সময় আমগাছ রোপণের স্থান নির্বাচন এবং

কোনো জাতের গাছ রোপণ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রোপণের দ রত্ব ঃ আমাদের দেশে যে সব উন্নতজাত আছে সেগুলো সবই ৮-১০ মি. উঁচু হয়ে থাকে

এবং প র্ণ বয়স্ক অবস্থায় ৫-৬ মি. উভয় পাশে প্রসারিত হয়। কাজেই রোপণের দ রত্ব ১২.৫ থ ১২.৫ মি. হয়ে থাকে। ইন্ডিয়ার আম্রপালি জাত একটি বামন জাত। এজাতটি ৩ থ ৩ মি. দূরত্বে রোপণ করা

যায়। ১২.৫ থ ১২.৫ মি. দূরত্বে গাছ রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে মাত্র ৬৪ টি গাছ রোপণ করা যায়। অথচ ৩ থ ৩ মি. গাছ রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ১১০০ টি গাছ রোপণ করা যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ ঃ জমি কয়েকবার চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। এরপর জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ১০ থেকে ২৫ টন আবর্জনা পঁচা সার বা গোবর সার জমিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। এর পর ৫০ সে. মি. গভীর করে ১ থ ১ মি. সাইজের গর্ত তৈরি করতে হবে। মাটির পিএইচ ৬.০ এর নিচে হলে গর্ত প্রতি এক কেজি করে চুন হিসাব করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে গর্তে সেচ দিতে হবে। এর ১০ থেকে ১৫ দিন পর ১০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট প্রতিটি গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

চারা রোপণ ও সময় ঃ বৈশাখ (April-May) মাসেই চারা রোপণের উপযুক্ত সময়, তবে চৈত্র-বৈশাখ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ অথবা ভাদ্র-আশ্বিন (August-October) মাসেও গাছ রোপণ করা যাবে। তবে অতিরিক্ত বর্ষার মধ্যে চারা রোপণ না করাই ভালো। চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনো ক্রমেই গাছের গোড়ার শিকড়সহ মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায় এবং রোপণের সময় গাছটির গোড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটির নিচে ঢুকে না যায়। জীবজন্তু বা বাতাসে গাছের গোড়া যাতে না নড়ে সেজন্য দু'টি খুঁটি পুঁতে বাংলার চার এর মত করে ভালোভাবে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরপরই গাছে পানি দিতে হবে। বৃষ্টি না হলে রোপণের পর ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন বা একদিন অন্তর অন্তর গাছে পানি দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ চারা রোপণের পর থেকেই গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। আম বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য মাঝে মাঝেই চাষ দেয়া ভালো। রোপণের পর বৃষ্টি না থাকলে প্রথম ১৮ মাসে শুষ্ক মৌসুমে এক সপ্তাহ পরপর সেচ দিতে হয়। এরপর পাঁচ বছর পর্যন্ত দু'সপ্তাহ পরপর সেচ দেয়া বাঞ্চনীয়। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য যথাযথ সার প্রয়োগ দরকার।

সার প্রয়োগ ঃ বিভিন্ন বয়সের আমগাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ সারণি-১ এ দেখান হলো।

সারণি ১ ঃ বিভিন্ন বয়সের আমগাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

গাছপ্রতি সারের পরিমাণ	গাছের বয়স (বছর)					
	০২-০৪	০৫-০৭	০৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর ঊর্ধ্বে
গোবর বা আর্বজনা পঁচা সার (কেজি)	১০-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩২-৪০	৪১-৫০
রাসায়নিক সার (গ্রাম)						
ইউরিয়া	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০
টিএসপি	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমপি	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪৫০	৫০০
জিপসাম	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিঙ্কসালফেট	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫

গাছ রোপণের বছর ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে একভাগ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বর্ষা আরম্ভের শুরুতে এবং আর একভাগ আশ্বিনে অর্থাৎ বর্ষার শেষে গাছের চার দিকে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছগুলো বৃদ্ধির সাথে সাথে জৈব ও রাসায়নিক সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যা ছক-১ এ দেখান হলো। উল্লিখিত সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তি আশ্বিন মাসের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে যথেষ্ট রস

না থাকলে সার দেয়ার পর সেচ দিতে হবে। ছোট গাছের গোড়া থেকে ৪০-৫০ সে. মি. দ রে, মাঝারি বয়সী গাছের ২-৩ মি. দূরে এবং বড় গাছের বেলায় দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছ বড় হয়ে গেলে মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করে টিলার দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে সার মিশিয়ে দেয়াই উত্তম।

ছাঁটাইকরণ ঃ রোপণের ২-৩ বছর পর্ন্ত গাছের গোড়া থেকে ডালপালা গজালে তা কেটে ফেলতে হবে। গাছের প্রধান কান্ডটি যাতে সোজাভাবে এক মিটার উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উচ্চতায় গাছের চারপাশে প্রসারিত ৪ থেকে ৬ টি শাখা বাড়তে দেয়া যেতে পারে। এতে গাছের সব অংশ সমান ভাবে পাবে এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হবে। ভিতরমুখী ডালগুলো

কেটে ফেলা উচিত এবং বহিমুখী ডালগুলো রাখা উচিত। রোগাক্রান্ত , দুর্বল, মরা ও শুকনো ডালপালা কখনও গাছে রাখতে নাই।

ফুল ভাংগন ঃ কলমের গাছে রোপণের বছর থেকেই ফুল আসতে পারে। এ ফুলগুলো ভেঙ্গে না দিলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং গাছের শক্ত মজবুত কাঠামো তৈরি ব্যহত হয়। সেজন্য গাছের বয়স ৩-৪

বছর প র্ণ হওয়ার আগে ফুল আসলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছের ৩-৪ বছর প র্ণ হওয়ার পরই ফুল ও ফল ধরতে দেয়া উচিত।

পোকা ও রোগ দমন ঃ রোপণের পর গাছ অনেক রকমের পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ হতে পারে। রোপণের পর চারা গাছের কচি পাতা কাট উইভিল (Mango leaf cutting weevil) পোকার আক্রমণ বেশ দেখা যায়। এ পোকা আমগাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছের ক্ষতি করে না। স্ত্রীপোকা কচি আমপাতার পিঠে মধ্যশিরার উভয় পাশে এক একটি করে প্রতি পাতায় ১০-২০ টি ডিম পারে। এর পর স্ত্রীপোকা ডিমপাড়া পাতাটির বোঁটার কাছাকাছি কেটে পাতাটি মাটিতে ফেলে দেয়।

আক্রান্ত আমগাছ কাটা কচিপাতার বোঁটাগুলো দেখে চেনা যায়। এ পোকার আক্রমণে চারা গাছের সব নতুন পাতা নষ্ট হয়ে যায়। মাটি থেকে কাটা নতুন পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে এই পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। তাছাড়া গাছে কচি পাতা আসার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. ডায়াজিনন ৫০ অথবা ৬০ ইসি বা ফেনিট্রোথায়ন (সুমিথিয়ন/ফলিথিয়ন) ৫০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি স্প্রে করে এই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উলন্ত গাছের পরিচর্যা

উলন্ত আম গাছের যে সব পরিচর্যা দরকার তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

পরগাছা দমন ঃ আমগাছে একাধিক জাতের পরগাছা জন্মে। তবে লরানথাস (Loranthus) নামের পরগাছাটিই সচরাচর দেখা যায়। পরগাছাসমূহ শিকড়ের ন্যায় এক প্রকার হষ্টোরিয়া (Haustoria) হয় যা গাছের মধ্যে প্রবেশ করে রস শোষণ করে। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পরে। এতে গাছের পাতা ছোট এবং ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং কোনো কোনো ডাল মরে যায়। এর ফলে গাছের ফলন মারাত্নক ভাবে

কমে যায়। এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরগাছাসম হ সম লে উৎপাটন করতে হবে। প্রতি বছর ফল আহরণের পর অথবা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই একাজ করার উপযুক্ত সময়। পরগাছা মুলতঃ ডালের অগ্রভাগে জন্মে। ডালের যে জায়গায় পরগাছার শিকড় ঢোকে এর ১০ সে. মি. নিচে ডালটিকে কেটে দিলে আর সেখানে পরগাছা জন্মাতে পারে না। পরগাছা ছোট অবস্থাতেই নষ্ট করে দেয়া উচিত। অর্কিড জাতীয় পরগাছা মোটা ডালে জন্মে। এগুলো বিশেষ ক্ষতিকর নয় এবং সহজেই তুলে ফেলা যায়।

ফল আহরণের পর অংগছাঁটাই গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

অংগ ছাঁটাই ঃ ফল আহরণের পর গাছের মরা, রোগাক্রান্ত এবং অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে দেয়া গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এ গাছের ভিতরের দিকে অনেক ডালপালা আছে যেগুলো ফল দেয় না অথচ ছায়া সৃষ্টি করে পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। সুতরাং এসব ডালপালা ছাঁটাই করে দেয়াই ভালো যাতে গাছের ভিতর সর্বাধিক আলো প্রবেশ করতে পারে এবং বাতাস অনায়াসেই চলাচল করতে পারে।

সার প্রয়োগ ঃ ফলন্ত গাছের বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করতে হবে। সারণি-১ এ কি সার পরিমাণ কোনো বয়সের গাছে দিতে হবে দেখানো হয়েছে। সার বছরে দুই কিস্তি তে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট একান্ত র বছরে প্রয়োগ করলেও চলবে। প ূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ২-৩ মিটার দ র দিয়ে সার প্রয়োগ করাই শ্রেয়। মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে সার দেয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ঃ ফুল আসা বা ফল ধরার জন্য বর্ষা মৌসুম শেষে কম পক্ষে তিনমাস বা মুকুল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুষ্ক অবস্থা বিরাজ করা। মুকুল হওয়ার আগে সেচ বা বৃষ্টিপাত উভয়ই মারাত্নক ক্ষতিকর এবং সেক্ষেত্রে মুকুল না হয়ে নতুন পাতা বের হতে পারে। যাহোক আমের গুটি মটরদানার মত হওয়ার ১০-১৫ দিন পরপর ৩-৪ বার সেচ দিতে পারলে গুটি ঝরা বন্ধ হয় এবং আশানুরূপ উৎপাদন বেড়ে যায়। আম বাগানে সেচ বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে দেয়া যেতে পারে। 'বেসিন' পদ্ধতিতে গাছের চারদিকে আইল দিয়ে পানি আবদ্ধ রাখতে। এক্ষেত্রে প্রতিগাছে আলাদা আলাদা সেচ দিতে হয়। ঢালু পাহাড়ী জমিতে স্প্রিংকলার বা ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে। এতে ভূমি ক্ষয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আমগাছ গর্ত করেও সেচ দেয়া যেতে পারে। আমগাছের গোড়া থেকে দুই মিটার দূরত্বে ২০ সে. মি. গভীরে ১৫ সে. মি. প্রশস্ত ৪ টি গর্ত গাছের চারদিকে করতে হবে। প্রতিটি গর্তে পানি ভরে দিতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ শোষণের পর পুনরায় পানির দ্বারা ভরে দিতে হবে। তাছাড়া সম্পূর্ণ বাগানে ঢালাও ভাবে সেচ দেয়া যেতে পারে। সেচ দিতে পারলে আমের সাইজ বড় হয়, দেখতে আকর্ষণীয় হয়। আমের গুণাগুণ উন্নততর হয় এবং ফলন বেশি হয়।

আম বা আমগাছ নানা ধরনের পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

পোকা ও রোগ দমন ঃ আম বা আমগাছ নানা ধরনের পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে আমের হপারসম হ (The Mango Hoppers) দেশের সর্বত্রই আমের মারাত্নক ক্ষতি করে থাকে। তিনটি প্রজাতির হপার এর আক্রমণে আমের ফলন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই পোকাগুলোর অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিম্ন এবং পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থাতেই আম গাছের কচি পাতা ও ডগা থেকে রস চুষে খায়। সারা বছরেই এ পোকাগুলো আমগাছে থাকে। আম গাছের কাছে গেলে বা আমগাছের কান্ডে হাত রাখলে এ পোকাগুলোর স্পর্শ আমরা চোখ, মুখ ও শরীরে অনুভব করতে পারি। আমগাছে মুকুল আসার পর প্রতি মুকুলে অসংখ্য হপার নিম্ন দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নগুলো মুকুলের রস চুষে খায়। ফলে মুকুলে ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়। তাছাড়া নিম্নগুলো মুকুলের রস চোষার সাথে সাথে মলদ্বার দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আঁঠালো মধুরস (Honey dew) ত্যাগ করে যা মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় আটকে যায়। এই আঁঠালো পদার্থে ফুলের পরাগরেণু আটকে গিয়ে ফুলের পরাগায়ণ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে। পাতা ও ফুলে আটকানো মধুরসে Sooty mould fungus জন্মায় এবং ফুল ও পাতা কালো বর্ণ ধারণ করে। ফলে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় হপার আক্রান্ত মুকুলে কদাচিৎ ফল ধরে। হপারের আক্রমণের ফল আমের উৎপাদন ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। হপার আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধিও কমে যায়। সুতরাং আম পেতে হলে হপার দমন করতে হবে। সত্যিকথা

বলতে কি সারাদেশে যথাসময়ে হপার দমন না করার জন্যই আমের ফলন এত কমে গেছে। নিম্নে এর দমন পদ্ধতি দেয়া হলো।

আমগাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে এক মি. লি সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ ফিনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি অথবা ০.৫ মি. লি সুমিসাইডিন ২০ ইসি মিশিয়ে আমগাছের কান্ড, ডাল, পাতা ও মুকুল ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করলে আমের হপার দমন করা যায়। আমের মুকুলের পাউডারী মিলডিউ রোগ দমনের জন্য টিল্ট ২৫০ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. হারে) অথবা সালফার গুড়া বা ইমালসান (প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম হারে) আমের হপার দমনে কীটনাশকের সাথে মিশে একই

সাথে স্প্রে করা উচিত। চুনাজাতীয় বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ কীটনাশকসম হের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। হপার ও পাউডারী মিলডিউ দমন করে আমের ফলন অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব। পাউডারী মিলডিউ আমের শুধু মুকুলেই দেখা যায়; অন্যান্য গাছের ন্যায় পাতায় দেখা যায় না।

তাছাড়া The Mango Fruit Weevil, The Mango Shoot-gall, Psyllid Bug, The Mango Stem Borer, The Mango Fruit Fly, The Mango Leaf-cutting Weevil, The Mango Defoliator, The Mango Leaf-gall Midges, The Mango Twig gall এগুলোও আমের মারাত্তক ক্ষতিকর পোকা। আমের মারাত্নক ক্ষতিকর রোগগুলো হচ্ছে- এ্যানথ্রাকনোজ, পাউডারী মিলডিউ, সুটি মোল্ড, ম্যালফরমেশন, ডাইব্যাক বা ডগা মরা, রেডরাষ্ট, স্ক্যাব, কাল দাগ, পিঙ্করোগ এবং ফল পঁচারোগ।

কোনো কোনো আম গাছ একবছর ভালো ফলন দেয় এবং পরবর্তী বছর একেবারেই ফলন দেয় না।

অনিয়মিত ফল ধারণ (Alternate Bearing) ঃ বেশিরভাগ বাণিজ্যিক জাতে এক বছর ফল দিলে পরের বছর ফল আসে না। এক বছর পরপর ফল দেয়াকে 'অনিয়মিত/একান্তর/দ্বিবার্ষিক' ফল দেয়া বলে। কোনো কোনো গাছ একবছর ভালো ফলন দেয় এবং পরবর্তী বছর একেবারেই ফলন দেয় না। একে Alternate Bearing বলে। আবার কোনো জাতে প্রথমে একটি গাছের কিছু সংখ্যক ডালে ফল আসে এবং পরবর্তী বছর অন্য সব ডালে ফল দেয়। এই জাতীয় গাছে প্রতি বছরেই মোটামুটি ফল ধরে থাকে। এগুলো মাঝারি ফলনশীল জাত বলে। কিছু কিছু জাত যেমন ভারতের নীলাম ও তোতাপুরী ববং আমাদের দেশের গুটি আম গাছগুলো প্রতিবছরেই বেশ ভালো ফল দিয়ে থাকে। এগুলোকে নিয়মিত ফলনশীল জাত বলে। এমনকি এসব নিয়মিত ফলনশীল জাতেও যদি কোনো বছর প্রচুর ফল দেয় তবে পরবর্তী বছর ফলন কম হয়। অর্থাৎ সব জাতের আমগাছেই অনিয়মিত ফল ধারণ বা একান্তর বছর ফলনশীলতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যে বছর গাছে ফল আসে সে বছরকে On-year এবং যে বছর ফল আসে না সে বছরকে Off-year বলে।

গাছের বৃদ্ধির নমুনা, শর্করা ও নাইট্রোজেনের সঞ্চয়, হরমোনের ভারসাম্য, আবহাওয়ার প্রভাব এবং গাছে ফলের সংখ্যা এসবেই একান্তর বছর ফলনশীলতার কারণ।

ফল আহরণ, ফলন ও সংরক্ষণ

আম পচনশীল। যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে ফল সংগ্রহের ওপর ফলের পাকা, গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেকটা নির্ভরশীল। আবাত্তি বা অপরিপক্ক আম আহরণ করলে জাতের প্রকৃত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বেশি পাকা অবস্থায় সংগ্রহ করলে পোকা ও রোগজীবাণু সংক্রমণ বেশি হয়, সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়।

ফল আহরণ ঃ কিছু কিছু লক্ষণ দেখে পরিপক্কতা বা আম আহরণের সময় শনাক্ত করা যায়। যেমন- (১) বোঁটার নিচের অংশে আম কিছুটা হলুদাভ রং ধারণ করে (২) আম পরিপক্ক অবস্থায় পানিতে ডুবে যায় (৩) স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ থেকে দু'একটা আধাপাকা আম ঝরে পড়লে (৪) আম পরিপক্ক হলে এর বোঁটা থেকে কষ বা আঠা বের হয় তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং একটি স্বচ্ছ বিন্দুর আকারে জমা হয়। আম পরিপক্ক না হলে কষ মুক্তভাবে বের হয়ে আসে, এক জায়গায় জমা হয় না ও আমের ত্বক কুঁচকে যায় এবং (৫) ফল ধরার পর থেকে ৪-৫ মাসের মধ্যে আম পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছে।

তবে আম কতদিনে পাকবে তা নির্ভর করে জাত ও আবহাওয়ার ওপর। আমার গাছের সবগুলো ফল একই বয়সের হয় না। ফলে তাদের বাত্তি হওয়ার সময়ের মধ্যেও ব্যবধান থাকে। পরিপক্ক আম সবুজ ও শক্ত থাকতেই সংগ্রহ করতে হয়। বসত বাড়ির দু'একটি আমগাছের আম দু'তিন দফায় পেড়ে দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া যায়। কিন্তু বাগানের ক্ষেত্রে এবং দূরবর্তী স্থানে প্রেরণের জন্য একটি গাছের আম একবারে সংগ্রহ করা সুবিধাজনক।

গাছে ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়া অনুচিত। আঘাতপ্রাপ্ত আম সংরক্ষণ করা যায় না এবং তা খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

আম পাড়া বা আহরণের পদ্ধতি ঃ গাছে ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়া অনুচিত। আঘাতপ্রাপ্ত আম সংরক্ষণ করা যায় না এবং তা খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যথা সম্ভব আম হাত দিয়ে পাড়াই উচিত। অথবা কোটার (Bamboo-pole-pickes) সাহায্যে আম পাড়া যায়। কোটার বংশদন্ডটি হালকা, শক্ত, সোজা এবং ২-৬ মিটার লম্বা। বংশ দন্ডের সরু প্রান্ত ভাগে একটি চাকের সাথে দড়ির তৈরি একটি জাল বা থলে থাকে। কোটার থলের মধ্যেই আমকে নিয়ে টান দিলেই আমটি বোঁটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থলের মধ্যে জমা হয়। মাটিতে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব বা গাছে উঠে এই কোটার সাহায্যে আম পাড়া উচিত।

বাছাইকরণ ঃ বাজারজাতকরণ এবং সংরক্ষণের আগে আম বাছাই করা উচিত। পাকা আম স্থানীয় বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয়। ক্ষতযুক্ত ও মাটিতে পড়া আম বাদ দেয়াই ভালো। আর সব আম বড়, মাঝারী ও ছোট এই তিনটি গ্রেডে পৃথক করে প্যাকিং বাস্কেটে নেয়া উচিত।

ফলন ঃ জাত, পরিচর্যা এবং স্থানীয় আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। কলমের গাছ ৪র্থ বা ৫ম বছর থেকেই ফল দেয়া শুরু করে। প্রথম দু'এক বছর ১০-১৫ টি আম ধরে। পরবর্তী বছরগুলোতে এ সংখ্যা বেড়ে ৫০-৭৫ টি হয়। দশমবর্ষে গাছ প্রতি প্রায় ৫০০ টি আম পাওয়া যেতে পারে। ২০-৪০ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে অন-ইয়ার ১০০০-৩০০০ টি আম (গড় ওজন ২০০-৬০০ কেজি) পাওয়া যায়। কলমের গাছে উৎপাদন ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে তারপর ক্রমান্বয়ে কমে যেতে পারে।

সংরক্ষণ ঃ অধিক নিু তাপমাত্রায় আম সংবেদনশীল (Susceptible to cold injury)। অধিকাংশ জাতের আম ৫.৬-৭.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বাঁশের ঝুড়ি, বাস্কেট বা ক্রেটে ৪-৭ সপ্তাহ ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। আম আহরণের পর এতে কোনো রোগ যেমন Stem end rot ev Black spot হতে না পারে বা সুটি মোলড নষ্ট করে আমের ত্বককে আকর্ষণীয় করা যায় সেজন্য আমকে ৫২ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে তারপর ঠান্ডা করে ৯.০ থেকে ১০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চার সপ্তাহ পর্যন্ ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এসব আমে কোনো রকম দাগ পড়ে না।

অনুশীলন (Activity): *আমের বংশ বিস্তারের বিভিন্ন অঙ্গজ পদ্ধতিসম হের নাম লিখুন এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।*

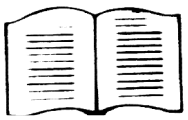

সারমর্ম ঃ আম উষ্ণ এবং অব-উষ্ণমন্ডলের ফল। বাংলাদেশ আমের আদি জন্মস্থান এলাকার অন্তর্ভুক্ত। আম উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা দরকার। সেচ সুবিধা থাকলে বছরে ২৫০ মি. মি. বৃষ্টিপাত যথেষ্ট। আম যেহেতু পরপরাগায়িত ফল; সেজন্যে একমাত্র কলমের সাহায্যেই কোনো জাতের বৈশিষ্ট বংশ পরম্পরায় ধরে রাখা যায়। আমের আশু, মধ্যম ও নাবী জাত আছে। 'টপ ওয়ার্কিং' পদ্ধতির মাধ্যমে আঁটির গাছটি কাংখিত কলমের গাছে রূপান্ি রিত করা সম্ভব। অনিয়মিত ফল ধারণ আম উৎপাদনে একটি প্রধান সমস্যা। ফল ধরার পর থেকে ৪-৫ মাসের মধ্যে আম পরিপক্ক হয়ে যায়। আমের ফলন গাছের বয়স ও জাতের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

১।   নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে ‘সত্য’ এবং মিথ্যা হলে ‘মিথ্যা’ লিখুন।

ক) আমে খাদ্যপ্রাণ বি, বি-১ ও বি-২ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।
খ) পুষ্পমঞ্জরীতে শতকরা ৯০ ভাগ স্ত্রীফুল থাকে।
গ) আম উদ্ভিদতত্ত্বে ড্রুপ নামে পরিচিত।
ঘ) আমের আটি থেকে চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয় না।
ঙ) কলমের গাছের বয়স ৩-৪ বছর পউর্ণ হওয়ার পরই ফুল ও ফল ধরতে দেওয়া উচিত।

২।   শউন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) পাকা আম খাদ্যপ্রাণ .... তে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।
খ) একই পুষ্পমঞ্জরীতে ...., ... ও .... ফুল থাকে।
গ) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মুক্তায়িত জাতের নাম .... ।

৩।   সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) কোন্‌টি বামন জাতের আম?
   ক) গোপালভোগ
   খ) আম্রপালি
   গ) খিরসাপাত
   ঘ) হিম সাগর

ii) ভারত উপমহাদেশে কত বৎসর ধরে আমের চাষ হ্েছ?
   ক) ২০০০ বৎসর
   খ) ৩০০০ বৎসর
   গ) ৪০০০ বৎসর
   ঘ) ৫০০০ বৎসর

iii) বাংলাদেশের সবচেয়ে আগাম আমের জাত কোন্‌টি?
   ক) গোপালভোগ
   থ) খিরসাপাত
   গ) ফজলি
   ঘ) ল্যাংড়া

পাঠ ৭.২ লিচু

এ পাঠ শেষে আপনি –

- লিচুর উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- লিচুর উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লিচুর জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

লিচুর উৎপত্তিস্থল চীনদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। এটা চীন দেশে ৩০০০ বৎসরের অধিক কাল ধরে চাষ হয়ে আসছে।

লিচুর উৎপত্তি চীনদেশে। সেখানে এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল।

উৎপাদন

এফলটি চীনদেশের জনগনের অত্যন্ত প্রিয় ফল এবং অদ্যাবধি চীনদেশেই এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়। উৎপাদনের দিক থেকে ইন্ডিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য যে সব দেশে লিচুর প্রসার ঘটেছে সেদেশগুলো হচ্ছে- ইন্দো-চায়না, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ জাপান, তাইওয়ান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মৌরিশাস, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল ববং যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই এবং ফ্লোরিডা। বাংলাদেশে এফলটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তন হয়। বাংলাদেশে অল্প বিস্তর সর্বত্রই বসতভিটায় লিচুগাছ দেখতে পাওয়া যায়। তবে ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোহর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে লিচুর চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বা বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ৪,০০০ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয় এবং ১০,৫০০ টন লিচু উৎপাদিত হয়।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার ঃ বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন জাতের লিচুর পুষ্টিমান কমবেশি হয়ে থাকে। ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জাতের চিনির পরিমাণ ৬.৭৪ থেকে ১৮.৮৬% পাওয়া গেছে। চিনি ছাড়াও ০.৭% আমিষ, ০.৩% চর্বি, ০.৭% খনিজ (বিশেষ করে ক্যালসিয়াম এবং ফসফোরাস) এবং খাদ্যপ্রাণ সি (৬৪ মি. গ্রা. প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে), এ বি-১ ও বি-২ লিচুতে পাওয়া গেছে। লিচু পাকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও অনেক দেশে এর প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য খুবই জনপ্রিয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

লিচু Sapindaceae পরিবারের এবং Nephelae উপ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এ উপ-পরিবারে ১০০ টি এবহঁং এবং ১০০০ এর বেশি Species বা প্রজাতি রয়েছে। তবে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি ফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন লিচু, রামবুটান ও আঁশফল। লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম *Litchi chinensis*. এটি Nephelium litchi নামেও পরিচিত।

লিচুগাছ দ্বিবীজপত্রী, চিরহরিৎ ও বহুবর্ষজীবী। লিচুগাছ মধ্যম আকৃতির হয়ে থাকে। এটা ১০ মিটার বা আরও উঁচু হতে পারে। পাতা যৌগিক। এর চার থেকে সাতটি অনুপত্রক থাকে। প্রতিটি অনুপত্রক ৭ থেকে ১০ সে. মি. লম্বা হয়। পাতার ওপর দিক চকচকে ঘন সবুজ। কিন্তু নিচের দিক ধূসর-সবুজাভ। গাছের বাকল অগভীর এবং বাদামি রংয়ের। গাছের মূল অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিস্তৃত হয়।

ঈুষ্পমঞ্জুরী একটি যৌগিক রেসিম এবং প্রান্তিক প্রশাখায় বের হয়। পুষ্পমঞ্জুরী ধাপে ধাপে বের হয়।

পুষ্পমঞ্জরী একটি যৌগিক রেসিম (Compound raceme)। এগুলো প্রান্ি ক প্রশাখায় (Terminal branch) বের হয়। এতে উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল থাকে। পুষ্পমঞ্জরীর উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল একসাথে প্রস্ফুটিত হয় না। ফলে ফল ধারণের জন্য পরপরাগায়নের প্রয়োজন হয়। একবারেই সব পুষ্পমঞ্জরী বের হয় না। ধাপে ধাপে বের হয়। পরিপক্ক লিচুফলে একটি করে বীজ থাকে। মৌমাছি ও বিভিন্ন মাছি দ্বারা পরপরাগায়িত হয়ে প্রতি ঝোপায় ১৫-২০ টি ফল ধরে। ফল বিভিন্ন রং, আকৃতি ও সাইজের হয়ে থাকে। ফলের চারদিকে ভক্ষণযোগ্য অংশকে এরিল (Aril) বলে।

চিত্র ৭.২.১ঃ বোম্বাই জাতের একগুŽছ লিচু

জাতসমুহ ঃ লিচু যেহেতু পরপরাগায়িত এর অনেক স্থানীয় জাত সৃষ্টি হয়েছে। তবে এগুলো গুণেমানে খুবই উৎকৃষ্ট হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে 'রাজশাহী লোকাল' ও 'দিনাজপুর লোকাল' জাত দু'টি বেশ উন্নতমানের। রাজশাহী লোকাল আশুজাত এবং দিনাজপুর লোকাল নাবিজাত। এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলের 'বোম্বাই' লিচু, দিনাজপুরের 'বেদানা' এবং ঢাকার সোনারগাঁওয়ের 'কদমী' লিচু বেশ প্রসিদ্ধ।

চলি-শ দশকের শেষ ভাগে চীনদেশ থেকে চায়না-১, ২ ও ৩ এই তিনটি লিচুর জাত ঢাকার মনিপুর গবেষণা ফার্মে প্রবর্তন করা হয়। এগুলোর মধ্যে চায়না-২ এবং চায়না-৩ আজও প্রচলিত আছে। চায়না-৩ জাতটি খুবই উৎকৃষ্ট জাত হিসেবে পরিচিত। 'কদমী' লিচু জাতের ফল প্রায় দ্বিগুণ বড় হয় এবং বীজ তুলনাম লকভাবে ছোট এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ বেশি।

বংশ বিস্তার

যৌন পদ্ধতিতে অর্থাৎ বীজ দ্বারাও লিচুর বংশ বৃদ্ধি হয়। তবে লিচুর বংশবৃদ্ধির জন্য গুটি কলম উত্তম পদ্ধতি হিসেবে সর্বত্রই স্বীকৃত। রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত গাছেই গুটি কলম করতে হয়। এরকম সুস্থ গাছের এক বছর বয়সের ডাল যেগুলো উপরের দিকে সোজা বা ৪৫ ডিগ্রী কোনে হেলে আছে এসব ডালেই গুটিকলম করা হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে লিচুর গুটি কলম বাঁধার উপযুক্ত সময়। শিকড়

আসতে প্রায় দু'মাস সময় নেয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গুটি নামিয়ে যথাযথ পরিচর্যা নিলে এগুলো বেশির ভাগ টিকে যায়।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু ঃ লিচু অবউষ্ণ মন্ডলের ফল এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এর চমৎকার বৃদ্ধি ঘটে। গ্রীষ্মকালের আর্দ্রতাবিহীন অত্যাধিক গরম এর চাষের জন্য ক্ষতিকর। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সে. মি. এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০-৮০% লিচু চাষের উপযোগী। লিচু সমতল ভূমির ফসল হলেও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০ মি. উচ্চতায় জন্মাতে পারে। গাছে ফুল আসার জন্য শীতাবেশ প্রয়োজন হয়।

মাটি ঃ লিচুগাছ বিভিন্ন ধরণের মাটিতে জন্মাতে পারে যদি তা পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত থাকে। মাটি দোআঁশ, জৈবসার সমৃদ্ধ এবং গভীর হলে খুবই ভালো। গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। মাটি কিছুটা অম্লহলে লিচুগাছের জন্য উত্তম কারণ মাইকোরাইজা (Mycorrhiza) ম্লমাটি পছন্দ করে। লিচুর শিকড় মাইকোরাইজা এর আশ্রয়স্থল এবং এরা পরস্পরের উপকার করে।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

বসতভিটায় দু'একটি গাছ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি প্রয়োজন নাই। গাছ রোপণের গর্তগুলো (Planting pit) করলেই চলবে। কিন্তু লিচুর বাগান করতে চাইলে সে জমি সমান করে নিতে হবে এবং চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে।

রোপণের দ রত্ব ও রোপণের সময়

লিচু গাছ ১০ থ ১০ মিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। ১০ মিটার দূরে দূরে লাইন টেনে লাইনে ১০ মিটার দূরে দূরে গাছ রোপণ করতে হবে। প্রথমেই মাপজোক করে কাঠি পুঁতে গাছ রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। এরপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে এক মিটার গভীর করে ১ থ ১ মিটার সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। এসময় 'টপ সয়েল' আলাদা রাখতে হয়। গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগেই সার ও মাটি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসেই লিচুর চারা রোপণের উত্তম সময়। তবে যত্ন নিতে পারলে ভাদ্র-আশ্বিনেও রোপণ করা যেতে পারে।

জ্যৈষ্ঠ (May-June) মাসেই লিচুগাছ রোপণের উত্তম সময়। এসময় রোপণ করলে গাছ তাড়াতাড়ি লেগে উঠে এবং কম মারা যায়। তাছাড়া যত্ন নিতে পারলে ভাদ্র-আশ্বিনেও (August-September) লিচুগাছ রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ

প্রথমে 'টপ সয়েলের সাথে গর্তপ্রতি ১০ কেজি গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে। এরপর ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার গর্তের উপরের ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। এখন রোপণের জায়গাটি কাঠি পুঁতে নিদিষ্ট করে রাখতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর লিচুর কলম উক্ত গর্তে রোপণ করা যাবে। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ার মাটির বলটি না ভেঙ্গে যায়। এরপর গাছটি মাটিতে বসিয়ে চারদিকের মাটি পা দিয়ে শক্ত করে বসে দিতে হবে এবং রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে। যতদিন গাছ লেগে না ওঠে এবং বর্ষা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সপ্তাহে দু'তিন দিন সেচ দেয়া ভালো। রোপণের পরপরই গাছের গোড়া যাতে বাতাসে বা জীবজন্তুতে না নড়ে সেজন্য সুতলী দিয়ে গাছটি কাঠিগুলোর সাথে বেঁধে দিতে হবে। পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত কাঠিগুলো যথাস্থানে থাকা প্রয়োজন। মনে রাখা

দরকার লিচুগাছ খুবই স্পর্শকাতর। সহজেই মরে যায়। সুতরাং রোপণের পর এর সযত্ন পরিচর্যা দরকার।

পরিচর্যা

সার উপরি প্রয়োগ ও সেচ ঃ লিচুগাছে বছরে দু'বার সার দিতে হবে। প্রথম কিস্তি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তি ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। গাছের সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ দরকার। প্রথম চার বছর যে হারে সার দিতে হবে তা সারণি ২ এ দেয়া হলো।

সারণি ২ঃ প্রথম চার বছর লিচু গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ।

গাছের বয়স	গোবর সার কেজি/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর	ইউরিয়া গ্রাম/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর	টিএসপি গ্রাম/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর	এমপি গ্রাম/প্রতিগাছ/ প্রতিবছর
১	৫	১৭০	৫০	১২৫
২	৫	২২০	৫০	১৭০
৩	৫	৩২০	১১০	২৫০
৪	৫	৫৫০	১৬০	৪২০

সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি প্রথম কিস্তিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একসাথে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়া থেকে ৫০ সে. মি. দূরত্বে সার প্রয়োগ করাই উত্তম। সার দেয়ার পরপরই সেচ প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এমপি সার দ্বিতীয় কিস্তিতে ভাদ্র-জ্যৈষ্ঠ মাসে একইভাবে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দেয়া ভালো। সার প্রয়োগ মাটির উর্বরতা, গাছের দূরত্ব ও বৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের গাছে প্রতিবছর নিম্নোক্ত পরিমাণ সার দেয়া যেতে পারে।

গোবর সার- ১০ কেজি, ইউরিয়া-১২৫০ গ্রাম, টিএসপি-৪০০ গ্রাম ও এমপি-১০০০ গ্রাম। সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্দ্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার গাছের গোড়া থেকে ৩০-৪০ সে. মি. দূরত্বে মাটির সাথে চাষ দিয়ে মিশে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। বাকী অর্দ্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার একইভাবে দ্বিতীয় কিস্তিতে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে এবং সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। এরপর ফলন্ত গাছে ফুল আসার পর থেকে শুরু করে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিলে ফল বড় হয় এবং ফলন বাড়ে। পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়ে।

নার্সারিতে থাকতে এবং রোপণের প্রথম কয়েক বছর গাছের কিছু ট্রেনিং এবং প্রুনিং দরকার আছে।

ট্রেনিং এবং প্রুনিং ঃ ফলন্ত লিচুগাছে ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর দরকার নাই। নার্সারিতে থাকতে এবং রোপণের পর কয়েক বছর গাছের কিছু ট্রেনিং এবং প্রুনিং দরকার আছে। যাতে গাছের একটি মাত্র প্রধান কান্ড কমপক্ষে এক থেকে দু'মিটার উঁচু হতে পারে। এজন্য পাশের অন্যান্য ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। এরপর ৪-৫ টি ডালগাছের চতুর্দিকে বাড়তে দিতে হয় যাতে গাছ অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখী হয়। এতে গাছের ভিতর সরাসরি আলো বাতাস চলাচল করতে পারবে এবং এর ফলে রোগবালাই ও পোকামাকড় কম হবে। এছাড়া প্রতিবছর বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হয়।

লিচু ফল একবছর বয়সের প্রান্ত শাখায় হয়ে থাকে।

লিচু ফল এক বছর বয়সের প্রান্ত শাখায় হয়ে থাকে। ফল আহরণের সময় শাখার কিছু অংশ ফলসহ ভেঙ্গে নেয়া হয়। শাখার কিছু অংশ ভাঙ্গার ফলে নতুন শাখা-প্রশাখা বের হয় সেগুলো পরবর্তী বছর ফল দেয়। এর বেশি ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

রোগ ও পোকামাকড় দমন ঃ লিচুর তেমন কোনো মারাত্মক রোগ নাই। তবে Litchi Mite লিচুগাছের অতি ক্ষুদ্র মাকড় ও Litchi Fruit Borer লিচু ফলের বীজখেকো মাজরা পোকা লিচু ফলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।

লিচুগাছের পাতার অতি ক্ষুদ্র মাকড় ঃ আক্রান্ত লিচু গাছের পাতাগুলো মাকড়ের আক্রমনে লাল ভেলভেট এর মত দেখতে এবং পাতাগুলো কুঁকড়িয়ে ভালো পাতার তুলনায় আলাদা আকৃতি ও বর্ণের হয়। পাতা ছাড়াও কচি ফলের গায়ে লাল রংয়ের মরিচার মত মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়। মাকড়ের

আক্রমণে পাতা মরে গাছ দুর্বল হয় এবং ফল উৎপাদন কমে যায়। ফল সংগ্রহের পর আক্রান্ত সকল পত্রগুচ্ছ কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেসব এলাকায় মাকড়ের আক্রমণ বেশি দেখা যায় সেখানে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে একবার করে প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মি. লি. নিউরোন ৫০০ ইসি বা ১.০ গ্রা. টর্ক ৫০ ডব্লিউ পি বা ২.০ মি. লি. কেলথেন ৪২ এম এফ মিশিয়ে গাছের পাতায় ভালোভাবে

স্প্রে করতে হবে। যেখানে আক্রমণ কম সেখানে আক্রান্ত পত্রগুচ্ছ কেটে পুড়ে ফেলতে হবে অথবা মাকড়নাশক ঔষধ স্প্রে করে মাকড় দমন করতে হবে। উল্লিখিত মাকড়নাশক ঔষধগুলো পাওয়া না গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. ডায়জিনন ৬০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করলে মাকড় দমন সম্ভব হবে।

লিচু ফলের বীজখেকো মাজরা পোকা ঃ কোনো কোনো এলাকায় লিচু ফলের বোটার দিকে ফলের খোসার নিচেই মাজরা পোকার কীড়া দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে পোকা দমনের জন্য ফল পাকার ১৫-২০ দিন আগে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি. লি. সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস) ১০ ইসি বা

ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করে ফলগুলো ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। তাইলে এ পোকা দমন করা সম্ভব হবে।

মালচিং ঃ মাটিতে রস কম থাকলে লিচুগাছের বৃদ্ধি কমে যায়। তাই সম্ভব হলে রোপণের ৪-৫ বছর

পর্যন্ত বর্ষার শেষে সার দিয়ে সেচ দেয়ার পরপরই খড় বা শুকনো ঘাস/আগাছা বা কচুরিপানা দিয়ে মালচিং দিলে গাছের শিকড় বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হয়। মাটিতে রস ধরে রাখে, বৃষ্টি বা সেচের পানি মাটিতে বেশি ঢুকতে পারে, আগাছা দমন হয় এবং গাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

ফুল বের হওয়া ও ফল ধারণ ঃ গুটি কলমের গাছে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের গাছেই ফুল আসে। তবে চার বছর বয়সের আগে কোনমতেই ফল রাখা উচিত নয় অর্থাৎ সেসব গাছের ফুল ছাঁটাই করে দিতে হবে। বীজের গাছে ফুল আসতে ৮-১২ বছর লাগতে পারে। ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে লিচুগাছে ফুল আসে। ফুল আসার পূর্বে কয়েকমাস গাছের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে এবং থাকা প্রয়োজন। শুষ্ক মৌসুম ও শীত গাছের বৃদ্ধি প্রাকৃতিকভাবেই বন্ধ করতে সাহায্য করে। সেজন্য এদেশের আবহাওয়া লিচু উৎপাদনের জন্য খুবই অনুকূল। তবে ফুল আসার পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ উপকারী। অতি শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ও ফল ঝড়ে পড়ে। সেচ ফল বড় করে এবং ফলন বৃদ্ধি করে।

ফুল বের হওয়ার পর থেকে পরাগায়িত হওয়া পর্যন্ত ২৬ থেকে ৩৫ দিন সময় লাগে। মৌমাছি এবং অন্যান্য মাছি লিচুর পরপরাগায়ণে সাহায্য করে। যদিও লিচু গাছে অসংখ্য ফুল হয় কিন্তু এর শতকরা অল্পভাগই ফল ধারণ করে। আর ফল যত ধরে তার অল্প অংশই বড় হয়। ফল যত ধরে তার শতকরা ৩.০ থেকে ৩৯.৬ ভাগ ফল বড় হয়।

ফল আহরণ ও সংরক্ষণ

আহরণ ঃ ফল ধারণ থেকে শুরু করে ৫৫-৬০ দিন পরেই ফল আহরণের উপযুক্ত হয়। ফলের রংই ফল আহরণের সময় হয়েছে কি না বলে দেবে। তবে এসময় ফলের ত্বকের উপরের কাঁটাগুলো (Tubercles) সমান হয়ে যায়। গাছে সব ফল একসাথে পাকে। তাই গাছের যে অংশের ফল পাকে সে অংশের ফলই পাড়া উচিত। অর্থাৎ এক গাছে কয়েকবার ফল পাড়তে হবে। শাখার কিছু অংশ পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচু ফল আহরণ করতে হয়। এতে লিচু বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

শাখার কিছু পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচুফল আহরণ করতে হয়। এতে লিচু বেশিদিন সংরক্ষণ করা।

যথাযথ পরিচর্যা পেলে লিচুগাছ ১০০ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফল দিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচুগাছ থেকে বছরে ৮০ থেকে ১৫০ কেজি ফল আহরণ করা যেতে পারে।

সংরক্ষণ ঃ আহরণের পরপরই ফল খারাপ হওয়া শুরু করে। বিশেষ করে ফল আহরণের পর যদি রোদে রাখা হয় তবে ফল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে লিচু ফল ২.২ থেকে ৩.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় একমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সুতরাং সংরক্ষণের জন্য হিমাগার পাওয়া গেলে লিচু আরও মাসাধিককাল বাজারজাত করা সম্ভব হ'ত।

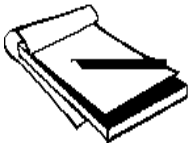

অনুশীলন (Activity) ঃ *লিচু গাছে ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর কেন দরকার হয় এবং এটা গাছের কোন্ পর্যায়ে করা উচিত। বীজ দ্বারা লিচুর বংশ বিস্ তারের কয়েকটি অসুবিধা বর্ণনা করুন।*

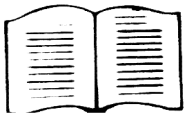

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশে লিচু অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তন করা হয়। এটা অবউষ্ণমন্ডলীয় ফল এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এর চাষ ভালো হয়। জৈবসার সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশনযুক্ত গভীর দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম। পুষ্পমঞ্জরী ধাপে ধাপে বের হয় এবং পুষ্পমঞ্জরীর উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল একসাথে ফোটেনা। সুতরাং পরপরাগায়ণের প্রয়োজন হয়। রাজশাহী, দিনাজপুর এবং ঢাকার সোনাগাঁয়ের লিচু প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের লিচুগাছের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ বীজের চারা থেকেই উৎপন্ন। তবে জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য গুটিকলম উত্তম পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। জ্যৈষ্ঠ মাসেই চারা রোপণের সঠিক সময়। নার্সারিতে বা রোপণের প্রথম কয়েক বছর গাছের কিছুটা ট্রেনিং এবং প্র€নিং এর দরকার আছে। লিচুফল একবছর বয়সের প্রান্ শাখায় হয়ে থাকে। শাখার কিছু অংশ পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচুফল আহরণ করতে হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচুগাছ থেকে বছরে ৮০-১৫০ কেজি ফল আহরণ করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৭.২

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) পুষ্পমঞ্জরী একটি যোগিক রেসিম এবং এগুলো প্রান্তিক প্রশাখায় বের হয়।

খ) ফল থেকে বীজ বের করার দিন থেকেই বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

গ) ফলন্ত লিচুগাছে ট্রেনিং এবং প্রুনিং করতে হয়।

ঘ) শাখার কিছু অংশ পাতাসহ গোছায় গোছায় লিচুফল আহরণ করতে হয়। এতে লিচু বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।

২। শ ন্যস্থান প রণ কর€ন

ক) লিচুফলের চারদিকে ভক্ষণযোগ্য অংশকে ..... বলে।

খ) পুষ্পমঞ্জরীর উভলিঙ্গ এবং একলিঙ্গ ফুল একসাথে প্রস্ফুটিত হয় না। ফলে ফল ধারণের জন্য ..... প্রয়োজন হয়।

গ) ..... মাসেই লিচুগাছ রোপণের উত্তম সময়।

ঘ) ফুল ধারণ থেকে শুরু করে ..... দিন পরেই ফল আহরণের উপযুক্ত হয়।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) কোন্‌টি আস্ত জাতের লিচু?

ক) রাজশাহী লোকাল

খ) দিনাজপুর লোকাল

গ) বেদানা

ঘ) চায়না - ৩

ii) কোন্ জাতের লিচু সবচেয়ে বড় ও বিচি ছোট?

ক) বেদানা

খ) বোম্বাই

গ) কদমী

ঘ) চায়না - ৩

পাঠ ৭.৩ কাঁঠাল

এ পাঠ শেষে আপনি –

- কাঁঠালের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- কাঁঠালের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কাঁঠালের জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কাঁঠালের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

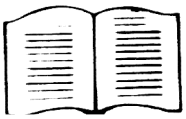

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ফল এটি। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের 'ওয়েষ্টার্ন ঘাট' জঙ্গলে কাঁঠালের উৎপত্তিস্থল (Centre of origin)। কাঁঠাল এ অঞ্চলে স্মরণাতীতকাল থেকে চাষ হয়ে আসছে। পরবর্তীতে অনেক উষ্ণমন্ডলীয় দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে কাঁঠালের প্রবর্তন হয় এবং সেসব দেশের আবহাওয়ার সাথে কাঁঠাল সাফল্যজনকভাবে খাপ খেয়ে নেয়।

উৎপাদন

কাঁঠাল বর্তমানে উভয় গোলার্ধের উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজে এর ব্যাপক চাষ হয়। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে এ ফল বেশ জনপ্রিয়।

বাংলাদেশে কাঁঠালের ব্যাপক চাষ হয় এবং এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম বাণিজ্যিক ফল। বাংলাদেশে ২৪৫৮০ হেক্টর জমিতে কাঁঠালের গাছ আছে এবং প্রতিবছর ২৫৩২৫০ টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়ে থাকে। উৎপাদনের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে অর্থাৎ কলার পরই এর স্থান। মোট ফল উৎপাদনের শতকরা ১৬.৬ ভাগই হচ্ছে কাঁঠাল। বাংলাদেশের সর্বত্রই কাঁঠালের চাষ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি কাঁঠাল জন্মে সাভার অঞ্চলে, গাজীপুর জেলা, যশোহর, কুষ্টিয়া, ভালুকা, মধুপুর, মৌলভীবাজার, রামগড়, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

কাঁঠাল ভক্ষণযোগ্য ফলের মধ্যে সর্ববৃহৎ ফল। কাঁঠাল কয়েক কেজি ওজন থেকে শুরু করে ৫০ কেজি বা তদুর্দ্ধ হতে পারে।

কাঁঠাল ভক্ষণযোগ্য ফলের মধ্যে সর্ববৃহৎ ফল। কাঁঠাল কয়েক কেজি ওজন থেকে শুরু করে ৫০ কেজি বা তদুর্দ্ধ হতে পারে। কাঁঠাল ফল কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। কাঁচা ফল সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠালের বিভিন্নতা দেখা গেছে। এর ভক্ষণযোগ্য অংশ (বীজসহ কোয়া যেহেতু বীজও ভক্ষণযোগ্য) শতকরা ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ পাওয়া গেছে। পাকা ফলের টিএসএস বা মিষ্টতা ১০ থেকে ৩০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাকা ফল খাদ্যপ্রাণ এ সমৃদ্ধ।

ব্যবহার

কাঁঠালের কাঠে উই লাগেনা ও ছাতা পড়েনা। সেজন্য আসবাবপত্র তৈরিতে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কাঠ থেকে হলুদ রং বের করে বৌদ্ধ পুরোহিতদের কাপড় রং করা হয়। কাঁঠালের কাঁচা পাতা গোবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য। এর শুকনো পাতা এবং শাখা-প্রশাখা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়। ঔষধ হিসেবে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে যেমন- তাজা বীজের রস ডাইরিয়া এবং আমাশয় ভালো করে। এর কাঁচা পাতা গরম করে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে, ঘায়ের ওপর বা কানের সমস্যায় এবং ব্যথা উপশমে বেশ কার্যকর।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

কাঁঠাল Moraceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus* Lamk. আর একটি হচ্ছে *Artocarpus chaplasha* Roxb.এটি সাধারণত চাপালিশ বা চাপলাশ নামেই পরিচিত।

কাঁঠালগাছ বহুবর্ষজীবী, দ্বিবীজপত্রী, চিরহরিৎ বৃক্ষ। এগাছ ১০-১৫ মি. উচু হয়ে থাকে। গাছের যে কোনো জায়গা আঘাতপ্রাপ্ত হলে সাদা কষ (Latex) বের হয়। বাকল অমসৃণ এবং গাঢ়বাদামি রংয়ের হয়ে থাকে। পাতা গাঢ় সবুজ, উপবৃত্তাকার এবং একান্তরভাবে সাজানো। পাতার নিচের ভাগ অবশ্য মলিন সবুজ। পাতার কিনারা সমান। তবে ছোট গাছের পাতায় এক থেকে দু'জোড়া Lobbed থাকতে পারে।

স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল একই গাছে পৃথক পৃথকভাবে ধরে। প্রধান কান্ড থেকে যে ফুলগুলো বের হয় সেগুলো স্ত্রীফুল।

স্ত্রীফুল ও পুরুষ ফুল একই গাছে পৃথক পৃথকভাবে ধরে। সাধারণতঃ প্রধান কান্ড থেকে যে ফুলগুলো বের হয় সেগুলো প্রায়ই স্ত্রীফুল হয়ে থাকে। আবার প্রান্ত শাখা থেকে যেগুলো ফুল বের হয় সেগুলো প্রায় সবই পুরুষ ফুল হয়ে থাকে। পুষ্পমঞ্জরীদন্ডে অনেক ফুল একত্রে আসে। স্পাইক ধরনের এই পুষ্পমঞ্জরী দুটি ডেগা (Sheath) দ্বারা ঢাকা থাকে। প্রতি বোঁটায় কয়েকটি করে মঞ্জুরী থাকে এবং প্রথমাবস্থায় এগুলো খয়েরী ডেগা দ্বারা আবৃত থাকে। স্ত্রীমঞ্জুরীর উপরিভাগ দানাদার ও অমসৃণ হয় এবং মঞ্জুরীদন্ড মোটা ও খাট হয়। পুরুষ মঞ্জুরী পুষ্পপুট (Perianth) দ্বারা ঢাকা। পুংকেশর পরাগরেণু বিদারণের সময় পুষ্পপুটকে বিদীর্ণ করে মঞ্জুরীর উপরিভাবে চলে আসে। মঞ্জুরীর উপরিভাগ কয়েকদিনের মধ্যেই হলুদ পরাগরেণুতে ভরে যায়। পরাগরেণু বিদারণের ৩-৪ দিনের মধ্যেই পর-পরাগায়ন এবং গর্ভাধান সম্পন্ন হয়।

কাঁঠালের ফল বহুফলের (Multiple fruits) সমষ্টি এবং সরোসিস নামে পরিচিত। একটি কাঁঠালের মধ্যে অনেক কোয়া থাকে। প্রত্যেকটি কোয়াই একটি ফল।

চিত্র ৭.৩.১ঃ ফলসহ কাঠাল গাছ

কাঁঠাল পরপরাগায়িত এবং এর বংশ বিস্তার বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেকটি গাছই একটি আলাদা জাত।

জাতসম হ

যেহেতু কাঁঠাল পরপরাগায়িত এবং এর বংশবিস্তার সাধারণত বীজ দ্বারা হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি গাছই একটি আলাদা জাত। একটি গাছের কাঁঠালের সাথে আর একটি গাছের কাঁঠালের মিল নাই। যাহোক বহু কাঁঠাল গাছ যেগুলো ফলের গুণাগুণের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে নাম করা হয়। যেমন 'গোলাপী'- যে ফলগুলোতে গোলাপের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আবার 'চাম্পা'-যে ফলগুলোতে কাঁঠালীচাঁপার সুবাস পাওয়া যায়।

যে কাঁঠালগুলো ফল হিসেবে খাবার উপযুক্ত সেগুলো চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন–

কাঁঠাল ফলকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন (১) খাজা (২) গালা (৩) মধ্যম এবং (৪) হাজারী।

(১) খাজা শ্রেণি ঃ এ শ্রেণির ফল কচকচে (Crispy) এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত। রস কম এবং কোয়া টিপলেও রস বের হয় না। মিষ্টি কমবেশি হতে পারে।

(২) গালা শ্রেণি ঃ পাকার পর কোয়াগুলো নরম এবং খুব রসাল হয়। কোয়া চিপে সহজেই রস বের করা যায়। এগুলো সাধারণত খুব বেশি মিষ্টি হয়ে থাকে।

(৩) মধ্যম শ্রেণি ঃ পাকা ফলের কোয়াগুলো ততশক্ত বা গালা নয়।

(৪) হাজারী কাঁঠাল ঃ এশ্রেণির গাছের গোড়া থেকে শুর€ করে ছোট ছোট প্রচুর কাঁঠাল ধরে সেজন্যেই হাজারী কাঁঠাল বলা হয়। এজাতের বীজের গাছে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে। সম্ভবতঃ এ শ্রেণির গাছ স্বপরাগায়িত। চিত্র- ৭.৩.১ এ কাঁঠাল গাছে ফল ধারণ দেখানো হয়েছে। পরাগায়ণ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্্ন্ন না হলে ফলের আকারের বিকৃতি ঘটে।

জলবায়ু ও মাটি

কাঁঠাল উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। প্রচুর বৃষ্টি ও আর্দ্র আবহাওয়া কাঁঠালের জন্য উপযোগী। আমাদের দেশের তাপমাত্রা কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধির জন্য খুব উপকারী। ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো। কাঁঠাল গাছ মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমিতে কাঁঠাল ভালো জন্মে।

নির্বাচিত উন্নতজাত হয় কলমের সাহায্যে অথবা নিয়ন্ি ত পরা-গায়ণের মাধ্যমে সৃষ্ট বীজের সাহায্য বংশ বিস্ ার করা যেতে

বংশ বিস্ ার

কাঁঠাল খুবই পরপরাগায়িত ফসল। বীজ থেলকে গাছ লাগালে সে গাছে কখনও মাতৃগাছের গুণাগুণ থাকে না। সুতরাং কোনো সুনির্দ্দিষ্ট জাত ধরে রাখতে হলে অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্ ার খুবই প্রয়োজন। নির্বাচিত উন্নতজাত হয় কলমের সাহায্যে অথবা নিয়ন্ি ত পরাগায়ণের মাধ্যমে সৃষ্ট বীজের সাহায্যে করা যেতে পারে। যাহোক কাঁঠাল সাধারণত বীজের সাহায্যেই বিস্ ার লাভ করে থাকে। বীজতলা দ্র€ত পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু স্থানে করতে হবে। বীজতলার মাটি এক মিটার গভীর করে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে এবং মাটির সমতল থেকে ২০ থেকে ২৫ সে. মি. উঁচু করাই উত্তম হবে। বীজতলার সাইজ ১ থ ৩ মি. হতে পারে অথবা এক মিটার প্রশস্ এবং লম্বায় যত ই্ছে করা যেতে পারে। ১ থ ৩ মি. সাইজের বীজতলা তৈরির সময় ৪০ কেজির মত জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং বীজতলা তৈরি শেষে উপরের ২০-২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে প্রতি বীজতলায় আধা কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করে হালকা কুপিয়ে মিশে দিতে হবে। পলিব্যাগেও চারা করা যেতে পারে। এর জন্য মাটি তৈরি করে নেয়া ভালো, এক্ষেত্রে মাটি, বালি এবং জৈব সার ১ঃ১ঃ১ হারে মিশিয়ে তা দিয়ে ৩০ থেকে ৪৫ সে. মি. উঁচু পলিব্যাগ কমপক্ষে ২.৫ সে. মি. ফাঁক রেখে ভরাতে হবে এবং বীজতলাতেও ৩০ সে. মি. দূরত্বে চারটি সারি করে সারিতে ৩০ সে. মি. দূরে দূরে ২.৫ সে. মি. গভীর করে বীজ রোপণ করা হয়। বীজ শুকিয়ে গেলে আর গজায় না। সুতরাং নির্বাচিত কাঁঠাল থেকে বীজ

বের করে বড় বড় বীজগুলো সাথেসাথে রোপণ করাই উত্তম। এক বা দুবছরের চারা মাটির বলসহ উঠিয়ে বিতরণ করা যেতে পারে। কাঁঠালের বীজ সরাসরি নির্বাচিত জমিতেও রোপণের পরামর্শ দেয়া হয়। এতে ম লশিকড় নষ্ট হয় না এবং এসব গাছ ভালো ফলন দেয়। সেক্ষেত্রে প্রতি গর্তে ৩/৪ টি বীজ রোপণ করা হয় এবং চারা বের হবার পর প্রতি গর্তে একটি করে চারা বাড়তে দেয়া হয়। ১×১×১ মিটার সাইজের গর্ত তৈরির পর মাটির সাথে ১০ কেজি জৈবসার ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করা ১০-১৫ দিন পর বীজ ২.৫ সে. মি. গভীরে রোপণ করতে হয়। বীজ রোপণের কয়েক দিনের মধ্যে চারা গজিয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই কাঁঠালের মৌসুমে বীজ রোপণ করা হয়। যদি কেহ কলমের গাছ লাগাতে চান তবে ভিনিয়ার বা ফাটল কলম (Cleft grafting) অথবা ষ্টোন গ্রাফটিং যেমন আমের বেলায় বলা হয়েছে একই নিয়মে করা যাবে। তবে সাফল্য কিছুটা কম হয়।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি নির্বাচন

জমিতে বন্যার পানি প্রবেশ করে না বা বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না এমন জায়গা কাঁঠালগাছ রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

রোপণের সময়

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বীজ রোপণের সময়। কারণ তখনই কাঁঠাল পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বীজ রোপণের সময়। নির্বাচিত জায়গায় সরাসরি বীজ রোপণ করতে চাইলে এসময়েই চারা রোপণ করতে হবে। তবে বীজতলায় বা পলিব্যাগে চারা করে যত্ন নিতে পারলে বছরের যে কোনো সময় রোপণ করা যেতে পারে। তবে গাছ রোপণের পর তাড়াতাড়ি লেগে যাওয়ার জন্য (Establish) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই চারা রোপণ করার উত্তম সময়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি কয়েকটি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। কাঁঠাল গাছ সাধারণত ১২ থ ১২ মি. দ রত্বে রোপণ করা হয়। এ দ রত্বে হেক্টর প্রতি ৭০ টি গাছ রোপণ করা যায়। প্রতি সারিতে ১২ মি. দ রত্বে কাঠি পুঁতে চারা বা বীজ রোপণের স্থান নির্ধারণ করে নিতে হয়। সারি থেকে সারির দ রত্ব এক মিটার হবে। কাঠিটিকে কেন্দ্র করে এক মিটার গভীর করে ১ থ ১ মিটার সাইজের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরির সময় উপরের মাটি আলাদা রাখা ভালো। এই আলাদা মাটির সাথে প্রতি গর্তের জন্য ২০ থেকে ৩০ কেজি গোবরসার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হয়। এতে হেক্টর প্রতি দেড় থেকে দুই টন গোবর সারের প্রয়োজন হয়। গর্ত ভরাট করার পর গর্তের উপরের ২০ থেকে ২৫ সে. মি. মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার মিশে দিতে হবে। এর ১০ থেকে ১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়। রোপণের সময় চারার বয়স এক বা দুই বছর হতে পারে। তবে চারা উঠানোর সময় Tap root সহ মাটি বল করে চারা উঠানো হয়। খেয়াল করতে হবে চারা উঠানোর সময় Tap root নষ্ট না হয়। চারা সোজা করে বসাতে হবে। এরপর চারদিকের মাটি শক্তকরে চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি দিতে হয়। চারা রোপণের পরপরই এর দু'পাশে দুটি কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে বা জন্তু জানোয়ারে গাছের গোড়া না নাড়াতে পারে।

পরিচর্যা

সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা ঃ বড় কাঁঠাল গাছে সেচ দেয়া হয় না। তবে চারা রোপণের পর ২-৩ বছর পর্যন্ত খরা মৌসুমে নিয়মিত অবশ্যেই সেচ দিতে হবে। কাঁঠালের বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

কাঁঠালের পাতা গরু-ছাগলের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। সুতরাং গরু-ছাগলের থেকে রক্ষা করার জন্য খাঁচী দেয়াই উত্তম।

সার প্রয়োগ

বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ সারণি ৩ এ দেখানো হলো।

সারণি ৩ ঃ বিভিন্ন বয়সে গাছে বিভিন্ন সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	৫ বছর পর্যন্ত	৬-১০ বছর পর্যন্	১০ বছরের
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০
এমপি (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০

সম্পূর্ণ গোবরসার ও টিএসপি সার এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

মাসে গোড়া থেকে অন্ততঃ ৫০ সে. মি. দ রত্বে গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষা শেষে ভাদ্র-আশ্বিনে একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার ডিবলিং পদ্ধতিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের বয়স যতই বাড়বে গাছের

গোড়া থেকে সার দেয়ার দ রত্ব ততই বাড়াতে হবে। ২০-২৫ বছরের প র্ণ বয়স্ক কাঁঠালের বাগানে দুটো সারির মাঝখানে দিয়ে সার ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দেয়াই সহজ। তবে মাটিতে তেমন রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খুব খেয়াল করতে হবে।

অঙ্গছাঁটাই

কাঁঠাল গাছের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। তাই কান্ড বাড়াতে হলে অঙ্গছাঁটাইয়ের প্রয়োজন।

কাঁঠাল গাছের কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। তাই অনেকে চায় এর কান্ড ৫ থেকে ১০ মি. লম্বা হউক। সমতল ভূমিতে কান্ড ২-৩ মিটার উঁচু হতেই শাখা-প্রশাখা বের হতে চায়। প্রথমতঃ রোপণের পর লম্বা খাঁচী দিয়ে শাখা-প্রশাখা ছাড়াই গাছ ২-৩ মি. উঁচু করা যায়। এরপর কান্ড বাড়াতে চাইলে বর্ষার শুরুতে কান্ড বাদে অন্য ডালপালা ছেটে দিতে হয়। অঙ্গছাটায়ের স্থানে 'বোরদো পেষ্ট' বা ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করা উচিত। তা না হলে পোকা বা রোগের আক্রমনে গাছের বা কাঠের ক্ষতি হবে।

তাছাড়া ফল আহরণের পর ফলের বোঁটা কেটে ফেলতে হয়। মরা, রোগাক্রান্ত ডালপালা প্রতি বছরই

বর্ষা শুর€ হওয়ার আগে কেটে পরিষ্কার করে দিতে হবে। গাছের বৃদ্ধি হলে গাছের ভিতরের কিছু শাখা-প্রশাখা ছেটে দিলে আলো-বাতাস ঢুকতে পারে। ফলে রোগবালাই ও পোকামাকড় কম হয়।

ফুল ধরা, পরাগায়ণ ও ফল ধারণ

কাঁঠাল গাছে ফল আসতে প্রায় ৭-৮ বছর লাগে। সুতরাং কাঁঠাল বাগানে এসময় আন্তঃফসল করা যেতে পারে।

কাঁঠাল গাছে ফল আসতে প্রায় ৭-৮ বছর লাগে। গাছে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফুল আসে। স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল আলাদাভাবে একই গাছে আসে (Monoecious)। অমৌসুমী ফলের জন্য

কোনো কোনো গাছে সারা বছর বা বছরের কোনো কোনো সময় ফুল আসে। গাছে শতকরা ৯০ ভাগই পুরুষফুল হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো গাছে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত স্ত্রীফুল হতে পারে। স্ত্রীফুল প্রধান কান্ডে বা শাখায় আসে। পুরুষ ফুল শাখা-প্রশাখায় আসে। বাতাসের সাহায্যে পরপরাগায়ণ হয়ে থাকে। যদি পুষ্পমঞ্জরীর সব ফুল নিষেক না হয় তবে ফলের আকার স্বাভাবিক হয় না। স্ত্রীফুল নিষেক না হলে ঝরে পড়ে। ফল বসন্ত ও গ্রীষ্মে বৃদ্ধি পায়।

পোকামাকড় দমন ঃ কাঁঠালের মুচি ও ফলের মাজরা পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসেবে গন্য করা হয়। এ পোকার আক্রমণে মুচি (ফুল) ঝরে যায়। সুতরাং মুচি আসার সময় প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি. লি. সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস) ১০ ইসি বা ১.০ মি. লি. ডেসিস ২.৫ ইসি বা ০.৫ মি. লি. ফেনভ্যালিরেট (সুমিসাইডিন) ২০ ইসি বা ২.০ মি. লি. ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথায়ন) ৫০ ইসি বা ডায়জিনন ৫০ ইসি স্পে করে ফুল বা মুচি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং ১৫ দিন পরপর এক বা দু'বার স্পে করলেই এ পোকা দমন করা যাবে।

রোগ দমন ঃ Rhizopus Rot কাঁঠালের একটি মারাত্নক রোগ। এ রোগের জীবাণু পুরুষ ফুল এবং কচি ফলে আক্রমণ করে। এর ফলে ফল ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া ফল ও ফুলসম হ বাগান থেকে সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এবং বোরদো মিকচার (২ঃ২ঃ৫০) দিয়ে স্প্রে করে সব ফুল ভিজে দিতে হবে।

ফল আহরণ

সবজি হিসেবে খাবার জন্য যতদিন বীজ শক্ত না হয় ততদিন কাঁঠাল আহরণ করা যেতে পারে। তবে ফল পাকতে ফলধারণের পর ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় নেয়। গাছে দু'একটা ফল পাকলেই ঘ্রানে বুঝতে পারা যায়। তখন সব ফল একসাথে অথবা গাছে উঠে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে সেগুলো শব্দ ড্যাব ড্যাব করে সেগুলোই শুধু আহরণ করতে হয়। তাহলে ফলের গুণাগুণ ভালো হয়। বোঁটার কিছু অংশ রেখে ফল কেটে নামাতে হয়।

ফল পাকতে ফলধারণের পর ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় নেয়।

ফলন

গাছের বয়স এবং ফলের সাইজের ওপর ফলের সংখ্যা ও ফলন নির্ভর করে। ৭-৮ বছর বয়সের গাছে ফল আসলেও ২০-২৫ বছর বয়সের গাছকেই প র্ণ বয়স্ক ধরা হয়। এসময়ে প্রতি গাছে ১০০ থেকে ১৫০ টি ফল ধরতে পারে। ফলের ওজন সাধারণতঃ ৫ কেজি থেকে ১০ কেজি হয়ে থাকে। তবে 'হাজারী' জাতের গাছে অসংখ্য ফল ধরে। গাছে গোড়া থেকে ফল ধরে এবং ফলের সাইজ ২-৩ কেজির বেশি হয় না।

ফল আহরণের পর ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই ফল পেঁকে যায়। বাত্তি (Matured) ফল আহরণ করলে ফল পাকা সমস্যা নয়।

***অনুশীলন (Activity)ঃ** কাঁঠালে কীভাবে পরপরাগায়ণ সম্ক্ল হয় তা বর্ণনা কর€ন। খাজা কাঁঠাল এবং গিলা কাঁঠালের পার্থক্য বর্ণনা কর€ন।*

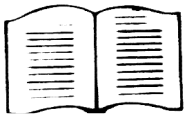

সারমর্মঃ কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। অভাবের সময় সাধারণ মানুষ কাঁঠালফলকে সম্ž রক খাবার হিসেবে ব্যবহার করে। কাঁচাফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠাল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। এটা যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত। কাঁঠালের প্রত্যেকটি

কোয়াই এক একটি ফল। কাঁঠাল পরপরাগায়িত এবং এর বংশ বিস্ার বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। কাঁঠালের চারটি শ্রেণি রয়েছে যেমন (১) খাজা (২) গালা (৩) মধ্যম এবং (৪) হাজারী। কাঁঠালগাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ বীজ রোপণের সময়। কাঁঠাল এর কাঠ খুব ম ল্যবান তাই অঙ্গছাঁটাই করে কান্ড বাড়ানো হয়। কাঁঠালগাছে ফল আসতে ৭-৮ বছর লাগে। স্ত্রীফুল ও পুর€ষফুল আলাদাভাবে একই গাছে আসে। স্ত্রীফুল প্রধান কান্ডে বা শাখায় আসে। পুর€ষফুল শাখায় প্রশাখায় আসে। ফল পাকতে ফল ধারণের পর ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) স্ত্রীফুল ও পুরুষফুল একই গাছে পৃথক পৃথকভাবে ধরে।

খ) ফলের ভোতাঁর উপরিভাগে অনেক কাঁটা থাকে। কাঁটার সংখ্যা যত ফুলের সংখ্যাও তত হবে।

গ) কাঁঠাল ভক্ষণযোগ্য ফলের মধ্যে ছোট ফল।

ঘ) হাজারী কাঁঠাল জাতের বীজের গাছে মাতৃগুণাগুণ বজায় থাকে না।

ঙ) গাছে সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফুল আসে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) কাঁঠালের ফল বহু ফলের সমষ্টি এবং .....নামেই পরিচিত।

খ) ফল পাকতে ফল ধারণের পর .....থেকে ..... দিন সময় নেয়।

গ) স্ত্রীফুল..... ... না হলে ঝরে পড়ে।

ঙ) পুরুষ মঞ্জরী ..... দ্বারা ঢাকা থাকে।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

র) কাঠালের উৎপত্তিস্থল কোন্‌টি?

- ক) শ্রীলঙ্কা
- খ) মিয়ানমার
- গ) ভারত
- ঘ) মালয়েশিয়া

রর) কোন্‌টি কাঠালের রোগ?

- ক) ফুট রট
- খ) রাইজফাস রট
- গ) স্টেম রট
- ঘ) পাতা ঝরা

পাঠ ৭.৪ পেয়ারা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পেয়ারার উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পেয়ারার উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্ ার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেয়ারার জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেয়ারার চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল

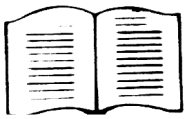

পেয়ারা দক্ষিণ আমেরিকার ফল। মেক্সিকো থেকে পেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পর্তুগীজরা পেয়ারা ভারতে প্রবর্তন করে এবং খুব দ্রুত এটি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে উভয় গোলার্দ্ধের উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহে এর আবাদ হচ্ছে। প্রধান যে সমস্ত দেশে পেয়ারার চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে - ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীনদেশ, তাইওয়ান, কিউবা, মেক্সিকো, পেরু, হাওয়াই, ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়া। বাংলাদেশে মাত্র ৪,৯০০ হেক্টর জমিতে পেয়ারার চাষ হয় এবং ২৮,০০০ টন পেয়ারা উৎপাদিত হয়। পুষ্টিমানের বিচারে পেয়ারা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দেশের প্রতি বাড়িতে একাধিক পেয়ারার গাছ থাকা বাঞ্চনীয়।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

> পেয়ারাকে প্রাচ্যের আপেল বলা হয়। পেয়ারা খাদ্যপ্রাণ সি এবং পেকটিন সমৃদ্ধ।

পেয়ারা একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। পেয়ারা খাদ্যপ্রাণ সি এবং পেকটিন সমৃদ্ধ। টাটকা পেয়ারার প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ২৪২ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি ও ২৮০ আই ইউ খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। পুষ্টিমান অবশ্য বিভিন্ন জাতে তারতম্য হয়ে থাকে। তাছাড়া কতটুকু বাত্তি হয়েছে তার ওপরও নির্ভর করে। সাধারণভাবে যে পেয়ারার ভিতর লাল বা গোলাপী সেগুলোতে খাদ্যপ্রাণ সি কম থাকে। মোটামুটি প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পেয়ারাতে ৫৫ থেকে ৫২৯ মি. গ্রা. খাদ্যপ্রাণ সি। তাছাড়া পেয়ারা ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাস সমৃদ্ধ। পেয়ারা থেকে জ্যাম, জেলী, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। পেয়ারাতে পেকর্টিনের পরিমাণ বেশি থাকার ফলে জেলীর গুণগতমান বেড়ে যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

> পেয়ারা বেরী জাতীয় ফল। ফুল উভয়লিঙ্গী এবং বায়ুপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে পরপরা-গায়ণ হয়।

> বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজীপেয়ারার জাত মুক্তায়িত করেছে। এছাড়া বারি পেয়ারা-২ নামে আরও একটি জাত সম্প্রতি মুক্তায়িত করেছে।

পেয়ারা গাছ দ্বিবীজপত্রী, বহুবর্ষজীবী ও চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছ মাঝারী আকারের হয় যা ৩ থেকে ১০ মি. পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। এর শিকড় মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে না। বাকল পাতলা এবং সবুজ থেকে লাল-তামাটে এবং খোসার মত খুলে খুলে পরে। কচি শাখা চার কোণাকার হয়ে থাকে এবং গায়ে শুঙ্গ (Pubescent) থাকে। পাতা পরস্পর বিপরীতমুখী, বোঁটা ৩-১০ এমএম লম্বা এবং পাতা উপবৃত্তকার লম্বাটে। পাতার নিচের শিরাগুলো খুবই স্পষ্ট। পাতার অক্ষ থেকে মুকুল এককভাবে বের হয় অথবা পুষ্পমঞ্জরীতে ২-৩ টি ফুল উৎপন্ন হয়। ফুলে বৃতি ৪-৬ টি, পাপড়ি ৪-৫ টি দেখতে সাদা, পুংকেশর অনেক, কিন্তু একটি স্ ীকেশর থাকে। ২৫ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত ফুল ফুটে থাকে। ফুল উভয়লিঙ্গী এবং বায়ুপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে পরাগায়ণ হয়। পেয়ারা একটি বেরী জাতীয় ফল। পেয়ারা গুৎঃধপবধব পরিবারের অন্ ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Psidium guajava* খ. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাত রয়েছে। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানা অন্ ভুক্ত কাঞ্চননগর পাহাড়ী অঞ্চলের 'কাঞ্চননগর' জাত, ব্রাহ্মনবাড়িয়ার সমতল ভূমির মুকুন্দপুরী জাত এবং ঝালকাঠি জেলার জোয়ারভাটা অঞ্চলে আবাদ হয় স্বরূপকাঠি জাত। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

কাজীপেয়ারা নামে একটি পেয়ারার জাত মুক্তায়িত করেছে যা সারা দেশে বিস্ ার লাভ করেছে। বারি পেয়ারা-২ নামে আরো একটি জাত সম্প্রতি মুক্তায়িত হয়েছে।

চিত্র ৭.৪.১ঃ ফলসহ পেয়ারা গাছ

বংশ বিস্ ার

পেয়ারা বীজের সাহায্যে বংশ-বিস্ ার করে থাকে। বাডিং, গ্রাফটিং ও গুটি কলমের সাহায্যে অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ

পেয়ারা বীজের সাহায্যে বংশবিস্ ার করে থাকে। যেহেতু পেয়ারা পরপরাগায়িত বীজের গাছের ফলে মাতৃগাছের গুণাগুণ হুবহু থাকেনা। এছাড়া গুটিকলমের সাহায্যে পেয়ারার বংশ বিস্ ার করা যেতে পারে। যদিও বাডিং ও গ্রাফটিং এর সাহায্যে পেয়ারার বংশ বিস্ ার হতে পারে তবুও এদেশে গুটি কলমই বহুল প্রচলিত।

রোপণের সময় ও দ রত্ব ঃ বর্ষা শুরুর আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে যথাযথ পরিচর্যা করতে পারলে অতিরিক্ত বর্ষার সময় বাদে বছরের আর সব সময় পেয়ারার চারা বা কলম রোপণ করা যাবে। পেয়ারার চারা বা কলম ৫ থ ৫ মিটার বা ৬ থ ৬ মিটার দ রত্বে রোপণ করা হয়। এ দ রত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ৪০০ অথবা ৩০০ টি গাছের প্রয়োজন হয়।

জলবায়ু ও মাটি

উষ্ণ ও অবউষ্ণ মন্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

উষ্ণ ও অবউষ্ণ মন্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। যে সব অঞ্চলে কয়েকমাস শীতকাল আছে সেখানে পেয়ারার ফলন আরও ভালো হয় এবং গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মি. উচ্চতায় পেয়ারা জন্মিতে পারে। পেয়ারার আবাদের জন্য ২৩-২৮ সেলসিয়াস তাপমাত্রা

উত্তম। ১০০ থেকে ২০০ এম এম বৃষ্টিপাত পেয়ারা উৎপাদনের জন্য ভালো। ফুল আসার সময় অবশ্যই শুকনো মৌসুম হওয়া চাই। পেয়ারা গাছ বেশ শক্ত। সব রকম মাটিতেই পেয়ারা জন্মিতে পাতে। তবে পেয়ারা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা। মাটির পি এইচ ৪.৫ থেকে ৮.২ পর্যন্ত হলেও পেয়ারার আবাদ সফল হতে পারে। পেয়ারা গাছের শিকর মাটির মাত্র ২০ সে. মি. এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি অনেক বার চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। এরপর ৫০ সে. মি. গভীর করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজের গর্ত খুড়ে রোপণের জায়গা তৈরি করতে হয়। সাধারণত ৫ থ ৫ মি. দ রত্বে গর্তগুলো করা হয়। এরপর প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার এবং ২৫০ গ্রাম টিএসপি অথবা এক কেজি হাড়ের গুড়া মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করা প্রয়োজন। তারপর চারা বা কলম রোপণ করা যাবে। রোপণের পর গাছের চার দিকের মাটি শক্ত করে বসে দিতে হবে এবং গোড়া বাতাসে বা জীবজন্তুর দ্বারা না নড়ে সেজন্য গাছটির পাশে কাঠি পুঁতে সুতলী দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে এবং বৃষ্টি না হলে পানি দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে যতদিন গাছ লেগে না ওঠে। গাছ লেগে উঠতে প্রায় এক মাস সময় নেয়।

সার প্রয়োগ

জমিতে এরপর যে পরিমাণ সার দিতে হবে তা সারণি ৪ এ দেখানো হলো।

সারণি ৪ ঃ বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	রোপণের সময়	গাছের বয়স					
		১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর বা তদুর্দ্ধ
গোবর সার (কেজি)	১০-১৫	১০	১০	১৫	২০	২৫	২৫
ইউরিয়া (গ্রাম)	-	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০
এমপি (গ্রাম)	-	১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৫০০

সারণি ৪ এ উলি-খিত সার দুই কিস্তি তে দিতে হবে। বর্ষা শুর€র আগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম কিস্তি তে সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। তবে পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার দেয়াই ভালো। দ্বিতীয় কিস্তি সার বর্ষা মৌসুম শেষে ভাদ্র-আশ্বিনে দিতে হয়। এ সময় বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার দেয়া হয়। যথা সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ৪ এ বর্ণিত সার ছাড়াও কখনও কখনও জিংক বা সালফার বা মলিবডেনামের অভাব দেখা দিতে পারে। এগুলোর অভাবে গাছের পাতা ছোট হতে পারে, পাতার শিরার মধ্যবর্তী জায়গার সবুজ

কমে যেতে পারে। পাতা ও ফলের সংখ্যা কম হতে পারে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে জিংক সালফেট, জিপসাম বা বরিক এসিড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরিচর্যা

সেচ ঃ যদিও পেয়ারা গাছ বেশ খরা সহ্য করতে পারে কিন্তু ফলন আশানুরূপ পেতে হলে শুষ্ক মৌসুমে ১৫ দন পরপর সেচ দিতে হবে। তাছাড়া সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পেয়ারা গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্যে প্র€নিং ও ট্রেনিং খুব

প্র€নিং ও ট্রেনিং ঃ গাছ যাতে শাখা-প্রশাখা ছাড়ার আগে অন্ততঃ এক মিটার উপরে ওঠে এজন্য প্রথম একটি শাখা বাড়তে দেয়া হয় এরপর প্রধান শাখাটির মাথা কেটে দিলে চারদিক থেকে অনেক কুঁড়ি বের হয়। এগুলো থেকে গাছের চারদিকে চারটি রেখে বাদবাকীগুলো ভেঙ্গে দিতে হয়। এই চারটি শাখা যেন সোজা ওপরদিকে না উঠে চারদিকে প্রসারিত হয় সেজন্য অনেক সময় খুঁটি পুঁতে রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। এগুলো যখন ৫০ সে. মি. বা একমিটার লম্বা হয় তখন এগুলোর মাথা কেটে দিয়ে সেখান থেকে দুটি করে শাখা বাড়তে দেয়া উচিত। এমনিভাবে ১৬ টি মজবুত শাখা হলে এরপর আর

প্র€নিং ও ট্রেনিং এর প্রয়োজন নাই। তবে মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল বা ওয়াটার সাকার বর্ষা শুর€র আগে এবং পরে ছেটে দেয়াই ভালো।

ফুল আসা, ফল ধারণ ও ফলের বৃদ্ধি

পেয়ারা গাছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বছরের প্রথম ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে দ্বিতীয় দফায় ফুল আসে।

পেয়ারা গাছে বছরে সাধারণত দুবার ফুল আসে। ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে বছরের প্রথম ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে (সেপ্টম্বর-অক্টোবরে) দ্বিতীয় দফায় ফুল আসে। মুকুল বের হওয়া থেকে ফুল ফুটতে ২০ থেকে ২২ দিন সময় নেয়। আবার ফুল বের হওয়া থেকে ফল আহরণের উপযুক্ত হতে ১৪০ থেকে ১৬০ দিন সময় নেয়। আষাঢ়-শ্রাবণে (জুলাই-আগস্ট) পেয়ারা আহরণ করা হয়। আবার মাঘ-ফাল্গুনে পেয়ারা আহরণ করা হয়।

রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ

পোকা মাকড় দমন ঃ পেয়ারা গাছে মিলিবাগের আক্রমণ সাধারণত বেশি দেখা যায়। পেয়ারা গাছের পাতা ও ফলের এ পোকা দেখা যায়। এগুলো এক জায়গায় একটি লাইনে অনেকগুলো থাকে। নড়াচড়া করে না। এদের গা তুলোট আবরণযুক্ত। এ পোকাগুলো রস চুষে খেয়ে কচি কান্ড, পাতা ও

ফলের ক্ষতি করে। মিলিবাগ আক্রান্ত পাতা কচি কান্ড এবং ফল থেকে মিলিবাগ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে মারতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানির সাথে নগস বা ডেনকাভ্যাপন ১০০ ইসি ২.০ মি. লি. অথবা

ডাইমেক্রন ১০০ এসসিডবি-উ, ১.০ মি. লি. হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে মিলিবাগ দমন করা সম্ভব।

রোগ দমন

উইল্ট রোগ (ডরষঃ ফরংবধংব) ঃ এর আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ছোট ডালপালাও শুকিয়ে যেতে থাকে। এমন কি হঠাৎ একদিন গাছটি মরে যায়। এ রোগ দমনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নাই। তবে বাগানের সঠিক পরিচর্যা এ রোগ দমনে সাহায্য করে।

লীফ স্পট রোগ (Leaf spot disease) ঃ এর আক্রমণে পাতা ও ফলে ছোট ছোট বাদামি রং এর দাগ দেখা যায়। এ দাগগুলোর মাঝখানে কাল দাগ হয়। এ রোগ গাছের ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। যে কোনো কপার ছত্রাকনাশক ১০-১৫ দিন পরপর ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যায়।

ফল আহরণ ও ফলন

ফল আহরণের উপযুক্ত হলে ফলের সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ সবুজ বা হলুদ হয়।

ফল আহরণের উপযুক্ত হলে ফলের সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ সবুজ বা হলুদ হয়। তখন প্রতিটি ফল এক এক করে সম্ভব হলে সিকেটার দিয়ে কেটে আহরণ করতে হয়। পাঁচ বছরের গাছ ১০০ থকে ২৫০ টি ফল দিতে পারে যার ওজন প্রায় ৩০ কেজি।

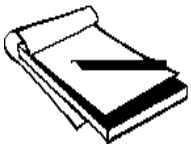

অনুশীলন (Activity) *ঃ পেয়ারার পুষ্টিমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। গুটিকলম কীভাবে করা হয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর€ম।*

সারমর্মঃ উষ্ণ ও অবউষ্ণমন্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। পেয়ারা আবাদের জন্য ২৩-২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১০০-২০০ মি. মি. বৃষ্টিপাত উত্তম। পেয়ারা সবমাটিতেই জন্মে তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। গাছের শিকড় মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে না। গাছের গোড়া থেকেই শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে। ফুল উভয়লিঙ্গি। বায়ুপ্রবাহ ও কীটপতঙ্গের সাহায্যে বীজ থেকে বংশ বৃদ্ধি হলেও কোনো কোনো জায়গায় যুগের পর যুগ একই জাতের আবাদ হওয়ায় জাতগুলো স্থিতি হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজী পেয়ারা এবং বারি পেয়ারা-২ নামে পেয়ারার দু'টি জাত মুক্তায়িত করেছে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের জন্য বাডিং, গ্রাফটিং, গুটিকলম ইত্যাদি খুবই উপযোগী। গাছের সঠিক ও সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্র€নিং এবং ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে। পেয়ারা গাছে বছরে দু'বার ফুল আসে। পাঁচ বছরের গাছে ১০০-২৫০ টি ফল দিতে পারে যার ওজন প্রায় ৩০ কেজি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) পেয়ারা খাদ্যপ্রাণ সি এবং পেকটিন সমৃদ্ধ ফল নয়।
খ) ফুল উভয়লিঙ্গি নয়; বায়ুপ্রবাহ ও পতঙ্গের সাহায্যে পরাগায়ণ ঘটে না।
গ) গাছের বাকল পাতলা এবং খোসার মত খুলে খুলে পড়ে।
ঘ) বীজ থেকে বংশ বৃদ্ধি হলেও কোনো কোনো জায়গায় যুগেরে পর যুগ একই জাতের আবাদ হওয়ায় জাতগুলো স্থিতি হয়েছে।
ঙ) ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বছরের প্রথম ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে দ্বিতীয় দফায় ফুল আসে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) কচি শাখা চার কোণাকার হয়ে থাকে এবং গায়ে ..... থাকে।
খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট .....নামে একটি পেয়ারার জাত মুক্তায়িত করেছে যা সারাদেশে বিস্তার লাভ করেছে।
গ) ফুল বের হওয়া থেকে ফল আহরণের উপযুক্ত হতে ..... থেকে ..... দিন সময় নেয়।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) পেয়ারা গাছে সাধারণত বৎসরে কয়বার ফল আসে?
   ক) ১ বার
   খ) ২ বার
   গ) ৩ বার
   ঘ) ৪ বার

ii) পেয়ারার উৎপত্তিস্থল কোন্‌টি?
   ক) ভারত
   খ) দক্ষিণ আমেরিকা
   গ) ফ্লোরিন্ডা
   ঘ) থাইল্যান্ড

পাঠ ৭.৫ লেবু জাতীয় ফল

এ পাঠ শেষে আপনি –

- লেবু জাতীয় ফলের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেবু জাতীয় ফলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেবু জাতীয় ফলের জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লেবু জাতীয় ফলের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

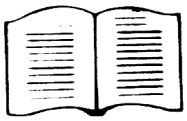

উৎপত্তিস্থল

অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে দক্ষিণ-প র্ব এশিয়ার উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের দেশসমূহে; বিশেষ করে ইন্ডিয়া ও চীনদেশে এবং এ দু'দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। দক্ষিণ চীন দেশকে নিব্বর্ণিত লেবু ফলসম হের উৎপত্তিস্থল (Centre of origin) হিসেবে গণ্য করা হয়।

মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইন্ডিয়ার উত্তর-প বাঞ্চলে ও বাংলাদেশকে লেবু (খবসড়হং) এবং জামির (খরসব) এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মরহুম অধ্যাপক হগসন এর মতে লেবু এবং জামিরের প্রজাতিসম হ যেমন- Rangpur lime (*C. limon*), Indian sweet lime (*C. limettioides*), Rough lemon (*C. jambhuri*) ইত্যাদি, আদি উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আসাম ও বাংলাদেশ।

উৎপাদন

বেশির ভাগ লেবুজাতীয় ফসল যেমন কমলা, মাল্টা, এবং গ্রেপফ্রুট অবউষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মে। তবে লেবু, জামির, জাম্বুরা এবং কমলা উষ্ণ মন্ডল অঞ্চলেও বেশি জন্মে। আর্দ্র, উষ্ণ ও অবউষ্ণ মন্ডলে লেবু জাতীয় ফলের রং সবুজ থাকে এবং খুব সুস্বাদু হয় না। বাংলাদেশে কম সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর। এদেশে লেবুজাতীয় ফলের উৎপাদন খুব বেশি নয়। বাংলাদেশ হঁেছ লেবুজাতীয় ফল বিশেষ করে লেবু ও জামিরের উৎপত্তিস্থল। তবু এদেশে লেবুজাতীয় ফলের তেমন কোনো বাণিজ্যিক কাঠামো গড়ে ওঠে নাই। বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফলের জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো।

লেবু জাতীয় ফল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (টন)
লেবু ও জামির	৩২৩৯	৭০০০
কমলা	৪০৫	১০০০
জাম্বুরা	২৪২৯	৭০০০
অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল	২৪২৯	৮০০০
মোট -	৮৫০২	২৩০০০

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পুষ্টিমান

লেবু জাতীয় সব ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফলের পুষ্টিমান সারণি ১ এ দেয়া হলো।

সারণি ১ ঃ প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে বিভিন্ন লেবুজাতীয় ফলের পুষ্টিমান

	কমলা	মাল্টা	জাম্বুরা	জামির	লেবু
আমিষ (%)	০.৭	০.৮	০.৫	১.৫	০.৩
চর্ব্বি (%)	০.১	০.৩	০.৩	১.০	০.৭
শর্করা (%)	৯.৭	৯.৩	৮.৫	১০.৯	১০.০
ক্যালসিয়াম (মি. গ্রা.)	২২.০	৪০.০	৩৭.০	৯০.০	৪০.০
লৌহ (মি. গ্রা.)	০.৩	০.৭	০.২	০.৩	২.৩
ক্যারোটিন (মি. গ্রা.)	-	০	১২০.০	১৫.০	০
খাদ্যপ্রাণ বি-১ (মি. গ্রা.)	০.০৪	-	০.০৬	০.০২	সামান্য
খাদ্যপ্রাণ বি-২ (মি. গ্রা.)	০.০১	-	০.০৪	০.০৩	০.০৩
খাদ্যপ্রাণ সি (মি. গ্রা.)	৪০.০	৫০.০	১০৫.০	৬৩.০	৪৭.০

ব্যবহার

লেবুর রস থেকে জেলী, মার্মালেড ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। ফলের খোসা থেকে আচার ও চাটনী বানানো যায়। সিলেটের অনেক জায়গায় কিছু লেবুর জাত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়া প্রসাধনী, ঔষধ এবং সাইট্রিক এসিড তৈরিতে লেবুজাতীয় ফল ব্যবহার করা হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

লেবুজাতীয় ফল Rutaceae পরিবার এবং Genus citrus এর অন্তর্ভুক্ত। Citrus এর অধীনে প্রায় ১৬০ টি প্রজাতি বা ঝঢ়বপরবং রয়েছে। এগুলোর মধ্যে যে সকল প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে সেগুলো মোট চারটি উদ্যানতাত্ত্বিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন-

ধ) Sweet orange (মাল্টা) ঃ *Citrus sinensis*
ন) গধহফধৎরহ (কমলা) ঃ *Citrus reticulata*
প) Lime (কাগজী) ঃ *Citrus aurantifolia*
ফ) Lemon (পাতি লেবু) ঃ *Citrus limon*
ব) Pummelo (জাম্বুরা) ঃ *Citrus grandis*
ভ) Graper fruit (গ্রেপ ফ্রুট) ঃ *Citrus Paradisi*

অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফলের গাছ ছোট ছোট বৃক্ষ। কান্ড সরু বা মোটা তবে গোলাকার। কচি শাখা অবশ্য কোণাকার (Angular) হয়। তাছাড়া কচি শাখা-প্রশাখার পত্রকক্ষে কাঁটা থাকে। পাতা একক পত্রফলক বিশিষ্ট। অনেক প্রজাতিতে পাতার বোঁটা পাখনাবিশিষ্ট (Winged) হয়ে থাকে। পত্রকক্ষে একটি করে ফুল আসে বা একাধিক ফুলের পুষ্পমঞ্জরী হয়। বৃতি পেয়ালাকার ও ৪-৫ ভাগে বিভক্ত, পাঁপড়ি ৪, ৫ বা ৮ হয়ে থাকে এবং পুরং। যতগুলো পাঁপড়ি তার থেকে চার থেকে দশগুণ পুংকেশর হয়। প্রতি গর্ভাশয়ে ৮ থেকে ১৮ টি প্রকোষ্ঠ থাকে। ফল বেরী জাতীয়। খোসা চামড়ার ন্যায়; খোসা

ও পাতায় তৈলগ্রন্থি বিদ্যমান। ফলের মধ্যে সেগমেন্ট বা কোয়া থাকে এবং কোয়ার মধ্যে রসাল থলে থাকে। বীজ কখনও কখনও বহুভ্র€ণী হয়ে থাকে।

চিত্র ৭.৫.১ঃ সীডলেস, কাগজী ও কাগজা লেবু

জাতসমূহ

লেবু- Lemons (*C. limon*) শ্রেণিরসীডলেস লেমন ঃ এটি বাণিজ্যিক জাত হিসেবে বহুল প্রচলিত। লেবু শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশে এটি প্রধান জাত। এর পাতার গড় সাইজ ৯.৮৮ থ .৯৬ সে. মি. এবং উইংলেস। গাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং মধ্যম কাঁটাযুক্ত। এর ফল বীজশ ন্য, আকারে লম্বা।

সীডলেস লেবু-২ ঃ এটির গড় ওজন ১৯৫.২০ গ্রাম, গাছ খুবই শক্তিশালী এবং প্রচুর ফল ধরে।

সীডলেস লেবু-৩ ঃ এটি কুমিল্লা এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর গড় ওজন ২৯২.৬০ গ্রাম এবং সাইজ ১১.৭০ থ ৬.৯১ সে. মি., ত্বক ০.৫০ সে. মি. পুরু। তবে এগুলোর রস, এসিড এবং টিএসএস অনুমোদিত সীডলেস লেমনের মত।

এলাচী লেবু ঃ এটি দেশের উত্তর-প র্ব এবং প র্বাঞ্চলে পাওয়া যায়। এলাচীর ঘ্রাণ এজাতটির বৈশিষ্ট্য। ফলের আকার লম্বাটে বড় গড় ওজন ১৯৪.৬৭ গ্রাম, ত্বক অমসৃণ। গাছ কম কাঁটাযুক্ত এবং খুবই দ্র€ত বর্ধনশীল, পাতা বড়। ফলে অনেক বীজ আছে, ফল অত রসালো না।

চীনা লেবু ঃ এজাতটি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল এলাকায় প্রচুর জন্মে। দেখতে সীডলেস লেমনের মতই তবে এটি মাঝখানটায় বেশ মোটা। এর গাছ ওপরের দিকে বৃদ্ধি না হয়ে পাশেই প্রসারিত হয় বেশি। গাছে পাতা কম এবং কাঁটা বেশি। পাতার সাইজ ৮.৩০ থ ৪.৩২ সে. মি., ফলের সাইজ ৮.০৪ থ ৫.৭২ সে. মি. এবং ফলের গড় ওজন ১৩০.৩০ গ্রাম। ত্বক পুর€ শাঁসে রস কম (২৪.৬২%)।

এছাড়াও দেশে অনেক জাতের লেবু আছে। জারা এবং শাসনি লেবু সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলায় পাওয়া যায়। এগুলোর ত্বক শাঁসসহ মাংশের সাথে পাক করে খাওয়া হয়।

জামির শ্রেণির জাতসম হের মধ্যে কাগজী লেবু ও কাগজা লের প্রসিদ্ধ।

কাগজী লেবু ঃ (Citrus aurantifolia) এটি একটি বাণিজ্যিক জাত (চিত্র-৭.৫.১ দেখুন)। কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর চাষ হয়। এর ফল গোলাকার ও ছোট।

কাগজা লেবু ঃ (Citrus aurantifolia) এটিও একটি বাণিজ্যিক জাত এবং দেশের উত্তর-প র্বাঞ্চল এর ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে (চিত্র-৭.৫.১ দেখুন)। এর ফল ডিম্বাকার কম থাকে। ত্বক মসৃণ ও পাতলা। ফল খুব রসাল।

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বারি বাতাবীলেবু-১ নামে একটি জাত মুক্তায়িত করেছে।

জাম্বুরা (*Citrus grandis*) ঃ লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে বাতাবী লেবুই আকারে সবচেয়ে বড় হয়। ফলের আকার ছোট, মাঝারী ও বড় হতে পারে। ফলের ত্বকের পর€ত্ব ১.০ সে. মি. থেকে ৯.০ সে. মি. পর্যন্ হতে পারে। ফল রসাল বা কম রসালও হতে পারে। যৌগিক ফল তিক্ত স্বাদ যুক্ত আবার কোসটি বেশ মিষ্টিও হয়। কোনো কোনো ফলের কোয়া গোলাপী আবার কোনটির সাদা কোয়া হয়। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বারি বাতাবী লেবু-১ নামে একটি জাত ১৯৯৭ সালে মুক্তায়িত করেছে।

কমলা (Mandarin) (*Citrus reticulata*) শ্রেণিভুক্ত ঃ বাংলাদেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জন্মে। ফল পাকা অবস্থায় কমলা রং ধারণ করে। খোসা পাতলা ও সহজে চাড়ানো যায়। বীজ নাই অথবা ছোট ছোট অল্প পরিমাণে থাকে। কোষ সহজে ছাড়ানো যায়। ফল টক, টক মিষ্টি বা বেশ মিষ্টি হতে পারে। উলে-খ্য যে কমলা আন্ র্জাতিকভাবে গধহফধৎরহ নামে পরিচিত। যাহোক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রতি বারি কমলা-১ নামে কমলার একটি জাত মুক্তায়িত করেছে (চিত্র-৭.৫.২ দেখুন)।

চিত্র ৭.৫.২ঃ বারি কমলা - ১

গাছের বংশ বৃদ্ধি

লেবুজাতীয় ফল সাধারণভাবে স্বপরাগায়িত। কিছু পরপরাগায়ন হয়ে থাকে।

সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফল সাধারণভাবে স্বপরাগায়িত। এগুলোর বীজের গাছে তেমন তারতম্য হয় না। তবে বীজের গাছে ফল আসতে বেশি সময় নেয়। তাছাড়া কিছু পরপরাগায়ণও হয়ে থাকে। তাই বীজের গাছ লাগিয়ে ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সেজন্য কলমের গাছ রোপণের সুপারিশ করা হয়। কারণ কলমের গাছে মাতৃগুণাগুণ সম্ᅳর্ণ বজায় থাকে। কলমের জন্য নির্বাচিত Root stock বা আদিজোড় ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের মাটিতে ফলের আবাদ করা যেতে পারে।

লেবু ও জামির এর গুটিকলমের সাহায্যে বংশ বিস্ার পদ্ধতি এদেশে বহুদিন থেকেই প্রচলিত। তবে এগুলোর Cuttings বা শাখা কলমের সাহায্যেও বংশ বিস্ার করা যায়। আবার নির্বাচিত Root stock এর সাথে ভিনিয়ার বা চোখকলমের (T-budding) সাহায্যে এগুলোর অঙ্গজ বংশ বৃদ্ধি বিশ্বের বহুদেশেই প্রচলিত। জাম্বুরার বংশ বৃদ্ধিও গুটিকলম বা ভিনিয়ার বা টি-বাডিং পদ্ধতিতে করার সুপারিশ করা হয়। উলে-খ্য যে জাম্বুরাতে অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলের চাইতে পরপরাগায়ণ বেশি হয়ে থাকে। তাই চারার গাছে মাতৃগুণাগুণ পাওয়া যায় না। সেজন্য এটির অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি খুবই প্রয়োজন।

কমলা গাছ ঃ বীজ থেকে করা যায়। সেক্ষেত্রে একাধিক বীজ গর্তে (Planting pit) ১ সে. মি. গভীরে রোপণ করা হয় এবং চারা গজানোর পর একটি রেখে বাদবাকী উপরে ফেলে দিতে হবে। বাংলাদেশে এখনও কোনো উপযোগী Root stock নির্বাচিত হয় নাই। তেমন Root stock পাওয়া গেলে কমলা টি-বাডিং পদ্ধতিতে কলম করে লাগানোই সবচেয়ে ভালো হবে।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

বিশ্বের অবউষ্ণ অঞ্চলে, বিষুবরেখার ৪০° উত্তর এবং ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের যে সমস্ দেশে সুনির্দিষ্ট শীতকাল রয়েছে যা গাছকে সুপ্ত অবস্থায় যেতে সাহায্য করে সে সমস্ দেশে লেবুজাতীয় ফলের চাষ সবচেয়ে ভালো হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুতে কমলা, জাম্বুরা, লেবু, কাগজি লেবুও জন্মে। কাগজি ও কাগজা শুষ্ক অঞ্চলে যেমন- কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে ভালো জন্মে। অথচ সীডলেস লেবু সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভালো জন্মে। অধিক বৃষ্টিপাত সম্ᅳন্ন ঢালু জমিতে যেমন- বৃহত্তর সিলেট ও পার্বত্য চট্টগামে কমলা উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী। জাম্বুরা উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভালো জন্মে।

মাটি

বৃহত্তর সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বালি এবং কংকরময়। ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি সহজেই নিকাশ হয়। কিন্তু দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে সেচের প্রয়োজন। কিন্তু সুযোগের অভাব থাকায় সেচ দেয়া যায় না। তাই লেবু জাতীয় ফলগাছ (বিশেষ করে অগভীর শিকড় হওয়ায়) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে জমির ক্ষয় হয় এবং গাছের পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে চলে যায়। ফল গাছে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম এবং জিংক এর অভাব দেখা দেয়। এসব জমির পিএইচ ৪.৫ থেকে ৫.৫। কিন্তু লেবুজাতীয় ফল গাছের জন্য পিএইচ ৫.০ থেকে ৬.০ হওয়া বাঞ্চনীয়।

চাষাবাদ প্রণালি

রোপণের দ রত্ব ও রোপণের সময় ঃ লেবু ও কাগজী লেবু ৪ × ৪ মিটার দ রত্বে রোপণ করা যায়। কিন্তু কমলা ও জাম্বুরা ৬ × ৬ মিটার দ রত্বে রোপণ করাই শ্রেয়। বর্ষা মৌসুমের শুর€তে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে রোপণ করাই উত্তম। তবে সেচ সুবিধা থাকলে ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টম্বর-অক্টোবর) এ গাছ রোপণ করা যেতে পারে। এসময় শুষ্ক মৌসুম শুর€ হয়ে যায়। তাই গাছ লেগে না ওঠা পর্যন্ অতিরিক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। ৩ × ৩ মিটার দ রত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ১১০০ গাছের প্রয়োজন হয় এবং ৬ × ৬ মিটার দ রত্বে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি প্রায় ২৭৫ টি গাছের প্রয়োজন হয়।

জমি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নেয়া উচিত।

জমি তৈরি, চারা রোপণ ও সার প্রয়োগ ঃ জমি চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে। এর পর দ রত্ব অনুযায়ী মাপজোক করে কাঠি পুঁতে রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। তারপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে. মি. গভীর করে ৫০ থ ৫০ সে. মি. সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। চারা বা কলমের গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগে গর্ত প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবরসার বা আর্বজনা পঁচাসার মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে। গর্তভরাট করার পর এর উপরের ২০-২৫ সে. মি. মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার হালকা কোপ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে। এরপর গর্তে গাছ রোপণ করা যেতে পারে। এক বছরের চারা বা কলমের গাছ রোপণ করাই সবচেয়ে ভালো। রোপণের পরপরই গাছ যাতে বাতাসে না পড়ে যায় সেজন্য পাশে একটি বা দু'টি কাঠি পুঁতে সুতলী দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পরপরই গাছে সেচ দিতে হবে এবং গাছ যতদিন লেগে না ওঠে ততদিন বৃষ্টি না থাকলে ২-৪ দিন পরপর সেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ গাছে যে পরিমাণ সার দিতে হবে তা সারণি ২ এ দেখানো হলো।

সারণি ২ ঃ বিভিন্ন বয়সের লেবুজাতীয় ফল গাছে সারের পরিমাণ।

সার	১-২ বছর বয়স	৩-৫ বছর বয়স	৬ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়স
গোবর বা আর্বজনা পঁচাসার (কেজি)	১৫	২০	২৫-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০
এমপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০

বর্ষা মৌসুমের শুর€তে জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে সম্ž র্ণ গোবর সার একবারে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য সার তিন কিস্তি তে উপরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে (Topdressing) আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), মাঘ (ফেব্র€য়ারি) এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে গোবর সার গাছের চারদিকের মাটির সাথে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে মিশে দিতে হবে। এরপর আগাছা বা আর্বজনা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে যাতে বৃষ্টি হলে ধুয়ে না যায়। অন্যান্য সার Dibling পদ্ধতিতে দিলেই চলবে।

পরিচর্যা

একটি দেখতে সুন্দর এবং শক্ত কাঠামোর গাছ তৈরি করার জন্য অঙ্গছাঁটাই এর প্রয়োজন হয়।

ট্রেনিং ও প্র€নিং বা অঙ্গছাটাই ঃ ছোট গাছে সঠিকভাবে বাড়তে দেয়ার জন্য সে সব অবাঞ্চিত শাখা-প্রশাখা বের হয় সেগুলো ছাঁটাই করে দিতে হয়। এভাবে একটি দেখতে সুন্দর এবং শক্ত কাঠামোর গাছ তৈরি করা যায়। এর ফলে গাছের মধ্যে প্রচুর আলোবাতাস ও স র্যালোক প্রবেশ করতে পারে। ফলে গাছে রোগবালাই এবং পোকামাকড় আক্রমণ কম হয়। তাছাড়া সব বয়সের গাছেই বর্ষার পর ও

বর্ষা শুর€র আগে বিশেষ করে ফল আহরণের পরপরই যত মরা ডালপালা, রোগাক্রান্ ডালপালা, অনেক শাখা-প্রশাখা একটির সাথে আর একটি বেঁধে গেছে সেগুলো অথবা ডধঃবৎ ংঢ়ৎড়ঁঃং অবশ্যই ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল ছাঁটাই ঃ গাছে অতিরিক্ত ফল আসলে এগুলোর কিছুটা ছাঁটাই করে দেয়াই ভালো। এতে ফল বড় হয়, গাছ নিয়মিত ফল দেয় এবং দীর্ঘজীবী হয়।

সেচ ঃ শীতের পরেই গাছে ফুল আসে। ফুল আসা থেকে বর্ষা শুর€ হওয়ার প র্ব পর্যন্ প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। তাহলে ফল বড় হয় এবং ফলের গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধিও অব্যাহত থাকে।

তাছাড়া বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে সেচ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশণের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে গাছের গোড়া খড়, শুকনা আগাছা বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

লেবুজাতীয় ফল গাছের উরব-back, Gummosis ৷ Greening মারাত্মক রোগ।

রোগ দমন ঃ লেবুজাতীয় ফল গাছের Die-back অর্থাৎ পাতা এবং শাখা-প্রশাখার শীর্ষভাগ মরে যাওয়া একটি মারাত্মক রোগ। এরোগ দেখা দিলে মরা ডালপাতা ছেঁটে দিয়ে ১০-১২ দিন পরপর বোরদো মিকচার বা কোনো কপার ছত্রাক নাশক স্প্রে করলে এরোগ দমন করা যায়। এছাড়া Gummosis হলে বাকল ফেটে রস পড়তে থাকে। আক্রান্ত অংশ চেঁচে ফেলে এখানে ছত্রাকনাশক পেষ্ট লাগাতে হবে। তাছাড়া ছায়া প্রদানকারী গাছ রোপণ এবং এ রোগ প্রতিরোধকারী র€টষ্টক ব্যবহার করা যেতে পারে। Greening একটি মারাত্মক রোগ যা Mycoplasma এর আক্রমণে হয়ে থাকে। এরোগ এক প্রকারের Psyllid insect vector (*Diaphorina citri*) দ্বারা এক গাছ থেকে আর এক গাছে বিস্ ার লাভ করে। এটির কোনো দমন পদ্ধতি জানা নাই। তবে পোকা দমন করে এর বিস্ ার রোধ করা যেতে পারে।

পোকামাকড় দমন ঃ Citrus Leaf Miner লেবুজাতীয় গাছের একটি মারাত্মক পোকা। বাŽচা অবস্থায় নতুন পাতায় আক্রমণ করে। নতুন পাতা বের হওয়ার সাথে সাথে dimethoate (Rogor/Roxion/Perfecthion) ৪০ উঈ প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মি. লি. ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রথম স্প্রের ১৫ দিন পর আবার স্প্রে করতে হবে। তা'হলে এপোকা দমন হবে। Citrus psylla (*Diaphorina citri*) খুবই মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। দেখা দেয়া মাত্র Citrus Leaf Miner দমনের কথা ওপরে যেভাবে বলা হয়েছে একইভাবে এ পোকাও দমন করা যেতে পারে।

Fruit Sucking Moth মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। এর আক্রমনে ফল পঁচে ঝরে যায়। বাগান পরিŽছন্ন রাখা এবং বিষাক্ত টোপ (Poison bait) ব্যবহার করে এর সংখ্যা কমানো যেতে পারে। তাছাড়া Light trap ব্যবহার করেও এর সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

ফল আহরণ ঃ লেবু ও জামির মাঘ-ফাল্গুনে (ফেব্র€য়ারি) ফুল আসে এবং আষাঢ়-শ্রাবন (জুলাই-আগষ্ট) মাসে এগুলো আহরণ করা হয়। জাম্বুরাতে মাঘ-ফাল্গুনে (ফেব্র€য়ারি) ফুল আসে এবং ভাদ্র-আশ্বিনে ফল আহরণ করা যায়। কমলার ফুল মাঘ-ফাল্গুনে এবং ফল আহরণ করতে হয় আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাসে।

ফলন

লেবু	ঃ	১০০ - ১০০০ টি ফল প্রতি গাছে
জাম্বুরা	ঃ	১০০ - ৩০০ টি ফল প্রতি গাছে
কমলা	ঃ	১০০ - ৫০০ টি ফল প্রতি গাছে

অনুশীলন (Activity) *ঃ লেবু জাতীয় ফলের যে সকল প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে সেগুলোকে মোট কয়টি উদ্যানতাত্ত্বিক শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং এদের নামগুলো বৈজ্ঞানিক নামসহ লিখুন। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র লেবুজাতীয় ফলের কী কী জাত মুক্তায়িত করেছেন তা লিখুন।*

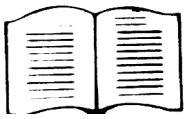

সারমর্মঃ দক্ষিণ-প র্ব এশিয়ার উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের দেশসম হ অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফলের উৎপত্তিস্থল। Rangpur lime, Indian sweet lime, Rongh lemon ইত্যাদির আদি উৎপত্তিস্থল হঁেছ আসাম ও বাংলাদেশ। লেবুজাতীয় ফল খাদ্যপ্রাণ সি সমৃদ্ধ। Citrus গণের অধীনে যে সকল প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হচ্ছে; সেগুলোকে মোট চারটি উদ্যানতত্ত্বাতিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন (১) Sweet orange (মাল্টা) (২) Mandarih (কমলা) (৩) Lime & lemon (জামির ও লেবু)

(৪) Pummelo & grape fruits (জাম্বুরা এবং ঝুমকা জাম্বুরা)। খবসড়হ বা লেবুর জাতসম হের মধ্যে সীডলেস লেমন, সীডলেস লেবু-২ ও সীডলেস লেবু-৩ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। খরসব বা জামির শ্রেণির বিভিন্ন জাতের মধ্যে কাগজী ও কাগজা জাত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হয়। উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র বারি বাতাবীলেবু-১ নামে জাম্বুরার একটি জাত এবং বারি কমলা-১ নামে কমলার একটি জাত মুক্তায়িত করেছে। লেবুজাতীয় ফল সাধারণভাবে স্বপরাগায়িত তবে কিছু পরপরাগায়ণ হয়। এদেশে

লেবু জাতীয় ফলের বংশ বিস্ ার গুটিকলমের সাহায্যে বহুদিন থেকেই করা হয়। অঙ্গঁছাটাই এর মাধ্যমে দেখতে সুন্দর এবং শক্ত কাঠামোর একটি গাছ তৈরি করা যায়। লেবুজাতীয় ফলের কতিপয় মারাত্মক রোগ ও পোকা আছে; যেগুলো দমন না করলে ফলন খুবই কমে যায়। লেবু ও জামির আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং জাম্বুরা ভাদ্র-আশ্বিনে ফল আহরণ করা হয়। গাছের বয়স ও বৃদ্ধির ওপর ফলের সংখ্যা নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৫

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) বাংলাদেশ হচ্ছে লেবু জাতীয় ফল বিশেষ করে লেবু ও জামিরের উৎপত্তিস্থল।

খ) স্বপরাগায়নের মাধ্যমে ফুলের পরাগায়ন হয়ে থাকে না।

গ) অধিক বৃষ্টিপাত সম্বলিত ঢালু জমি কমলা উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়।

ঘ) কমলার ফুল আসে মাঘ-ফাল্গুনে এবং ফল আহরণ করতে হয় আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে।

ঙ) গাছের বয়স ও বৃদ্ধির ওপর ফলের সংখ্যা নির্ভর করে।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মালয়েশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইন্ডিয়ার উত্তর-প র্বাঞ্চলে ও বাংলাদেশকে ..... এবং ..... এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়।

খ) লেবুজাতীয় সব ফল খাদ্যপ্রাণ ..... সমৃদ্ধ।

গ) লেবুর ফল ..... জাতীয়।

ঘ) উলে-খ্য যে কমলা আন্তর্জাতিকভাবে .....নামে পরিচিত।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) সহজে খোসা ছাড়ানো যায় এমন কমলা লেবুর ইংরেজী নাম কোন্‌টি?

ক) সুইট অরেঞ্জ

খ) ম্যান্ডারিন অরেঞ্জ

গ) সাওয়ার অরেঞ্জ

ঘ) পমেলো

ii) চীনা লেবু কোথায় পাওয়া যায়?

ক) কুমিল-া

খ) শ্রীমঙ্গলে

গ) চীন দেশে

গ) রাজশাহীতে

পাঠ ৭.৬ নারিকেল

এ পাঠ শেষে আপনি –

- নারিকেলের উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নারিকেলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসম হ ও বংশ বিস্তার সম্পূর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নারিকেলের জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- নারিকেলের চাষাবাদ প্রণালি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উৎপত্তিস্থল, উৎপাদন, পুষ্টিমান ও ব্যবহার

উৎপত্তিস্থল

দক্ষিণ-প র্ব এশিয়ার উষ্ণ মন্ডলীর দেশসমূহে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর কোনো এক জায়গায় নারিকেলের আদি উৎপত্তিস্থল। মালয়েশিয়া অথবা ইন্দোনেশিয়ার এর উৎপত্তিস্থল হতে পারে। তারপর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে নারিকেল প্রশান্ ও ভারত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

উৎপাদন

বর্তমানে নারিকেল উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলো হচ্ছে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ইন্ডিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, ফিজি, সলোমন আইল্যান্ড, সামোয়া ও মেক্সিকো। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩০,৬০০ হেক্টর জমিতে নারকেলের চাষ হয় এবং ৭৫,৯০০ টন নারিকেল উৎপন্ন হয়।

ব্যবহার

ডাবে পুষ্টি ও বলদানকারী বিশুদ্ধ সুপেয় পানি রয়েছে।

নারিকেল এদেশের জনগণের একটি প্রিয় অর্থকরী ও লাভজনক ফসল। আবাদী নারিকেল বা ডাবের পানি পুষ্টি ও বলদানকারী বিশুদ্ধ সুপেয় পানি। অসুস্থ জনের পথ্য হিসেবে এবং খরায় আপামর জনসাধারণের তেষ্টা মেটাতে এর জুড়ি নাই। ডাবের নরম শাঁস ও ঝুনা নারকেলের শাঁস এবং এদ্বারা তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী সবারই পছন্দ। চুল বিন্যাসে নারিকেল তৈল অতুলনীয়। নারিকেল তৈল সাবান, শ্যাম্ু, ও নানাপ্রকার প্রসাধনী সামগ্রী তৈরির প্রধান উপকরণ। নারিকেলের ওপর ভিত্তি করে দেশে কোপরা (নারিকেলের শুকনো শাঁস), নারিকেল তৈল, কার্পেট, রশি, বোতাম প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ঝড় ও সামুদ্রিক জলেচ্ছ্বাসে অন্যগাছের তুলনায় নারিকেল বেশি টিকে থাকতে পারে এবং বিপদে আপদে মানুষের বেশি উপকারে লাগে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ, জাতসমূহ ও বংশ বিস্তার

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ

নারিকেল Palms (Palmae) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Cocos nucifera* L. এটি একটি বহুবর্ষজীবী, একবীজ পত্রী, এককান্ডবিশিষ্ট গুঁছম ল উদ্ভিদ। কোনো কোনো জাতের নারিকেলের কান্ডের ব্যাসার্ধ মাত্র ২০০ এমএম এবং কান্ড গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ সমান (বামন জাতসম হ)। আবার অনেকজাত আছে যেগুলোর কান্ডের ব্যাসার্ধ ৩৫০ এমএম; সেগুলোর বোলের বা গোড়ার ব্যাসার্ধ ৮০০ এমএম বা তার বেশি হতে পারে। Tall group ও Dwarf group- এ দু'টি গ্রুপ কৌলিতত্ত্বের দিক থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক। কান্ডের দৈর্ঘ্য ১২-২৪ মিটার হতে পারে। একটি সতেজ প র্ণ বয়স্ক গাছে ৩৫-৩৬ টি পাতা থাকে পাতার বোঁটা খুব মজবুত এবং ৯০-১৫০ সে. মি. লম্বা হয়। পাতা

লম্বায় ৪-৬ মিটার হতে পারে। প্রতিটি পাতায় অনেক অনুপত্র মজবুত শিরার দু-পাশে সমদ রত্বে অবস্থান করে। অনুপত্রগুলো সর€, ৬০-৯০ সে. মি. লম্বা এবং অগ্রভাগ চিকন। গাছের শীর্ষে মুকুট আকারে সাজানো পল-বকে 'ক্যাবেজ' বলে।

পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ও পুর€ষফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় (গড়-হডবপরডঁং)।

পুষ্পমঞ্জরী Spadix ধরনের এবং সাধারণত ১.২-১.৮ মি. লম্বা হয়। পুষ্পমঞ্জরীতে স্ত্রী ও পুর€ষফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় (Monoecious)। প্রতিটি পুষ্পমঞ্জরীর শাখাগুলোর (Spikes) গোড়ার দিকে এক বা একাধিক স্ত্রীফুল এবং অগ্রভাগে অনেক পুর€ষফুল থাকে। পুর€ষ ও স্ত্রীফুলের অনুপাত ২০০-৩০০ ঃ ১-৫। স্ত্রীফুল পুর€ষফুল অপেক্ষা বড় হয় এবং স্ত্রীফুলগুলোকে Button বলা হয়। পুষ্পমঞ্জরী দুটি আবরণী (Spathes) দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতি পুষ্পমঞ্জরীতে ৩০-৪০টি ফল ধরে।

চিত্র ৭.৬.১ টিপিকজাতের নারিকেল

জাতসমূহ

নারিকেলের জাত প্রধানত তিনটি- (১) টিপিকা জাত (Typica variety), যা লম্বা শ্রেণিভুক্ত; (২) জাভানিকা জাত (Javanica variety), মাঝারী লম্বা শ্রেণির এবং (৩) নানা জাত (Nana variety) যা বামন (Dwarf) শ্রেণির।

আমাদের দেশে বলতে গেলে সব নারিকেল গাছই টিপিকা শ্রেণির বা জাতের (Tall)।

টিপিকা জাত (Tall)ঃ এ জাতের গাছ লম্বা, কান্ড মোটা এবং কান্ডের গোড়া স্ফীত বা বোল (Bole) বিশিষ্ট হয়। এ জাতের গাছ ৬-৭ বছর বয়সে ফল ধরা আরম্ভ করে, ২০-২২ মিটার উচুঁ হয় এবং ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। এ জাতের গাছ সাধারণভাবে পরপরাগায়িত (Crosspollinated)। বাংলাদেশের সব নারিকেল গাছ এ জাতে অন্তর্ভুক্ত। এ জাতের মধ্যে বহু উচ্চ ফলনশীল উপজাত আছে যেগুলো বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক নারিকেল হিসেবে আবাদ হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও টিপিকা জাতটির মধ্যেও ডাবের গায়ের রং কোনটির সবুজ, কোনটির বাদামি আবার কোনটির সবুজাভ সাদা দেখা যায়। এগুলোকেই টিপিকা বা লম্বা শ্রেণির বিভিন্ন জাত হিসেবে গন্য করা হয়। আমাদের দেশে

বলতে গেলে সব নারিকেল গাছই টিপিকা শ্রেণির বা জাতের। শাঁসের জন্য এ জাতটিই সবচেয়ে ভালো। (চিত্র-৭.৬.১ দেখুন)।

জাভানিকা জাতঃ এটি Semi-dwarf শ্রেণির অন্ ভুর্ক্ত। এর কান্ড মাঝারী মোটা হয় এবং গোড়ায় 'বোল' হয় না। এ জাতের গাছ স্বপরাগায়িত। এ শ্রেণির গাছ ৪-৫ বছর বয়সেই ফল দেয়া শুর€ করে এবং ৫০-৬০ বছর পর্যন্ ফল হয়। ষাটের দশকে এগুলো এদেশে আমদানি করা হয়েছে। এ জাতটি পানি ও শাঁস উভয়টির জন্যই মোটামুটি ভালো।

বামন জাতের গাছের গোড়ায় কোন 'বোল' নাই। এজাতের গাছ স্বনিষেকী।

বামন জাত (Dwarf/Nana Variety) ঃ এ শ্রেণির গাছ খাটো কান্ড বিশিষ্ট। গাছের গোড়ায় কোনো 'বোল' নাই। এজাতের গাছ স্বনিষেকী। ফল ছোট আকারের। ২৫০ থেকে ৮০০ গ্রামের বেশি হয় না। ৩-৪ বছর বয়সেই ফল ধরা শুর€ করে। এ শ্রেণির গাছে ৩০-৪০ বছর পর্যন্ ফল দেয়। কোকোনিনো নামে এর এক জাত প্রতি ছড়ায় ৩০-৪০ টি নারিকেল এবং প্রতিগাছে সব সময়ই ৩০০ টির মত নারিকেল থাকে। ষাটের দশকে এজাতটি মালয়েশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ভালো। এজাতটি শাঁস উৎপাদনের জন্য বা তেলের জন্য মোটেই ভালো নয়।

টিপিকা জাত অর্থাৎ লম্বাজাতটি যথাযথ সার, সেচ ও পরিচর্যা পেলে রোপণের সাড়ে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পরেই ফল দেয়া শুর€ করে।

ফুল আসা, ফল ধারণ ও উৎপাদন ঃ টিপিকা জাত অর্থাৎ লম্বাজাতটি যথাযথ সার, সেচ ও পরিচর্যা পেলে রোপণের সাড়ে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পরেই ফল দেয়া শুর€ করে। প্রথম ফুল আসার তিন থেকে পাঁচ বছর পরে গাছ পুরোপুরি ফল দেয়া শুর€ করে। বামন জাতগুলো (Javanica and Nana Palms) যদি ভালো পরিচর্যা পায় তবে রোপণের ২১ মাস পরেই ফুল দেয়া শুর€ করে। এর দু'তিন বছর পর থেকে পুরোপুরি ফল দেয়া শুর€ করে। একটি পুষ্পমঞ্জরীতে দুই থেকে তিন ডজন স্ত্রীফুল থাকে এবং সহস্রাধিক পুর€ষফুল থাকে। প্রত্যেকটি পুর€ষফুলে হাজার পর্যন্ রেণু থাকে। পরাগায়ণের পরই স্ত্রীফুল ফলে পরিণত হয়। পরাগায়ণের পরও বহু স্ত্রীফুল পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণে বাতাস অথবা পানির অভাবে অথবা বৈরী পরিবেশের জন্য ঝরে যায়। সাধারণত এক একটি পুষ্পমঞ্জরী পরাগায়ণের ১০-১১ মাস পর ৬ থেকে ১৮ টি নারিকেল ধারণ করে। ১২ মাসে নারিকেল সম্পূর্ণ বাত্তি হয় অর্থাৎ ঝুনো নারিকেলে পরিণত হয়। একটি সুস্থ গাছে অনুকূল পরিবেশে বছরের যে কোনো সময় বিভিন্ন বয়সের ১৪টি নারিকেলের বাদা (Bunch) দেখতে পাওয়া যায়।

বংশ বিস্তার

নারিকেল গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রথম কাজ হবে মাতৃগাছ নির্বাচন।

নারিকেল গাছের বংশ বৃদ্ধি বীজ দ্বারাই হয়ে থাকে। নারিকেল গাছের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রথম কাজ হবে মাতৃগাছ নির্বাচন। এদেশে মে-জুন মাসে টিপিকা জাতের নারিকেল গাছে অল্প দিনের ব্যবধানে একাধিক পুষ্পমঞ্জরী বের হয়। সুতরাং টিপিকা (লম্বা জাতের) জাতের গাছেও স্বপরাগায়ণ হওয়া সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেহেতু ছড়া বের হওয়ার পর নারিকেল ঝুনা হতে ১২ মাস সময় নেয় তাই মে-জুন মাসে আহরিত ঝুনা নারকিলে মাতৃগুণাগুণ বজায় রাখার সম্ভাবনা অধিক। বীজমাতা নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত।

(১) ফলন ঃ গাছের সবচেয়ে বড়গুণ হবে অধিক ফলন। পুর€ শাঁস বিশিষ্ট মাঝারী হতে বড় সাইজের ৬০ থেকে ১০০ টি নারিকেল বছরে ধরে এমন গাছ মাতৃগাছ হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

(২) গাছের মাথা ঃ যে সব গাছের মাথা সব সময়ে পাতা ও বিভিন্ন বয়সের ফলে ভরা থাকে এমন গাছ মাতৃগাছ হিসেবে উত্তম।

(৩) কান্ড ও পাতা ঃ কান্ড সুষম ও মাঝারী লম্বা এবং পাতার বিন্যাস যত ঘন হবে ততই উত্তম। পাতার বোঁটা খাটো ও প্রশস্ত হতে হবে।

(৪) পোকা ও রোগবালাই থেকে মুক্ত ঃ নির্বাচিত মাতৃগাছগুলোর মাথায় স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত ঝুনা নারিকেল সতর্কতার সাথে পেড়ে বীজ নারিকেল বাছাই করতে হবে। বীজ নারিকেল গাছে খুব শুকানো দেয়া ঠিক নয়। বাদামি রং ধরার পর পরেই বীজ-নারিকেল সংগ্রহ করা উচিত। বীজ-নারকিলের ওজন ও সাকার স্বাভাবিক হতে হবে। ওজনে হালকা, বোঁটার দিকে পুর€ ও ছোবড়া বিশিষ্ট নারিকেল বীজের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া বীজ নারিকেল পোকামাকড় ও রোগবালাই মুক্ত হতে হবে।

বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

প্রথমে বীজতলায় বীজ নারিকেল রোপণ করে চারা উৎপাদন করতে হয়। বীজতলার জন্য পানি নিষ্কাষনের সুবিধাযুক্ত এমন উঁচুজমি নিতে হবে যেখানে বন্যার পানি ঢোকে না এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না। আবার সেচের সুবিধার জন্য নিকটবর্তী পানির উৎস থাকা চাই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজতলা তৈরি এবং বীজ নারিকেল রোপণের উপযুক্ত সময়। উন্মুক্ত জায়গায় বীজতলা হতে হবে। গাছের নিচে বীজতলা করা উচিত নয়। কাজের সুবিধার জন্য প্রতিটি বীজতলা ১ থ ৬ মিটার সাইজের করা ভালো। প্রতিটি বীজতলা মাটির সমতল থেকে ২০ থেকে ২৫ সে. মি. উঁচু হওয়া চাই। পাশাপাশি দু'টি বীজতলার মাঝখানে ৫০ সে. মি. প্রশস্ত পানিসেচ ও নিষ্কাশনের জন্য নালা থাকবে।

প্রতি বীজতলায় লম্বালম্বি ২০ সে. মি. দ রত্বে ২০ সে. মি. প্রশস্ত ও ১৫ সে. মি. গভীর করে পাশাপাশি দু'টি নালা কেটে নিতে হবে। এ নালাতে ২০ সে. মি. দ রত্বে বীজ নারিকেলগুলো মাটির সমান্তরালে বসাতে হবে। নারিকেলের যে দিকটা বেশি প্রশস্ত সেদিক নিচের দিকে অর্থাৎ মাটির সাথে লাগান থাকবে। তাছাড়া নারিকেলে যে দিকে চোখ থাকে সেদিকটা পেছনের চেয়ে ৫ সে. মি. উঁচু থাকবে। একসারি থেকে অন্যসারিতে বীজ নারিকেল বসানোর সময় মুখগুলো বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বসাতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে বীজ নারিকেলগুলো এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে শুধু নারিকেলের ওপর অংশটুকু সামান্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে এবং সেচ দিলে যাতে মাটি সরে না যায় এবং পানি সংরক্ষণ ও আগাছা দমনের জন্য বীজতলা খড়, কচুরিপানা বা নারিকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পোকা আক্রমনের সম্ভাবনা থাকলে বীজতলা খড় বা নারিকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়ার আগে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। উন্মুক্ত স র্যালোক এবং মাটিতে সর্বদা রস সংরক্ষণ করা সফল চারা উৎপাদনের জন্য অত্যাবশক। যথাযথ পরিচর্যায় রোপণের দুই থেকে চারি মাসের মধ্যেই চারা গজিয়ে যায়। সঠিক পরিচর্যা আর অনুকূল পরিবেশ পেলে গজানোর ছ'মাসের মধ্যেই চারাগুলো তিনটি পাতাসহ এক মিটার উঁচু হয়ে উঠবে। এখন চারাগুলো স্থায়ী জায়গায় রোপণের উপযুক্ত হয়েছে।

চারা স্থানান্তরকরণ

চারা উঠানোর আগে সেচ দিয়ে নেয়া ভালো। চারার ডগা বা বোঁটা ধরিয়া কখনও টানা উচিত নয়।

বেশ সাবধানতার সাথে চারা উঠাতে হবে। চারা উঠানোর আগে সেচ দিয়ে নেয়া ভালো। চারার ডগা বা বোঁটা ধরিয়া কখনও টানা উচিত নয়। চারার পাশে একটু খুঁড়ে বীজ নারিকেলের নিচে কোদাল

দিয়ে একটু চাপ দিয়ে আলগা করে তারপর দুই হাত বীজ নারিকেলের তলায় এবং পাশে দিয়ে চারা তুলতে হবে। চারা কখনও হাতে নেয়া উচিত নয়। বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চারাগুলো যথাস্থানে রোপণ করতে হবে। দেরী হলে চারাগুলো দুর্বল হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র সুস্থ, দ্র€ত বর্ধনশীল, শক্তিশালী গাঢ় সবুজপাতা বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য নির্বাচন ও বিতরণ করতে হবে।

চারা রোপণের রত্ব ও সময়

বিভিন্ন জাতের চারা বিভিন্ন দ রত্বে রোপণ করতে হয়। বর্গাকারে বা ত্রিভুজাকারে রোপণ করা যেতে পারে। তবে আন্ ঃফসল চাষের সুবিধার জন্য বর্গাকারে রোপণ করা ভালো। বাগানে চারা যে দূরত্বে রোপণ করা হয় আবার বাড়ির আশে পাশে এক সারিতে কম দূরত্বে রোপণ করা চলে। যাহোক বিভিন্ন জাতের চারা রোপণের দূরত্ব সারণি- ২ এ দেয়া হলো।

সারণি ২ ঃ নারিকেলের বিভিন্ন জাতের চারা রোপণের দ রত্ব

জাত	বাগানে রোপণের দ রত্ব (মি.)	হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা (বর্গাকারে)	বাড়ির আশে পাশে একসারিতে গাছ রোপনের দ রত্ব (মি.)	হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা (বর্গাকারে)
টিপিকা জাত (লম্বা শ্রেণি)	৮.৫	১৩৮	৬.০	২৭৭
জাভানিকা জাত (মাঝারি লম্বা শ্রেণি)	৭.৫	১৭৭	৫.০	৪০০
নানা জাত (বামন শ্রেণি)	৬.৫	২৩৬	৪.৫	৪৯৪

রোপণের সময় ঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই নারিকেল চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচ ও পরিচর্যার সুযোগ থাকলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও চারা রোপণ করা যেতে পারে।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু

নারিকেল উষ্ণ মন্ডলীয় ফসল। এফসল উভয় গোলার্ধের ২৭° অক্ষাংশ পর্যন্ত জন্মে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত এর ব্যাপক চাষ হয়। ১৩০০ থেকে ২৩০০ মি. মি. বার্ষিক বৃষ্টিপাত নারিকেল উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং বৃষ্টিপাত ১০০০ মি. মি. এর কম হলে নারিকেল উৎপাদন বেশি কষ্টকর। নারিকেল উৎপাদনের প্রধান অঞ্চলসমূহের তাপমাত্রা ২০ থেকে ৩২° সেলসিয়াস। খুব বেশি

তাপমাত্রায় পরাগায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। নারিকেল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে। নারিকেল চাষের জন্য চাই প্রচুর স র্যালোক।

মাটি

নারিকেল সব রকমের মাটিতেই জন্মে। তবে নারিকেল বাগানের মাটি পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়া চাই। ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা এবং ফিলিপাইনের পলিমাটিতে সবচেয়ে ভালো নারিকেল জন্মে। যে সমস্ত অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুম বিরাজমান যেমন বাংলাদেশ; সেখানে পানির স্তর মাটির এক থেকে আড়াই মিটারের মধ্যে থাকলে ভালো হয়। মাটির পিএইচ ৫.২ থেকে ৮.০ এর মধ্যে নারিকেল ভালো জন্মে। দীর্ঘ জলাবদ্ধতা নারিকেল গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়।

চাষাবাদ প্রণালি

জমি তৈরি

জমি বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে ভালো করে তৈরি করতে হবে। সারি থেকে সারির দ রত্ব এবং সারিতে গাছের দ রত্ব মাপজোক করে রোপণের স্থান কাঠি পুঁতে নির্দিষ্ট করতে হবে। তারপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে এক মিটার গভীর করে ১.০ থ ১.০ মিটার সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। এ সময় গর্তের উপরের স রের মাটি আলাদা রাখতে হয়। গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগেই গর্তগুলো সার মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা ভূমি সমতলে রোপণ না করে ৩০ সে. মি. গর্তের গভীরে রোপণ করা অনেক দিক দিয়েই উপকারী।

সার প্রয়োগ

গর্তের উপরের মাটির সাথে গর্তপ্রতি ২০ কেজি গোবর মিশিয়ে গর্তগুলো ৩০ সে. মি. বাকি রেখে ভরাট করতে হবে। তারপর প্রতি গর্তের ২৫ সে. মি. মাটির সাথে নিম্নবর্ণিত সারগুলো অর্ধেক মিশাতে হবে।

সারের পরিমাণ

গোবর	ঃ ২০ কেজি	এমপি	ঃ ১৬৬০ গ্রাম
ইউরিয়া	ঃ ১৩২৫ গ্রাম	জিপসাম	ঃ ২৭৭৫ গ্রাম
টিএসপি	ঃ ১০৪০ গ্রাম	জিংক সালফেট	ঃ ২৭৫ গ্রাম

বাকি সারগুলো ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছের চারদিকে ৩-৫ মিটার পর্যন্ ছিটিয়ে টিলার বা লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে।

চারা রোপণ

সার মিশানো মাটি দিয়ে গর্তগুলো ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর নারিকেলের সুস্থ, সবল চারা গর্তের মাঝখানে বসাতে হবে। চারা গর্তের মাটিতে রোপণের সময় চারা নারিকেলটি শুধু মাটি চাপা দিতে হবে এবং চারদিকের মাটি শক্ত করে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের বয়স চারার সময় ৯-১২ মাস হওয়া উত্তম। অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় যখন মাটি কর্দমাক্ত থাকে তখন সার মিশানো বা চারা রোপণ না করে যখন জমিতে 'জো' আসে তখন করা সবচেয়ে ভালো। রোপণের পরপরই চারার দু'পাশে দু'টি কাঠি পুঁতে বাংলার চার এর মত করে চারাটি মাঝখানে রেখে দু'টি কাঠি বেঁধে দিতে হবে। চারার নিরাপত্তার জন্য বেড়া দিতে হবে।

পরিচর্যা

রোপণের পর ৪-৫ বছর পর্যন্ত নারিকেল গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা যথাসময়ে করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে গাছ দ্রুত বেড়ে ফলবান হবে এবং পরবর্তী সময়েও গাছের ওপর এর শুভ প্রতিক্রিয়া থাকবে।

সেচ ও পানি নিকাশ এবং অন্যান্য পরিচর্যা ঃ প্রথম অবস্থায় গর্তের চারদিকে মাটি এসে চারার গোড়া যেন ঢেকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এরূপ হলে অতিরিক্ত মাটি চারার গোড়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। চারা যতই বড় হতে থাকবে গর্তের মাটিও আস্তে আস্তে ভরাট হতে থাকবে। শুকনো মৌসুমে নিয়মিত সেচ দিতে হবে এবং বর্ষা মৌসুমে নারিকেল বাগানের জলাবদ্ধতা না হয় এজন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো গাছের ছায়া যাতে ক্ষতি না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। নারিকেল গাছের জন্য উন্মুক্ত আলো-বাতাস চাই।

সারের উপরি প্রয়োগ ঃ উল্লিখিত সারের অর্ধেক পরিমাণ চারা রোপণের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ফল আসা পর্যন্ত প্রতি বছর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়া থেকে ৩০ সে. মি. দূরে এবং ক্রমান্বয়ে আরও দূরে গাছের বৃদ্ধি পরিমাপ করে উক্ত জায়গায় সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশাতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। বর্ষা শুরুর আগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম কিস্তি সার প্রয়োগ করতে হয়। তখন বাগানের পুরো জমি চাষ করে দেয়া গাছের জন্য উপকারী। একইভাবে বর্ষা শেষে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হবে এবং জমি চাষ করতে হবে। গাছ ফল দেয়া শুরু করার পর থেকে উলি-খিত সারের সবটুকু প্রতি বছর দুই কিস্তিতে একই ভাবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিনে প্রয়োগ করতে হবে।

দু'টি পোকা নারিকেল গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এদের একটি Rhinoceros beetle বা গোবরে পোকা এবং অপরটি 'রেড পাম উইভিল'।

পোকা দমন ঃ দু'টি পোকা নারিকেল গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এদের একটি Rhinoceros beetle বা গোবরে পোকা এবং অপরটি 'রেড পাম উইভিল'। গোবরে পোকা প্রায় ৩.৫ সে. মি. লম্বা এবং ২.৫ সে. মি. চওড়া হয়। সাধারণত গোবরের সাদা, আবর্জনা ইত্যাদিতে এ পোকা জন্মায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা বর্ধনশীল কচি অগ্রভাগে ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে সেখানে পচন ধরে এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। পঁচা অংশগুলোর আকর্ষণে 'রেড পাম উইভিল' এর আগমন হয়। এর শুককীট গাছের অগ্রভাগ কেটে ফেলে এবং গাছের মৃত্যু ঘটায়। এদু'টি পোকার আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষার করা জন্য নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(১) নারিকেল বাগানের মধ্যে বা আশে পাশে গোবর ও আবর্জনার গাদা রাখা যাবে না।

(২) যে সকল গাছ মারা গেছে বা মরার উপক্রম হয়েছে সেগুলো কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং আক্রান্ত অংশগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(৩) বছরে অন্তত দু'বার বর্ষা শুরুর আগে এবং বর্ষা শেষে গাছের অগ্রভাগের আবর্জনা, শুষ্ক পাতা ও ছড়ার অংশ পরিস্কার করে দিতে হবে। ছিদ্র দেখতে পেলে লোহা শিক ঢুকিয়ে পোকা গেঁথে ফেলতে হবে। তাছাড়া ছিদ্র পথ দিয়ে যতটুকু সম্ভব প-াষ্টিকের সিরিঞ্জের সাহায্যে 'নগস' বা ডেনকাভ্যাপন ১০০ ইসি ঢুকিয়ে ছিদ্র কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। কীটনাশক থেকে উৎপন্ন বিষ বাষ্প নারিকেল গাছের অভ্যন্তরে উইভিলের কীড়া ধ্বংস করবে।

নারিকেলের শীর্ষ পঁচা রোগ আক্রান্ত গাছের মাথা কেটে পুড়ে ফেলা উচিত

রোগ দমন ঃ শীর্ষ পঁচা (Bud rot) রোগ খুবই মারাত্তক। এ রোগে আক্রান্ত গাছের শীর্ষদেশের কোমল অংশ পঁচে বিশ্রী গন্ধ বের হয়। আক্রমনের প্রথম অবস্থায় বোরদো মিকচার ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যেতে পরে। অথবা আক্রান্ত গাছের মাথা কেটে পুড়ে ফেলা উচিত এবং নিকটবর্তী গাছগুলোতে বোরদো মিকচার ছিটানো উচিত।

ফল আহরণ

ফুল ফোটার ১২ মাস পর নারিকেল আহরণের উপযুক্ত হয়। পরিপক্ক নারিকেলকে ঝুনা নারিকেল বলে। এদেশে গাছে উঠে বাদা কেটে রশি দিয়ে নিচে নেমে দেয়া হয়। থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়াতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বানরের সাহায্যে নারিকেল আহরণ করা হয়। ডাব হিসেবে ৬-৭ মাস বয়সের 'বাদা' একই রকম ভাবে কেটে নামানো হয়।

ফলন

এ দেশে গাছপ্রতি বছরে গড়ে ২৫/২৬ টি মাত্র নারিকেল পাওয়া যায়। কারণ সঠিক পরিচর্যার অভাব। অথচ অনেক গাছ আছে বিশেষ করে যেগুলো কুয়া বা টিউবওয়েলের পাশে সেগুলোতে বছরে ১০০-১৫০ টি নারিকেল পাওয়া যায়।

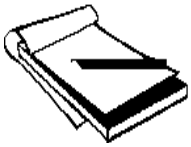

***অনুশীলন (Activity) ঃ** নারিকেলের বীজমাতা নির্বাচনের জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নেয়া উচিত?*

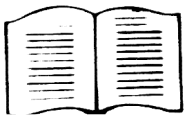

সারমর্মঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর কোনো এক জায়গায় নারিকেলের আদি উৎপত্তিস্থল। এফসল উভয় গোলার্ধের ২৭° অক্ষাংশ পর্যন্ জন্মে। এর সুষম বৃদ্ধির জন্য দিনরাত্রির তাপমাত্রার তারতম্য ৬-৭° সেলসিয়াস সহ ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। দীর্ঘ জলাবদ্ধতা নারিকেল গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়। নারিকেলের জাতগুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় যথা- (১) টিপিকা জাত (লম্বা শ্রেণি) (২) জাভানিকা জাত (মাঝারী লম্বা শ্রেণি) এবং বামন বা নানা জাত (খাটো শ্রেণি)। নারিকেলের বংশ বিস্তারের জন্য উৎকৃষ্ট গুণাবলীসম্পন্ন মাতৃগাছ নির্বাচন করা উচিত। নারিকেলের উন্নতমানের চারা উৎপাদন করে বাগানে রোপণ করতে হয়। রোপণের পর ৪-৫ বছর পর্যন্ নারিকেল গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা খুবই গুর€ত্বপ র্ণ। বাগানে কোনো চারা মারা গেলে অবশ্যই পুনঃরোপণ করতে হবে। পোকামাকড় ও রোগ যথাযথভাবে দমন করা উচিত। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় গাছ প্রতি ১০০-১৫০ টি নারিকেল পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৬

১। নিচের বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

ক) নারিকেলের ইতিহাস মনে হয় মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

খ) প্রতিটি পুষ্পমঞ্জরীর শাখাগুলোর গোড়ার দিকে এক বা একাধিক স্ত্রীফুল এবং অগ্রভাগে অনেক পুরুষফুল থাকে।

গ) এক সারি থেকে অন্য সারিতে বীজনারিকেল রোপণের সময় মুখগুলো একই দিকে বসাতে হবে। বীজনারিকেলের যে দিকটা বেশি প্রশস্ত সেদিক মাটির সাথে লাগানো থাকবে না।

ঘ) অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় যখন মাটি কর্দমাক্ত থাকে তখন সার মিশানো বা চারা রোপণ না করে যখন মাটিতে 'জো' আসে তখন করা সবচেয়ে ভালো।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) নারিকেল এর স্ত্রীফুল পুরুষফুল অপেক্ষা ..... হয় এবং স্ত্রী ফুলগুলোকে ..... বলা হয়।

খ) নারিকেল গাছের শীর্ষে মুকুট আকারে সাজানো পল্লবকে ..... বলে।

গ) ঝুনা নারিকেলের শাঁস শুকালে তাকে..... বলে।

ঘ) আন্ত ঃফসল চাষের সুবিধার জন্য নারিকেলের চারা ..... রোপণ করা ভালো।

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

i) রোপণের কত বৎসর পর বামন জাতের নারিকেল গাছে ফুল আসে?

ক) ২-৩ বৎসর
খ) ৩-৪ বৎসর
গ) ৪-৫ বৎসর
ঘ) ৫-৬ বৎসর

ii) টিপিকা জাতের নারিকেল গাছ হেক্টর প্রতি কতটি লাগানো উচিত?

ক) ১২২ টি
খ) ১৩৮ টি
গ) ১৩০ টি
ঘ) ১৪৬ টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৭

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। আমের পুষ্টিমান, ব্যবহার ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ লিখুন।
২। আমের জাতসমূহের বর্ণনা দিন।
৩। লিচুর উৎপত্তি, পুষ্টিমান, ব্যবহার ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ লিখুন।
৪। লিচুর জাতসমূহের নাম লিখুন।
৫। কাঠালের উৎপত্তিস্থল, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ লিখুন।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করা হয়। এমন সব লেবু জাতীয় ফলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) সত্য ঘ) মিথ্যা

২। ক) এ ঘ) স্ত্রীফুল পুরুষফুল উভলিঙ্গ ফুল গ) মহানন্দা

৩। i) খ ii) গ iii) ক

পাঠ ৭.২

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) সত্য

২। ক) এরিল খ) পরাগায়ন গ) জ্যৈষ্ঠ ঘ) ৫৫-৬০

৩। i) ক ii) গ

পাঠ ৭.৩

১। ক) সত্য খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) মিথ্যা ঙ) সত্য

২। ক) সরোসিস খ) ৯০ ১১০ গ) নিষেক ঘ) দুটি ডেগা

৩। i) গ ii) খ

পাঠ ৭.৪

১। ক) মিথ্যা খ) মিথ্যা গ) সত্য ঘ) সত্য ঙ) সত্য

২। ক) শুঙ্গ খ) কাজী গ) ২০ ২২

৩। i) খ ii) খ

পাঠ ৭.৫

১। ক) সত্য খ) মিথ্যা গ) মিথ্যা ঘ) সত্য ঙ) সত্য

২। ক) লেবু জামির খ) সি গ) বেরী ঘ) Mandarin

৩। i) খ ii) খ

পাঠ ৭.৬

১। ক) মিথ্যা খ) সত্য গ) মিথ্যা ঘ) সত্য

২। ক) বড় Button খ) ক্যাবেজ গ) কোপরা ঘ) বর্গাকারে

৩. i) খ ii) খ

তথ্যসূত্র

এম,এফ মন্ডল ও এম, রায়, ১৯৮৮। আধুনিক ফল বিজ্ঞান।

Ahmad, K.U.1976. Flowers, Fruits and Vegetables (3rd edition, in bengali) Alhaj Kamisuddin Ahmad, Bunglalow No. 2, Farm Gate, Dhaka-15. 610 p.

DAE,. 1995. Training Manual on Plant Propagation and Nursing Management, Dhaka.

Gardner, V. R., F. C. Bradford and H. D. Hooker, 1952. The Fundamentals of Fruit Production. McGraw-Hill Book Co. Inc., New york. 739 p.

Gourley, J.H. and F.S. Howlett, 1960. Modern Fruit Production. Macmillan Co., New York. 579 p.

Hartmann and kester, 1982. Plant Propagation, Principles and Practices.

Islam, M. A, 1967. Soil Fertility Investigation in East Pakistan. Agricultural Information Service. 3, R.K. Mission Rood, Dacca. p 72.

Janick. J, 1972. Horticultural Science (2nd edition). W.H. Freeman and Co., San Francisco, U.S.A. 586 p.

J Janick, 1982. Horticultural science. 3rd ed.

Jana, B. K. and A. Ghosh, 1991. Adhunik Paddhatita Fole Chas (in bengali). Day's Publishing, Calcutta 700073, India. 318 p.

Karim, Z., M. I. Ali, M.M.U. Mia and S.K. G. Hussain, 1989. Title BARC, Farm Gate, New Air port Road, Dhaka 1215.

Maniruzzaman, F. M, 1988. Bangladesher Faler Chash (in bengali). Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. 381 p.

Mondal, M. F. and M. Roy, 1988. Adhunik Phal Biggan (in bengali) Mrs. Afia Mondal, BAU Campus, Mymensingh. 335 p.

Mandal, M F. and M.R. Amin, 1990. Faler Began (Fruit Garden). BAU, Mymensingh.

Naik, K. C, 1963. South Indian Fruit and Their Culture. P. Varadachary and Co. 8, Linghi chetty St. Madras, India. 335 p.

Nazimuddin, M. and A.K.M. A. Hossain, 1988. Effect of different types of planting materials on the growth and yield of pineapple cv. Giant Kew. Bangladesh Hort, 16 (2): 30-34

Rashid, M.A., M.A. mannan and A.K.M. A Hossain, 1992. Effect of irrigation on banana production. Bangladesh Hort, 20 (2): 75-79.

Singh, L.B., 1960. The Mango: Botany, Cultivation and Utilization. Leonard Hill, London.

Singh, S.,S. Krishnamurthi and S.L Katyal (Compiled), 1963. Fruit Culture in India. ICAR, New Delhi.

Singh, R.N., 1978. Mango. ICAR, New Delhi.

Singh, A., 1980. Fruit Plysiolosy and Production (Third edition). Kalyani Publishers, New Delli, India. 565 p.

Saha, S.K. and A.K.M. A. Hossain, 1992. Fruit characteristics of five litchi varieties. Bangladesh Agri. Res, 17 (1): 77-82.

Saha, S.K., A.Ahmed and A.K.M. A. Hossain, 1992. Growth and yield of papaya as affected by NPK fertilizers. Bangladesh Hort, 20 (1): 73-79.

Saha, M.G., S.K. Saha, A.K. Azad and A.K.M.A. Hossain, 1993. Yeild and quality of pineapple as afected by removal of crowns, slips and side suckers. Thai J. Agric. Sci, 28:15-20.

Uddin, M.N. and A.K.M.A. Hossain, 1993. Study on the storage of pineapple. Bangladesh Hort, 21(2): 7-12.

Valmayor, R.V. and R.C. Espino, 1976. Banana Production in the Philippines. Extension CCircular No. 8. Department of Horticulture, UPLB, Philipaines.